সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানি

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের লুটপাট ও

রেশমি রুমাল আন্দোলন

আবদুর রশীদ তারাপাশী

অনূদিত

শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানি

১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর ভারতের উত্তরপ্রদেশে জন্ম হয় তাঁর। প্রাথমিক শিক্ষার্জনের পর ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দির তত্ত্বাবধানে ইসলামি শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দেওবন্দে তাকমিল ফিল হাদিস সমাপ্ত করে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র মদিনায় চলে যান এবং মসজিদে নববিতে অবৈতনিক শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে ভারতে এসে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে শায়খুল হিন্দ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে মদিনায় গেলে তিনিও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার শরিফ হুসাইন ইবনু আলির বিদ্রোহের কারণে হিজাজের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতে চলে গেলে রেশমি রুমালকে কেন্দ্র করে শায়খুল হিন্দ গ্রেপ্তার হয়ে মাল্টায় নির্বাসিত হন। শায়খুল হিন্দের বার্ধক্যের কথা ভেবে মাদানিও তাঁর সঙ্গে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিলাভের পর কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এ আন্দোলনে অংশ নিলে ব্রিটিশবিরোধী একটি বৃহৎ ঐক্য গড়ে ওঠে, ভারতবর্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করা হারাম ফাতওয়া দিলে দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেপ্তার হয়ে দুই বছর পর ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পান। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে আবারও গ্রেপ্তার হন।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তৃতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশদের সাহায্য করা হারাম ঘোষণা করে চতুর্থবারের মতো গ্রেপ্তার হন এবং দুই বছর দুই মাস পর মুক্তি পান।

তিনি *নকশে হায়াত*, *আশ-শিহাবুস সাকিবসহ* বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। শায়খুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত এই মনীষী ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর ৭৮ বয়সে উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে ইনতিকাল করেন। তাঁকে মাকবারায়ে কাসিমিতে দাফন করা হয়। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বাংলাদেশের সিলেট শহরে মাদানি চত্বর নির্মাণ করা হয়েছে।

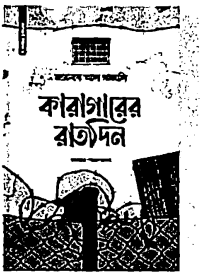

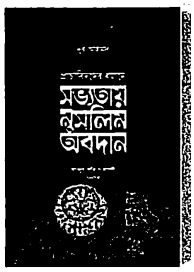

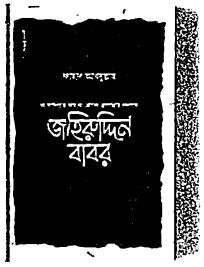

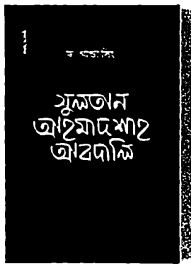

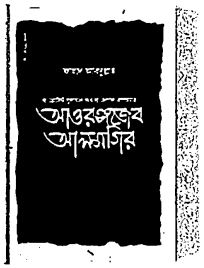

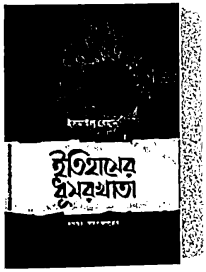

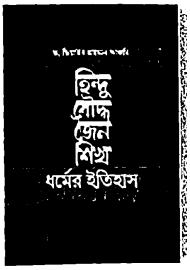

সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ.

ভারত উপমহাদেশে
ইংরেজদের লুটপাট ও

রেশমি রুমাল আন্দোলন

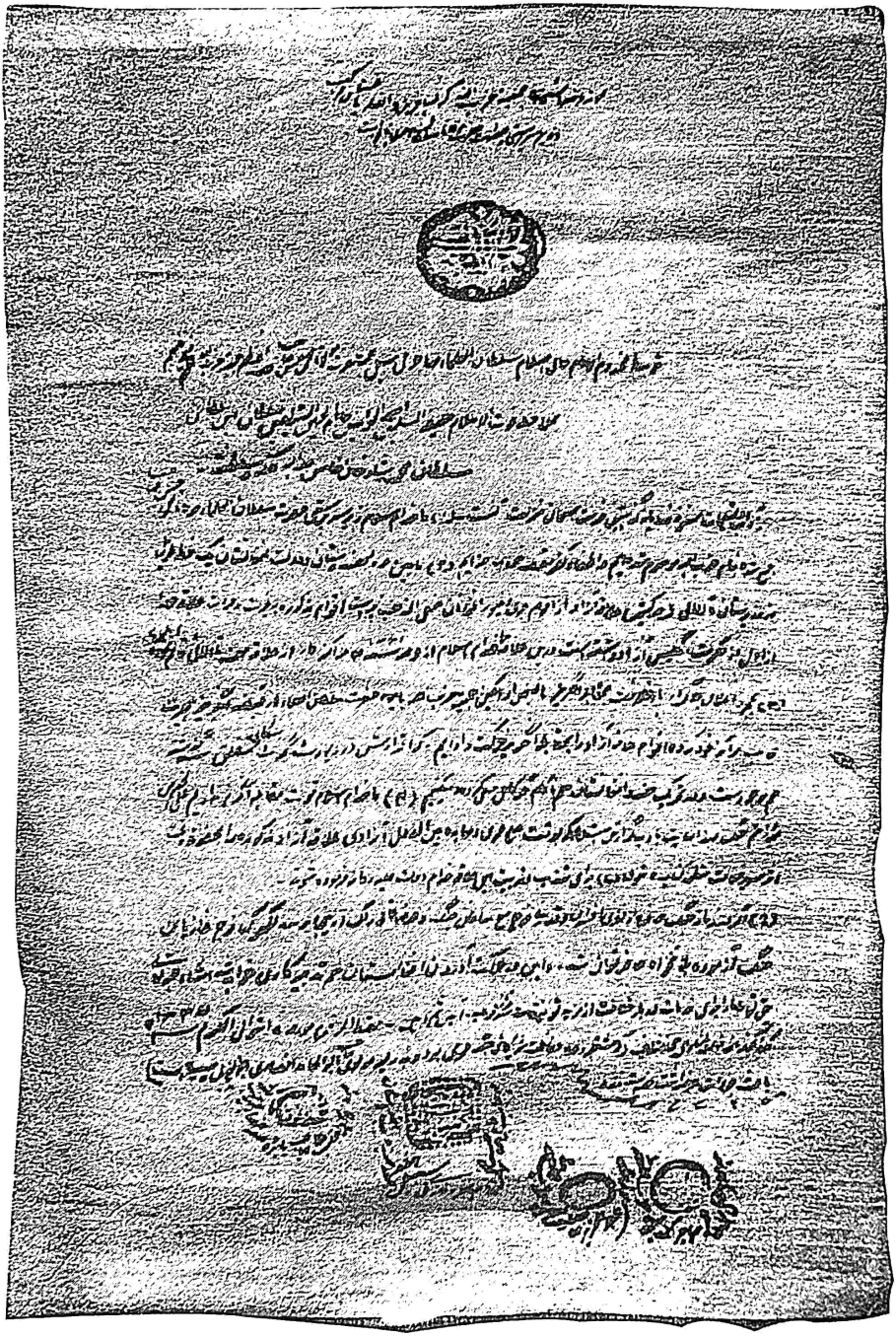

ঐতিহাসিক রেশমি রুমাল

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের লুটপাট ও

রেশমি রুমাল আন্দোলন

সাইয়িদ মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ.

সংকলক : মাওলানা আবদুর রাহমান রাহ.

অনুবাদক : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩০০, US $ 13. UK £ 10

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96712-2-0

Rashmi Rumal Andulon
by **Syed Hussain Ahmad Madani**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস কথা বলে; কিন্তু সমাজে ইতিহাসের কিছু দুর্নাম থাকায় বোধহয় মানুষ ইতিহাস জানতে অনাগ্রহী। ইতিহাসের দুর্নাম—সে নিষ্ঠুর-নির্দয়; কাউকে ক্ষমা করে না। কারও মুখ চেয়ে কথা বলে না। সত্যপ্রকাশে শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ করে না। নিরেট বাস্তবতা—যে জাতি ইতিহাসের কথায় কান দেয় না, তারা গড়াগড়ি খায় আত্মবিস্মৃতির ড্রেইনে। ভবিষ্যতের অজানা পথে হাঁটতে গিয়ে পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে বেড়ায় বনবাদাড়ে। বেদনাদায়ক বাস্তবতা—এ ক্ষেত্রে আমাদের দেওবন্দ অনুসারীরা বলতে গেলে প্রথম সারিতে।

ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশের হাতে যাওয়ার আগে শাসকশ্রেণিকে সাবধান করা, পরে পরাধীন উপমহাদেশকে 'দারুল হারব' ঘোষণা এবং রক্ত দিয়ে দেশকে আজাদির দ্বারপ্রান্তেও পৌঁছান আমাদের পূর্বসূরিরা; কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো, আমাদের সেই গৌরবগাথা ইতিহাস আমাদের অজানা। ফলে আজ আমাদের অর্জন দিয়ে চেতনার ব্যবসা করে যাচ্ছে চেতনার ফেরিওয়ালারা।

ইতিহাস হচ্ছে দ্বিমুখী আয়না—এক পিঠে দেখা যায় গৌরব কিংবা বেদনার অতীত; অপর পিঠে দেখা যায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মহাসড়ক। *রেশমি রুমাল আন্দোলন* আমাদের পূর্বসূরিদের তেমনই এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস; অথচ আমাদের অধিকাংশ লোক বোধহয় জানি না সেই ইতিহাস।

প্রসঙ্গত আরেকটা তিক্ত বাস্তবতা—দরদি কোনো মালীর সংস্পর্শ না পাওয়া আর অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের অমিত সম্ভাবনাময়ী কিছু প্রতিভা। দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না এগিয়ে যাওয়ার। *রেশমি রুমাল আন্দোলনের* অনুবাদক মাওলানা আবদুর রশীদ তারাপাশীকে আমি তেমনই এক প্রতিভা মনে করি। প্রচারবিমুখ এ লেখক প্রায় হারিয়েই যান। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ফেসবুকে আসায় তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ইতিপূর্বে আমরা তাঁর অনূদিত ও মৌলিক বেশ কটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, যেগুলো ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। দেশের অন্যান্য প্রকাশনী থেকেও তাঁর আরও কিছু গ্রন্থ বেরিয়েছে, পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেগুলোও।

অনুবাদকের অনুবাদ সম্পর্কে কেবল এটুকুই বলব, *রেশমি রুমাল আন্দোলন* তাঁর প্রথম

প্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থ হলেও এতে রয়েছে দক্ষতার অনিন্দ্য ছাপ। ঐতিহাসিক তথ্যের একঘেয়েমি উপস্থাপনার পরও আপনাকে সামনে টানবে তাঁর ভাষার নান্দনিকতা ও লালিত্য। গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে মনে হবে অনবদ্য এক ইতিহাসের সঙ্গে স্বাদ নিচ্ছেন সাহিত্যের।

বইটির তৃতীয় সংস্করণ আপনাদের হাতে। এই সংস্করণে কিছু বানান সংশোধন করা হয়েছে। ভাষায়ও টুকটাক কাজ করা হয়েছে। কিছু তথ্য সংশোধন করা হয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগেছে যেহেতু মূল বইয়ের কোনো কপি আমাদের কাছে নেই। কোনোভাবে সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি। কারণ, মূল বইটি বলতে গেলে হারিয়ে গেছে। এমনকি পিডিএফও পাওয়া যায়নি। এরপরও কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ থাকল; সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই সংস্করণের কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। এ ছাড়া পাঠকের দৃষ্টিতে পুরো বইটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে কিছু সংশোধনী দিয়েছেন আলমগীর হুসাইন মানিক। সম্পাদক ও প্রকাশক আবুল কালাম আজাদও বইটি নিরীক্ষণ করেছেন। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইটি নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। মোট তিনটি অধ্যায় এবং প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদ দিয়ে সাজানো হয়েছে। শিরোনাম-উপশিরোনামও বিন্যাস করা হয়েছে।

আমাদের ইতিহাস-বিমুখ জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাক। অমূল্য গ্রন্থটি পাঠে আগামী দিনের বিপ্লবীরা তাঁদের সঠিক কর্মপন্থা নিরূপণ করতে পারুক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে প্রার্থনা কেবল এটুকুই।

খতিব তাজুল ইসলাম
প্রধান সম্পাদক
কালান্তর প্রকাশনী

অনুবাদকের কথা

সময়টা সম্ভবত ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ। শিক্ষকতার তৃতীয় বছর চলছিল হয়তো। এক শীতার্ত বিকেলে একজন সহকর্মী ডাকেন তাঁর কক্ষে। গিয়ে দেখি ভাঙা একটি ট্রাংক খুলে পুরানো কিছু গ্রন্থ গোছাচ্ছেন তিনি। সেগুলো এতই পুরাতন—অনেকটা আগুনে পোড়া। তিনি বলেন, এগুলো তাঁর আব্বার। পাকিস্তানে লেখাপড়াকালে এগুলো সংগ্রহ করেছেন। ঘরে একবার আগুন লাগায় গ্রন্থগুলোও পুড়ে গেছে প্রায়।

আমিও গ্রন্থের স্তূপে হাত দিয়ে দেখি বেশির ভাগই জ্বলে অকেজো হয়ে গেছে। মোটামুটি অক্ষতগুলো আমরা আলাদা করি। সেই পুড়ে যাওয়া গ্রন্থের মধ্যেই খুঁজে পাই *তাহরিকে রেশমি রুমাল* নামের অমূল্য এই গ্রন্থ। আগুনের তাপে পাতার রং পালটে গেলেও লেখা ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত ও পরিষ্কার। সেলাইয়ের দিকে পুড়ে যাওয়ায় ধরতেই পাতাগুলো ঘরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর থেকে এটি আমি চেয়ে নিই। বিক্ষিপ্ত পাতাগুলোর নম্বর মিলিয়ে দেখি আলহামদুলিল্লাহ পুরো গ্রন্থই আছে—কোনো লেখা পোড়েনি। পরে কয়েক ভাগ করে স্ট্যাপলার পিনের মাধ্যমে আটকে নিই। কিছু অংশ পাঠের পর অভিভূত হয়ে কোনো ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই অনুবাদ শুরু করি। গ্রন্থাকারে এটিই নিজের প্রথম অনুবাদ।

বর্তমানে অনূদিত খাতাটি সংরক্ষিত থাকলেও ক্ষয়ে যাওয়া সেই পাতাগুলোর সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। পুড়ে যাওয়া সেই পাতাগুলোর কিছুটা আছে, কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে, তাঁর পরম দয়ায় অমূল্য এ দলিলটি ছন্নছাড়াভাবে হারিয়ে যাওয়ার আগেই অনুবাদ করতে পেরেছি।

কৃতজ্ঞতা কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক আবুল কালাম আজাদের। একদিন কথাপ্রসঙ্গে গ্রন্থটির কথা উঠলে তিনি চেপে ধরেন এটি তাঁকে দিয়ে দিতে। তাঁর সেই আগ্রহেই বাংলা ভাষায় আলোর মুখ দেখেছে আমাদের গৌরবময় এ ইতিহাস। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আমাদের সেই বিপ্লবী পূর্বসূরিদের কবরগুলো রহমতের বৃষ্টিতে শীতল করে দিন।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
২০ নভেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৩

এক : আজাদির প্রথম বিপ্লব ১৩
দুই : দ্বিতীয় বিপ্লব ১৪

প্রথম অধ্যায়

রেশমি রুমালের পটভূমি : ব্রিটিশদের নির্যাতন ও লুটতরাজ # ১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশদের নির্যাতন-নিপীড়ন # ১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক নিপীড়ন # ২২

এক : ইংরেজদের বয়ানে নির্যাতন-নিপীড়নের করুণ দৃশ্য ২৫
দুই : ইংরেজদের ধোঁকা ও কূটচাল ৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন # ৪৪

এক : হিন্দুস্থানিদের সংস্কৃতিবিমুখ বানানোর ব্রিটিশ পাঁয়তারা ৪৪
দুই : মুসলিম বাদশাহদের রাষ্ট্রনীতি ৪৫
তিন : ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ৪৬
চার : শিক্ষার উত্থান-পতন ৫৫
পাঁচ : ব্রিটিশরা শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের স্থায়িত্বের মাধ্যম বানিয়েছিল ৫৭
ছয় : শিক্ষার আড়ালে হিন্দুস্থানিদের বিচ্ছিন্ন করা ৫৭
সাত : সারসংক্ষেপ ৬০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক আগ্রাসন # ৬১

এক : হিন্দুস্থানের অতীত অর্থনীতি ৬১
দুই : ব্রিটিশ-ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার খণ্ডচিত্র ৬৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইংরেজদের লুটতরাজের দাস্তান # ৭১

এক : ইংরেজদের ত্রিকালব্যাপী লুটপাট ৭১
দুই : কোম্পানির লুটতরাজের প্রথম কাল ৭১
তিন : লুটতরাজের দ্বিতীয় কাল ৭২
চার : লুটতরাজের তৃতীয় কাল ৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্দোলনে বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ের নানামুখী প্রয়াস এবং বিপ্লব-প্রচেষ্টা # ৯০

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্ববাসীর নৈতিক সমর্থন আদায়ের প্রয়াস # ৯১

এক : বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ে মিশনারি প্রক্রিয়া ৯১
দুই : চীনা এবং বার্মিজ মিশন ৯১
তিন : জাপানি মিশন ৯৪
চার : ফরাসি মিশন ৯৫
পাঁচ : আমেরিকান মিশন ৯৫
ছয় : যুদ্ধের মানচিত্র তৈরি, গুপ্তচরবৃত্তি, শত্রুর সেনাছাউনিতে সমর্থক সৃষ্টি ৯৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপ্লব ছড়ানো ও বাস্তবায়নের চেষ্টা-সংগ্রাম # ১০৪

এক : বিকল্প সরকারের সংক্ষিপ্ত চিত্র ১০৪
দুই : দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের ঘাঁটি স্থাপন ১০৫
তিন : বহির্বিশ্বে সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ১১১
চার : বহির্বিশ্বকে তুর্কির সাহায্যকারী বানানোর প্রয়াস ১১২

পাঁচ : আক্রমণের রাস্তা নিরূপণ ও এর নিরাপত্তা মজবুতকরণ ১১৪
ছয় : দেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি ফ্রন্টে বিদ্রোহ করা ১১৬

তৃতীয় অধ্যায়

রেশমি রুমালের ইতিহাস, ব্যর্থতার কারণ ও মাওলানা সিন্ধির ডায়েরির ওপর পর্যালোচনা # ১১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

রেশমি রুমালের কেন্দ্রীয় ঘটনা # ১১৯

এক : কেন্দ্রীয় ঘটনা ১১৯
দুই : দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত ১২০
তিন : গালিবনামা ১২৩
চার : গালিবের সঙ্গে চুক্তিপত্র ১২৪
পাঁচ : আনোয়ারনামা ১২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রেশমি রুমালের পরিণতি ও তার কারণ # ১২৯

এক : যেভাবে ধরা পড়ে রেশমি রুমাল ১২৯
দুই : রেশমি রুমালের পর ১৩২
তিন : ভারতীয় মিশনের পরাজয় ও তথ্যের অভাব ১৩৪
চার : মুসলিমদের হীনম্মন্যতা এবং হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ১৩৫
পাঁচ : আন্দোলনের ব্যবস্থাপনা ১৩৫
ছয় : মিশনের ব্যর্থতা এবং আফগানশাহির বিশ্বাসঘাতকতা ১৩৭
সাত : রাশিয়ান মিশন এবং হিন্দুত্ববাদী মানসিকতার উদাহরণ ১৩৭
আট : সাংগঠনিক বরকত থেকে মুসলিমদের বঞ্চিতি ১৩৮
নয় : অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্ব ১৩৯
দশ : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার একটি উদাহরণ ১৪১
এগারো : হিন্দুস্থানি যুবকদের কর্মপরাকাষ্ঠা ১৪১
বারো : রুশ মিশনের পরিণতি ১৪২
তেরো : ব্রিটিশের ধোঁকাবাজির নমুনা ১৪৩
চৌদ্দ : জাপানি ও ইসতাম্বুলি মিশন ১৪৪
পনেরো : মিশন দুটির পরিণতি ১৪৫

ষোলো : কাবুলস্থ কেন্দ্রীয় নেতাদের অবস্থা ১৪৫
সতেরো : রেশমি রুমালের সংক্ষিপ্ত পরিণতি ১৪৬
আঠারো : মৌলবি সাইফুর রাহমানের দুর্বলতা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা ১৪৭
উনিশ : একটি অতি-গোপন চিঠির ব্যাপারে তাঁর গোয়েন্দাগিরি ১৪৮
বিশ : হাবিবুল্লাহর হত্যা এবং আমাদের বিপদের সমাপ্তি ১৪৮
একুশ : আমানুল্লাহ খানের যুগ ও আমরা ১৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির ব্যক্তিগত ডায়েরির ওপর পর্যালোচনা # ১৫০

এক : রেশমি রুমাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ ১৫০
দুই : ব্যর্থতার কারণসমূহের ওপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ১৫৮
তিন : পরাজয়ের কারণসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ১৫৯

ভূমিকা

এক. আজাদির প্রথম বিপ্লব

আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে এ উপমহাদেশের সব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও প্রশাসনের সংস্কার সাধন; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই আমূল পালটে যায় উপমহাদেশীয় রাজনীতির চিত্রপট। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রভুত্ব। মাদ্রাজ, বাঙাল, মিসৌর, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই, রোহিলাখণ্ডসহ উত্তর-প্রদেশের মতো প্রদেশগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় তারা। পরে কোম্পানির প্রতিনিধিদল দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে এই মর্মে প্রহসনমূলক এক ফরমান লিখিয়ে দেশে প্রচার করে—'আজ থেকে সৃষ্টি স্রষ্টার, দেশ বাদশাহর এবং প্রশাসন কোম্পানি বাহাদুরের!'

ফরমানটি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারসহ সিন্ধুর প্রশাসন কোম্পানির মোকাবিলায় অসহায় হয়ে পড়ে। যদিও কাশমির আর পাঞ্জাবের শাসনক্ষমতা তখনো এ দেশের সন্তান রাজা রনজিত সিংহের কর্তৃত্বেই ছিল; কিন্তু সে আগেই আঁতাত করে বনে যায় কোম্পানির আস্থাভাজন। কেন্দ্রীয় সরকারের অগোচরেই তার ও কোম্পানির মধ্যে হয় সমঝোতাচুক্তি। সেই যুগসন্ধিক্ষণে ওয়ালিউল্লাহ খান্দানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, শামসুল উলামা মাওলানা আবদুল আজিজ রাহ. তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গী-সাথি, মুরিদসহ আন্তঃদেশীয়-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের ওপর সুগভীর চিন্তাভাবনা করে আজাদির প্রথম বিপ্লবের সূচনা করেন। বিপ্লবের চমৎকার একটি নকশা আঁকেন তাঁরা—সীমান্তপ্রদেশ হবে রণক্ষেত্র; আর কোয়েটা, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের পথ হয়ে দেশের অভ্যন্তর থেকে পৌঁছবে রসদ ও সেনাসাহায্য। তাঁরা দেখেন, দেশের ভেতর থেকে জিহাদ পরিচালনার পর্যাপ্ত সুযোগ যেমন দুর্বল, তেমনি আপৎকালে বাইরের মিত্রদের সহযোগিতা অর্জনও হবে অনেকটা

দুষ্কর। রণফ্রন্ট নির্ধারণের পরপরই তাঁরা আফগান সরকার ও দুররানি গোত্রদের কাছে অর্থ ও সেনাসাহায্য চান। পাশাপাশি হিন্দুস্থানকে 'দারুল হারব' হিসেবে ফাতওয়া দিয়ে তাঁর সঙ্গী-সাথিদের জিহাদের দাওয়াত দিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন।

মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য, বিপ্লবের সূচনাকালেই দেশবাসীকে ইয়াতিম বানিয়ে তিনি চলে যান আল্লাহর কাছে। তবে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে প্রিয় শাগরিদ, শতাব্দীর বিস্ময়, খলিফাতুল মুসলিমিন সাইয়িদ আহমাদ শহিদকে স্থলাভিষিক্ত করে যান। আহমাদ শহিদ তাঁর তীক্ষ্ণ মেধাবলে বিপ্লবকে করে তুলেন সুশৃঙ্খল ও সুসংহত। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আগে রাস্তা থেকে শিখ-শাসনের জঞ্জালটা অপসারণ করে পুরো হিন্দুস্থানে বেনিয়া দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মুসলিম নামধারী কতিপয় গাদ্দারের বিশ্বাসঘাতকতা আর কোম্পানির ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এ বিপ্লব উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে বালাকোটের প্রান্তরে শিখদের হাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিপ্লবীদের নেতা আহমাদ শহিদ ও তাঁর ডান বাহু প্রধানমন্ত্রী শাহ ইসমাইল রাহ.-সহ আজাদির অনেক বরপুত্র জিহাদ করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালায় উপুড় হয়ে পড়েন। এটিই ছিল আজাদির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রথম বিপ্লব।

বালাকোটের বালুকে রঞ্জিত করা রক্তবিন্দুগুলোই ছিল মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গিত প্রথম রক্তবিন্দু। তবে এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে, ন্যায় ও ধর্মে যে বিপ্লবের ভিত্তি, তা অসুরশক্তির মোকাবিলায় ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়লেও নিঃশেষ হয় না। বালাকোট প্রান্তরের এ রক্তঝরা বিপ্লবও সাময়িকভাবে চাপা পড়ে। তবে বিপ্লবের এই ছাইচাপা আগুন তুষানলের মতো ধিকিধিকি জ্বলছিল। পরে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বিধ্বংসী শিখা মেলে হিন্দুস্থানব্যাপী দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

সত্যি বলতে কী, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহান বিপ্লব মূলত বালাকোট বিপ্লবের দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ ছাড়া কিছু ছিল না। আরও সহজ করে বললে স্বাধীনতার আগমুহূর্ত পর্যন্ত পরিচালিত সব বিপ্লব-আন্দোলন ছিল সেই একই শেকলের ভিন্ন ভিন্ন কড়াসদৃশ; আর সব মিলে হয় স্বাধীনতার মজবুত একটি শেকল। প্রথম বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টেনে দ্বিতীয় বিপ্লব সম্পর্কে দুটি কথা বলতে চাই।

দুই. দ্বিতীয় বিপ্লব

ব্রিটিশের শাসনামলে (১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) বিপ্লবের ইতিহাস লেখা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। এমনকি পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদের লেখায় ছিটেফোঁটা যে দুয়েকটা সত্য এসেছিল, সেগুলো প্রকাশেও ছিল না অনুমতি। অতএব, এ দাবি খুব একটা অযথার্থ হবে না

যে, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহান বিপ্লবের নিগূঢ় অনেক সত্য আজও ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে অনুদ্ধার পড়ে আছে। এখন যদিও দেশ স্বাধীন, ইতিহাসবিদদের কলমও সম্পূর্ণ আজাদ; তথাপি কাল-পরিক্রমা ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র আর প্রমাণপুঞ্জি মানুষের স্মৃতিপট থেকে বিস্মৃতির ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলেছে। তাই বর্তমানের ইতিহাস-লেখকদের কাছে সত্যের নাগাল পাওয়ার একটিমাত্র পথ রয়েছে; সেটি হচ্ছে—এখনো এ ব্যাপারে যে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত-ইশারা আছে, ওইগুলোর ওপর গবেষণা করে সংক্ষেপের ব্যাখ্যা তলব করা এবং বাস্তবের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অবশ্য ইতিহাসবিদরা এ ব্যাপারে তাঁদের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। তাঁরা পুরানো লিটারেচার আর পোকায় খাওয়া ফাইল ঘেঁটে ঘটনাবলির ওপর যথাসাধ্য আলোকপাতের প্রয়াস পাচ্ছেন। তবে আজ অবধি বিপ্লবের যে দিকটি জনসমক্ষে আসেনি—একটা সুশৃঙ্খল, সুবিশাল ও বিন্যস্ত বিপ্লব কন্যাকুমারিকার চূড়া থেকে খায়বার গিরিপথ পর্যন্ত বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে যায়; বিশাল এ ভূখণ্ডের এমন কোনো অজপাড়াগাঁ বিপ্লবের আওতার বাইরে না থাকা; সর্বোপরি প্রশাসন, জনসাধারণ, সামরিক বিভাগ, এমনকি ব্রিটিশের তাবেদারসহ আজন্ম ভিক্ষুকশ্রেণির মধ্যে বিদ্রোহ ছড়ানোর পেছনে কারণটা কী ছিল? কার হাত এখানে সক্রিয় ছিল?

সর্বোপরি বিপ্লবীদের গোয়েন্দা-নেটওয়ার্ক আর সংবাদ আদানপ্রদানের গোপন ব্যবস্থা এতটাই মজবুত যে, ব্রিটিশদের কাঁধের কিরামান-কাতিবিন পর্যন্ত বিপ্লবের কথা ইঙ্গিতেও টের পায়নি। প্রত্যেক বিপ্লবী অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সফলভাবে নিজ নিজ বার্তা অন্যকে পৌঁছে দিচ্ছে; অথচ ব্রিটিশরা টেরও পাচ্ছে না! বিশেষ করে সেই চা-পাতা বিক্রেতার ঘটনা, যে তার মিশন নিয়ে সীমান্তপ্রদেশ থেকে পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য ও সিন্ধু হয়ে সুদূর বাংলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেও ব্রিটিশরা তাঁকে বের করতে পারেনি। অনুরূপ সেই গজারোহী বৃদ্ধের কথা, যিনি আজাদির বার্তা নিয়ে সমগ্র হিন্দুস্থান চষে বেড়ালেও ব্রিটিশের কাছে জীবন্ত হেঁয়ালি হয়েই থাকেন। একইভাবে সেই অবলা বৃদ্ধার কথা, যিনি মুক্তির নেশায় উপমহাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে তরুণদের মধ্যে জিহাদের আগুন ধরিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত অন্তহীন ইচ্ছাশক্তিতে নিজে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা কিছুই করতে পারেনি। অনুরূপ দিল্লি ম্যাগাজিন-সংশ্লিষ্ট সেই সেনার কথা, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের ভাষ্যমতে, যে হিন্দুস্থানের সবকটি সেনাছাউনিতে অহরহ বার্তা পাঠাতে থাকলেও সিআইডিরা ঘুণাক্ষরেও তা টের পায়নি। একইভাবে হাতেলেখা সেই বিজ্ঞাপনগুলোর কথা, যেগুলো দিল্লির দরজায় দরজায় সাঁটানোর পরও ব্রিটিশরা লোকটির সন্ধান বের করতে অপারগ থাকে। ইরানশাহির পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশ-সংবলিত একটি বিজ্ঞাপন হিন্দুস্থানের

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, ইংরেজদের শক্তিশালী গোয়েন্দাবিভাগ পাগলের মতো খুঁজে যা উদ্ধারে ব্যর্থ হয়।

এসবের পেছনে কার মাথা কাজ করছিল? কার সাংগঠনিক যোগ্যতায় এগুলো সম্ভব হচ্ছিল? সর্বোপরি বিস্ময়ের সেই ব্যাপারটি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়—যারা ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভৃতি দিক দিয়ে কেবল ভিন্নই ছিল না; বরং ছিল একে অপরের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী; আর তাদের মধ্যকার এ দ্বন্দ্বকে উসকে দিতে গোড়াদের পক্ষ থেকে সম্ভব সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানোর পরও তারা শুধু যে প্রকাশ্যে একদেহ-দুই প্রাণের মতো হয়ে উঠছিল তা-ই নয়; বরং সামরিক বিভাগেও তারা ভাই ভাই হয়ে যায়। একত্রে আহার-বিহারে কোনোই কুণ্ঠাবোধ করছিল না। হিন্দুরা গরুর গোশত খেয়ে খুশি হয়; আর মুসলিমরা তাদের পূজাপার্বণে উপস্থিত হয়ে মজা লুটে। অথচ বাইরের কেউ এসে এমনটি করতে তাদের উৎসাহও জোগায়নি।

ইংরেজদের সেনাজীবন; সে-তো এক আলাদা পৃথিবী। সেখানে এমনটি করার কোনো অবকাশও ছিল না। তাহলে কে তাদের এভাবে একই প্লাটফর্মে এনে জড়ো করেছিল? কে এভাবে দেশের জন্য উৎসর্গিত হতে শেখাচ্ছিল? এগুলোই সেই অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য, যা আজও ব্রিটিশের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে। এগুলো তো সুস্পষ্টভাবে এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, অবশ্যই এর পেছনে মজবুত কোনো হাত এবং অগাধ মেধাসম্পন্ন কোনো মস্তিষ্ক কাজ করছিল; কিন্তু সেই হাতটি কার ছিল? আর সেই ধীমান ব্যক্তিই-বা কে ছিলেন? কে ছিলেন এই বিপুলায়তন বিপ্লবের সংগঠক? এটাই গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্ন, যা উদ্‌ঘাটন করতে আজ অবধি কোনো কলম এগিয়ে আসেনি।

আমরা অন্য কোনো গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব এবং ইনশাআল্লাহ সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে এ কথা দেখিয়ে ছাড়ব যে, সেই হাত ও মেধার অধিকারী ছিলেন ওই সকল আলিম, যাঁদের সম্পর্ক শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি ও সাইয়িদ আহমাদ শহিদের সঙ্গে। তা না হলে বলুন দেখি, ইলাহাবাদের গভর্নর মাওলানা বেলায়েত আলি, পাটনার গভর্নর মাওলানা ইয়াহইয়া, সেখানকার প্রধানমন্ত্রী মাওলানা আহমাদ আলি ও বেরেলির গভর্নর মাওলানা ফাজলে হক খায়রাবাদি রাহ.; সর্বোপরি হিন্দুস্থানের ভাইসরয় মাওলানা বখত বাহাদুর—তাঁরা কি আলিম ছিলেন না? বিপ্লবের সময়ও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ এই পদসমূহে আসীন থেকে কী করছিলেন? ডক্টর উইলিয়াম উইলসন হান্টার তো বেকুব ছিলেন না যে, ছয় বছরব্যাপী অনুসন্ধান শেষে কোনো ভিত্তি ছাড়াই এ মর্মে রিপোর্ট লিখে ফেলবেন—'এই বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা আর পরিচালকরা ছিলেন ওয়াহাবি মোল্লা-মুনশির দল। এখনই এদের সমূলে উৎপাটন না করলে হিন্দুস্থানে এ অবস্থা লেগেই থাকবে!'

মোটকথা, ওয়ালিউল্লাহর রক্তের উত্তরাধিকারীরাই ছিলেন ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহান বিপ্লবের সংগঠক, যা আমাদেরই দুর্ভাগ্য আর পাঞ্জাবের কতিপয় মুসলিম গাদ্দারের গাদ্দারিতে শত্রুর চোখে পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বাস্তবে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটেনি; বরং উপমহাদেশের স্বাধীনতা কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে পড়েছিল। অবশ্য এর ফলে হিন্দুস্থানের অভিজাতশ্রেণির বিলুপ্তি ঘটে। সম্পদ ও ক্ষমতা গণবিচ্ছিন্ন, সমাজধিকৃত ও নীচুপ্রকৃতির কিছু মানুষের হাতে চলে যায়।

স্যার টমাসের লেখা *তাজকিরায়ে রুয়াসায়ে পাঞ্জাব* পড়লে দেখতে পাবেন, আজ যারা আমাদের প্রশাসনের শীর্ষপদে আসীন, এরা সেই জঘন্য লোকগুলোর সন্তান, যারা ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ও জাতির সঙ্গে গাদ্দারি করে মুজাহিদদের কবরের ওপর নিজেদের জমিদারির ভিত্তি রাখে।

যাক, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব সম্পর্কে যা বলার ছিল, তা বলা হয়ে গেছে। চলুন, এবার আমরা আজাদির তৃতীয় বিপ্লব *রেশমি রুমাল আন্দোলন* প্রসঙ্গে আসি। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত এ বিপ্লবের বর্ণনা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। এ গ্রন্থে এটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তবে আলোচনার স্বার্থে বিপ্লবকে আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করব। এসব অধ্যায়ে থাকবে বিপ্লবের কারণ সম্পর্কীয় আলোচনা, থাকবে বিস্তারিত ইতিহাস। এর মাঝেমধ্যে বিপ্লবের স্থপতিসহ কিছু নিবেদিতপ্রাণের আলোচনাও আসবে। শেষদিকে বিপ্লবটি ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহের দিক ইঙ্গিত করব; সেখানে দেশ ও জাতির কতিপয় গাদ্দারের নামও আসবে।

প্রথম অধ্যায়

রেশমি রুমালের পটভূমি
ব্রিটিশদের নির্যাতন ও লুটতরাজ

- ব্রিটিশদের নির্যাতন-নিপীড়ন
- রাজনৈতিক নিপীড়ন
- শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
- অর্থনৈতিক আগ্রাসন
- ইংরেজদের লুটতরাজের দাস্তান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশদের নির্যাতন-নিপীড়ন

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ব্যর্থ বিপ্লবের পর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রশাসন উপমহাদেশব্যাপী নির্যাতন-নিপীড়ন, হিংস্রতা ও বর্বরতার যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে, নমরুদ আর ফিরআউনরা এসব দেখলে তারাও লজ্জায় কুঁকড়ে যেত। সবদিকে তখন হিন্দুস্থানি জনগণকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয়। ডাকাতি-লুটতরাজের মাধ্যমে তাদের দারিদ্রের গহীন কন্দরে ছুড়ে মারা হয়। অভিজাত সম্পদশালী ও খান্দানি লোক—যারা গতকালও হীরে-মতি নিয়ে মত্ত ছিলেন, পরদিন একমুঠো অন্নের জন্য তাদেরকেই রিক্তহস্তে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ফিরতে দেখা যায়। হিন্দুস্থানের অন্যান্য শহরের কথা নাহয় বাদ দেওয়া যাক, মির্জা গালিবের ভাষায়—দিল্লি শহরকেই ডাকাত শিখরা সাত দিনব্যাপী লুটপাট করে। শুধু কি দিল্লি? না, হিন্দুস্থানের কোনো অজপাড়াগাঁ-ই এই লুণ্ঠনের আওতার বাইরে ছিল না। বোম্বাই, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ইলাহাবাদ, আগ্রা, মিরাট, পানিপথ, গড়গাঁও, লুধিয়ানা, শিয়ালকোট, পেশোয়ার প্রভৃতি শহরে লুটপাট চালাতে সেনাবাহিনীর গুন্ডাদের ছুটি দেওয়া হয়। তা ছাড়া নিরপরাধ কৃষকশ্রেণি—বিপ্লবের সঙ্গে যাদের দূরতম সম্পর্কও ছিল না, তাদের ওপর এমনসব কর ও খাজনা আরোপ করা হয়, যার ফলে তারা দিন দিন দারিদ্র্যসীমার নিচে ধাবিত হয়। দেশি-বিদেশি পণ্যের মান পৃথকীকরণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়। হিন্দুস্থানের বিশ্বজয়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ষড়যন্ত্র করে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়, যার কারণে আজ এগুলোর অস্তিত্ব কোনো জাদুঘরেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোটকথা, একদিকে যেমন দেশকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করা হয়, তেমনি হত্যা, গুম, খুন আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরিবেশকে বিভীষিকাময় করে তোলা হয়। সভ্যতার ওই ঠিকাদাররা সেদিন যা করে, তা দেখে মানবতা হতবাক হয়ে কনিষ্ঠা আঙুল কামড়ায়। সেদিন মানবাধিকারের ওই ঢোলবাদকরা হিংস্রতা ও বর্বরতার যে স্বাক্ষর রাখে; আকাশের মৌন অধিবাসী তারকারা বোধহয় তাদের সৃষ্টিকাল থেকে এমন বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেনি!

সহজ কথায়, মানবতা আর আভিজাত্যের ওপর খাজনা আরোপ করা হয়। কোনো শরিফ-সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানির ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা ছিল না। শুধু তা-ই নয়; তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম ধর্মের ওপর আঘাত হানা হয়। স্কুল-কলেজ আর হাসপাতালগুলো ছিল খ্রিষ্টবাদ প্রচারের একেকটা মজবুত ঘাঁটি। বাজারসহ লোকালয়সমূহে ঝুলত খ্রিষ্টবাদের সত্যতার সাইন। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে পাদরিদের আমদানি করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসানো হতো বিতর্কের জমকালো আসর। পাদরি আর সেনা-অফিসারদের আয়োজনে এসব বিতর্কসভায় হিন্দুস্থানিদের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে পুরীষ উদ্‌ঘারের পাশাপাশি তাদের ইমান-আকিদা আর ধর্মগুরুদের নিয়ে মশকরা করে দাঙ্গার অজুহাত খুঁজে বেড়ানো হতো। বিশেষ করে ইসলামের বিরোধিতা এবং ইসলামি বিধিবিধানের ওপর অমূলক অভিযোগ উত্থাপনের একাডেমিক প্রয়াস চালানো হতো। কারও মাথায় টুপি কিংবা মুখে দাড়ি দেখামাত্র মৌলবি সন্দেহে হত্যা করা ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। মৌলবি হওয়াটাই ছিল তাদের কাছে অপরাধী হওয়ার অন্যতম প্রমাণ।

দেশে ইসলামি কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি ছিল না। দিল্লির রাহিমিয়া মাদরাসাটি ছিল মুসলিমদের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যার তত্ত্বাবধানে ছিলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজ ও শাহ আবদুল গনি রাহ.-এর মতো প্রখ্যাত সব বুজুর্গ। যেখান থেকে বের হন ইসমাইল শহিদের মতো অগ্নিগর্ভ ব্যক্তিত্ব, রাশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি ও কাসিম নানুতুবির মতো জিহাদি সংগঠক, ফাজলে হক খায়রাবাদির মতো সত্যের নির্ভীক কণ্ঠ। বিদ্যালয়টি তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়। সে পবিত্র ভূমি লালারাম কৃষ্ণ নামের এক হিন্দু ভূস্বামীর কাছে বিক্রি করা হয়। ১৯৪৭ অর্থাৎ, দেশভাগের সময় পর্যন্ত সেখানে 'লালারাম গলি' লিখিত সাইনবোর্ড ঝুলছিল; আর সেই মসজিদে আকবরি—যেখানে বসে শাহ আবদুল কাদির রাহ. একাধারে ৪০ বছর পবিত্র কুরআনের দারস দেন; যেখানে বসে তিনি কুরআনের সেই উর্দু তরজমা করেন, যা আজ পর্যন্ত উপমহাদেশীয় আলিমদের কাছে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত—শুধু এ অপরাধে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়; এখান থেকে কেন কুরআনের আলিম আর আজাদির তুর্যবাদকরা বেরিয়ে থাকেন? শুধু গুঁড়িয়ে দিয়েই শান্ত হয়নি, সেখানে তৈরি করে একটি ক্লাব, যা আজও আছে। আল্লাহ! আল্লাহ! যেখানে একসময় দিনরাত কুরআনের তালিম হতো, আজ সেখানে নগ্ন নারী-পুরুষের বেলেল্লা আড্ডা।

তা ছাড়া গোয়েন্দা-নেটওয়ার্ক এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, স্বাধীনতার নাম নেওয়া দূরে থাক, এর জন্য দুআ করাও ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। যদি কাউকে এমন দুআ করতে শোনা যেত—'আল্লাহ, জালিমদের থেকে মাজলুমদের উদ্ধার করো,' তখন তাকে বিদ্রোহী গণ্য করে হত্যা করা হতো!

দেওবন্দের এক বুজুর্গের ঘটনা আজও ইতিহাসের পাতায় খোদাই হয়ে আছে। তাহাজ্জুদের পর মাজলুমদের জন্য দুআর ইচ্ছা করলে আগে ছাদে উঠে আশেপাশে কোনো গোয়েন্দা ঘাপটি মেরে আছে কি না, তা দেখে নিতেন।

মোটকথা, তখন দেশব্যাপী বিরাজ করে এক বিভীষিকাময় অবস্থা। আমরা এসব কথা আরও তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করব। ধারাবাহিকভাবে পরিচ্ছেদে থাকবে—রাজনৈতিক নির্যাতন, চারিত্রিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে জুলুম এবং অর্থনৈতিক নিপীড়ন প্রসঙ্গ। আরেকটি পরিচ্ছেদে আমরা ইংরেজদের লুটতরাজের দাস্তান তুলে ধরব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক নিপীড়ন

স্যার সাইয়িদ আহমাদ ব্রিটিশ শাসনামলের একটা চিত্র আঁকতে গিয়ে নানা জায়গায় যা লিখেছেন, নিচে পয়েন্ট আকারে তা তুলে ধরা হলো :

১. **ইংরেজদের দম্ভে অভিজাত হিন্দুস্থানিদের অসহায় কান্না :** ইংরেজদের অহংকারী মনোভাব হিন্দুস্থানিদের তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। সরকার কি এ ব্যাপারে একেবারেই গাফিল? তারা কি দেখতে পায় না, অভিজাত হিন্দুস্থানিরা আজ সরকারি অত্যাচারের ভয়ে কত সন্ত্রস্ত? নিজেদের আত্মমর্যাদা রক্ষার চিন্তায় কত অস্থির? এ কথা কি তাহলে নিতান্তই অমূলক কিংবা গোপনীয় যে, সম্ভ্রান্তরা কর্তাদের সামনে নথিপত্র পাঠ করছেন, ভয়ে হাতজোড় করে কথা বলছেন; আর সাহেবদের উন্নাসিক আচরণ, রূঢ় ব্যবহার ও আত্মমর্যাদার ওপর আঘাতকারী বাক্যবাণে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছেন? তাদের অব্যক্ত কান্না হৃদয়ের কপাট-পাশে কেমন করে মাথা কুটে মরছে! তারা মনে মনে অনুতাপ করে বলছেন, 'হায়! রুটি পাওয়া গেল না, নাহয় এমন চাকরি থেকে বনে ঘাস কাটাও উত্তম![১]

২. **আমলারা সরকারের আচরণ যেভাবে দেখছিল :** মানুষ সরকারের নীতিমালাকে 'মধুর বিষ' 'মিছরির ছুরি' 'তুহিন স্পর্শ' প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করছে; আর আমরা যারা চাকরি করি, তাদের প্রত্যেককে এই ধারণা সর্বক্ষণ তাড়া করে ফিরছে—যদিও আজ সরকারের কোপানল থেকে রক্ষা পেয়েছি; কিন্তু আগামীকাল কি বাঁচতে পারব? আগামীকাল বেঁচে গেলেও পরশু নিশ্চয় রেহাই নেই। সবচেয়ে বড় প্রহসন, অন্তহীন দীনতার দিকে ঠেলে দেওয়ার পরও হিন্দুস্থানিদের আদালতের আশ্রয় নিতে হলে সরকারি স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে হচ্ছে![২]

---

১ *আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ* : ৪২০।

২ প্রাগুক্ত : ৪২২।

৩. **ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ইংরেজদের গুন্ডামি :** দূরদর্শিতার অভাব আর অহংকারে স্ফীত ইংরেজ সরকার হিন্দুস্থানবাসীর ধর্মের ওপর আঘাত হেনে খেপিয়ে তোলার অপচেষ্টায় মেতে থাকত। কলহপূর্ণ ধর্মীয় লিফলেট আর গ্রন্থগুলো বিনা মূল্যে বিতরণ করত। এগুলোর মূল প্রতিপাদ্যে ভরপুর থাকত বিদ্বেষ ছড়ানোর উপাদান। এসব প্রচারপত্রে হিন্দুস্থানবাসীর ধর্মীয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের কুরুচিপূর্ণ কুৎসা গাওয়া থাকত। পাদরিরা পুলিশ কনস্টেবলদের ছত্রছায়ায় বাজার, মেলা, হিন্দুদের পুজোর আসর আর মুসলিমদের ওয়াজ-মাহফিলে অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়ে নানান আপত্তি তুলত। তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিয়ে মশকরা করত। এতে যদিও হিন্দুস্থানবাসী দুঃখে মরে যেত, তথাপি প্রাণের ভয়ে তাদের নীরবে তা হজম করতে হতো।

৪. **শিক্ষার নামে খ্রিষ্টবাদের দীক্ষা :** ব্রিটিশ সরকার তখন দেশে প্রচুর মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এসব স্কুলে কেবল ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া হতো। স্কুল দ্বারা মূলত হিন্দুস্থানিদের খ্রিষ্টান বানানোই উদ্দেশ্য ছিল। এ দাবির পেছনে প্রচুর কারণও বিদ্যমান। যেমন, পরীক্ষা কেবল ধর্মীয় বিষয়েই নেওয়া হতো। কচি-কচি ছেলে-মেয়েদের জিজ্ঞেস করা হতো, 'তোমাদের প্রভু কে?' 'কে তোমাদের মুক্তিদাতা?' প্রশ্নগুলোর জবাব খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাসের অনুকূলে দেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে অধিক নম্বর আর বিরাট পুরস্কার দেওয়া হতো। সাধারণ মানুষ দারিদ্রের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুন্দর দেখে যেতে এসব স্কুলে পাঠাত; কিন্তু হায়, ওদের গড়ে তোলা হতো জাতিবিদ্বেষী এক একটা কুলাঙ্গার রূপে। জনগণ এসব বুঝলেও তাদের করার কিছুই ছিল না। শিক্ষামাধ্যমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাধ্যও ছিল না। এসব স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টর—লোকেরা যাদের কালাপাদরি নামে ডাকত, তাদের দেওয়া সার্টিফিকেটের ওপরই চাকরি নির্ভরশীল ছিল। এদের প্রত্যয়ন ছাড়া চাকরির স্বপ্ন স্বপ্নই থাকত।

৫. **ক্ষমতায় হিন্দুস্থানিদের প্রভাবহীন রাখা :** সরকারি কাউন্সিলে হিন্দুস্থানিদের দুঃখ-দুর্দশা উত্থাপনের জন্য প্রতিনিধিত্বের কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। সরকার ছিল অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী। তারা এখানকার জনগণের মনমানসিকতা ও স্বভাবজাত চাহিদা সম্পর্কে ছিল সম্যক অনবহিত। প্রশাসনের কোনো স্তরে তাদের উপস্থিতি ছিল না।[৩]

---

[৩] প্রাগুক্ত : ১১১।

৬. **প্রাণের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করত না :** দেশের দুঃখ-দুর্দশার চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন, সরকারের ভয়ে কেউ সত্যকথা; বিশেষ করে সরকারবিরোধী কোনো কথা বলার সাহস রাখত না। সবাই প্রাণের ভয়ে নেতা আর আমলাদের খোশামোদ করে যেত। মর্মে মর্মে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেলেও তাদের অন্তর্ভেদী কান্নার শব্দ পেত না। অন্তহীন নিপীড়নের পরও নতুন নতুন কালাকানুনের বিরুদ্ধে কথা না বলে অসহায়ের মতো নীরবতা পালন ছাড়া কোনো উপায় ছিল না কারও।[৪]

স্যার সাইয়িদ আহমাদ বর্ণিত নির্যাতনের এসব আখ্যান নিঃসন্দেহে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব-পূর্ববর্তী যুগের। বিপ্লবের পর অবস্থায় সামান্যতম এদিক-সেদিক হয়েছিল? তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে, বিপ্লব পরবর্তীকালে অবস্থা আরও করুণ হয়ে ওঠে।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন নিপীড়নের হার কালচক্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিদ্যুতের গতি পায়। প্রশাসনিক পেষণযন্ত্রে ফেলে নিরীহ হিন্দুস্থানিদের যেন আখমাড়াই দেওয়া হয়।

আপনি নিজের বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বলুন, যে দেশের জনগণকে যখন ইচ্ছা অকারণে ফাঁসিতে ঝোলানো, শুয়োরের চামড়ার সঙ্গে সেলাই করে জীবন্ত পোড়ানো, শুয়োরের চর্বি গায়ে মাখিয়ে শিক-কাবাব তৈরির মতো দাউদাউ করে জ্বলা অঙ্গারের উপর লটকে রাখা এবং তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে দাগিয়ে স্পন্দিত লাশের বীভৎস দৃশ্য উপভোগ; এসব ছাড়াও অকল্পনীয় সব নির্যাতন-নিপীড়নকে সভ্যতার বাজারে ফেরি করা হয়—সে দেশের রাজনৈতিক চিত্র কী হতে পারে? কোনো ইতিহাসবিদের পক্ষে কি এর নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব? নরপশুগুলো সেদিন কী ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, বিশ্ববাসীকে তা জানানোর কি সঠিক কোনো ভাষা রয়েছে? বা সেদিন হিন্দুস্থানিদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই ভয়াবহ অবস্থার অনুমান করা কি বর্তমানে মোটেও সম্ভব?

মোটকথা, সেই অন্তর্বর্তী কালটা ছিল এমন এক নৈরাশ্যঘন বেদনার দাস্তান, যার চিত্রায়ণ কোনো ইতিহাসবিদের সাধ্যের আওতায় নেই। আমরা এখানে সে বর্ণনায় যাব না। কারণ, এ বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে পাঠক মনে করবে, আসলে এ এক গোঁড়া জাতীয়তাবাদীর আবেগপ্রবণ প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। তবে পাঠকের বিশ্বাস জন্মাতে আমরা ইংরেজ ইতিহাসবিদদের লেখায় ছিটেফোঁটা যে দুয়েকটা সত্য এসেছে, সেগুলো থেকে কিঞ্চিত নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস পাব, যাতে পাঠক আমাদের দাবিকে আবেগের

[৪] প্রাগুক্ত, *রওশন মুসতাকবিল* : ২৬৬।

বহিঃপ্রকাশ বলে ফেলতে না পরেন। তারা যাতে এ কথা অনুধাবন করতে পারেন, আজ আমরা নিজেদের ধমনিতে যাঁদের রক্তের উত্তরাধিকার বহন করেও ইংরেজদের অনুকরণ আর মনস্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যস্ত, তাঁরা সেই ভয়ংকর দিনগুলো কীভাবে মোকাবিলা করে আমাদের জন্য রেখে গেছেন দীনি আমানত ও জাতীয়তাবোধের তীক্ষ্ণ অনুভূতি। আসুন, এবার সেই রক্তাক্ত অধ্যায়ের কয়েকটা পাতা একটু উলটে দেখি।

এক. ইংরেজদের বয়ানে নির্যাতন-নিপীড়নের করুণ দৃশ্য

এক ইংরেজ ইতিহাসবিদ মিরাটের একটি ঘটনাকে এভাবে ক্যামেরাবন্দি করেছেন—উর্দি পরিহিত ৮৫ জন সেনাকে বন্দুক আর বেয়নেটের প্রহরায় সামরিক আদালতে আনা হয়। পরে নিকৃষ্টতম অপরাধী হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের উর্দি ও পদবিগুলো কেড়ে নেওয়া হয়; আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের অপরাধের দণ্ডাদেশও শোনানো হয়। এরপর লৌহজিঞ্জির এনে তাদের হাত-পায়ে অসম্মানের উজ্জ্বল নিদর্শন তথা হাতকড়া ও বেড়ি পড়ানো হয়।

দৃশ্যটা দেখে বাকি জওয়ানরাও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা সঙ্গী-সাথিদের দুঃখজনক এ পরিণতি দেখে নিজেদের ভবিষ্যৎ অনুরূপই কল্পনা করে। তাদের জন্য হৃদয়ে রক্তক্ষরণ অনুভব করে। এই হতভাগাদের মধ্যে কতিপয় সদস্য নিজ নিজ প্লাটুনে ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাদের সাথিরা জানত এই হতভাগারা কয়েকবার ব্রিটিশের সাহায্য-সহযোগিতায় নিজেদের মৃত্যুর মুখে নির্দ্বিধায় ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু ওরা হাত উঁচিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার পরও যখন জীবনের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারেনি, সর্বোপরি যখন সাথিদের নির্জীব ও কাপুরুষে অবস্থান দেখে ওদের পৌরুষ আর আত্মমর্যাদাবোধের শেকল ধরে নাড়া দিচ্ছিল, তাদের ঝাঁকি দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করছিল; তখন নিশ্চয় সেখানে এমন কোনো হিন্দুস্থানি জওয়ান ছিল না, যে তার অন্তরে হতাশা, ঘৃণা আর প্রতিশোধের মিশ্র অনুভূতির স্পন্দন অনুভব করেনি। যার পায়ের পাতার রক্ত ফিনকি দিয়ে মাথায় ওঠেনি; কিন্তু তাদের মাথার খুলির দিকে তাক করা বন্দুকের নল আর গোঁড়া সেনাদের হাতে থাকা খঞ্জরের ভয়ংকর ঝলকানি সে অনুভূতিকে ভোঁতা বানিয়ে দেয়। পরে কয়েদিদের সেসব সেলে নেওয়া হয়, যেগুলোর দায়িত্ব ছিল তাদেরই সঙ্গী-সাথিদের ওপর।[৫]

একটু অনুমান করুন, সেই হিংস্র-বর্বর প্রশাসনের জুলুমবাজি আর স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা ছিল কত অসীম; আর হিন্দুস্থানিদের অসহায়ত্বের পর্যায় ছিল কত বেদনাদায়ক!

---

[৫] *ইনকিলাবে ১৮৫৭ কি তাহরিক কা দুসরা রুখ* : ২৮।

অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার কুপার লেখেন, মন্টগোমারির নির্দেশে ব্রিটিশের ওফাদারখ্যাত পাঞ্জাবের শিখ প্লাটুনের একজন সুবাদার, অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীর একজন রিসালদার এবং একজন জেল-দারোগাকে দায়িত্ব আদায়ে ত্রুটির অজুহাতে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। অত্যাচারের ভাষায় জনগণকে এ বার্তা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল যে, পাঞ্জাবের শাসকরা নিঃশর্ত আনুগত্য চায়। আসলে এ দেশে তাদের টিকে থাকার একমাত্র পথই ছিল এমন পন্থা অবলম্বন করা, যাতে জনগণ ভীত হয়ে তাদের আনুগত্য মেনে নেয়। নতুবা জনগণের ধৈর্যের ওপর তাদের মসনদ স্থিতিশীল হবে, এটা তারা ভাবতেও রাজি ছিল না। এ ছিল তাদের কাছে পরাজয়ের শামিল।[৬]

একটু চিন্তা করুন, জনগণের ওপর ভীতি জিইয়ে রাখার দুষ্ট অভিপ্রায়ে যে সরকার তার স্বাধীন নাগরিকদের ওপর কথায় কথায় অত্যাচারের স্টিমরোলার চালায়, ফাঁসিতে ঝোলায়, গুলি করে হত্যা করে, আবার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দোহাই দিয়ে এই শাস্তিকে মামুলি আখ্যা দেয়; সে সরকারই আবার বিশ্বজোড়া মানবাধিকারের বগলবাদ্য বাজায়!

কুপার অন্যত্র লেখেন, আমাদের বন্দিদের সামনে মুক্তির একটামাত্র সহজ পথই খোলা ছিল, সেটা ছিল কয়েদখানার সীমাহীন শাস্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা সবাই একযোগে বলবে—'চল চল, ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে চল'।

বিজয়োন্মত্তা এক মহিলা পাদরি লেখেন, একবার বিপুলসংখ্যক বিদ্রোহীকে বন্দি করে আনা হলে তাদের গির্জার বিছানাপত্র পরিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও তারা কাজটিকে নিজেদের আত্মমর্যাদার ওপর পৈশাচিক আঘাত হিসেবেই গণ্য করছিলেন। তথাপি বন্দুকের নলের খোঁচায় বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হয়। অবশ্য তাদের কতিপয় সাথি মুক্তির আশায় খুব স্ফূর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েই কাজটি করছিলেন; কিন্তু সেটা ছিল ওদের কল্পনাবিলাসমাত্র। কাজ শেষ হওয়ার পর তাদের কাউকে মুক্তি দেওয়া হয়নি।

মেজেন্ডি লেখেন, যে রাত আমরা মসজিদের প্রহরায় নিয়োজিত ছিলাম, সে রাতটা আমাদের বিনিদ্র অবস্থায়ই কেটেছিল। সকাল থেকে যাদের বন্দি করে আনা হয়েছিল, তাদের হত্যা করতে করতে অনেক রাত হয়ে যায়![৭]

ঘটনাটি ছিল লাহোরের শাহি মসজিদ-সংক্রান্ত। কয়েদিরা ছিলেন শেখপুরা, গুজরানওয়ালা আর মন্টগোমারির অধিবাসী। মসজিদে এনে শাস্তি দেওয়ার কারণ ছিল, তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এ পাশবিকতা দিয়ে আসলে মুসলিমদের অনুভূতিকে আহত করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। পরোক্ষভাবে বলে দেওয়া হচ্ছিল, 'তোমাদের মসজিদই হবে তোমাদের বধ্যভূমি!'

---

[৬] প্রাগুক্ত : ৪০।

[৭] প্রাগুক্ত : ৪৫, ৪৬।

টাইমস পত্রিকার সম্পাদক লেখেন, বিদ্রোহ ঘোষণার মাত্র ৪৮ ঘণ্টায়ই ৫০০ মানুষকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো হয়। কথিত বিদ্রোহের অভিযোগে যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়, তারা ছিলেন সে-সকল অসহায় সাধারণ লোক, যারা এই ডামাঢোলে নিজেদের নিরাপদ রাখতে ঘর ছেড়ে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এ ছাড়া দুর্গম রাস্তা পাড়ি দেওয়ার ধকল আর ক্ষুৎপিপাসায় এমনিতেই তারা ছিলেন আধমরার মতো।[৮]

এক ইংরেজ অফিসার লেখেন, এত বিপুলসংখ্যক হিন্দুস্থানিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়, যা বর্ণনারও অতীত। ইলাহাবাদ থেকে কানপুর আসতে মাত্র দুদিনের মধ্যেই ৪২ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আর ১২ জনকে শুধু এ অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয় যে, সেনারা যখন মার্চ করে আসে, তখন তাদের মুখ বিপরীতমুখী ছিল কেন! যেখানেই সেনাবাহিনী অবকাশ-যাপন করত, সেখানকার পার্শ্ববর্তী বস্তিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। এসব ঘটনা কানপুরের ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবেও বিবেচনা করা যায় না। কেননা, কানপুরের ঘটনা এর অনেক পরে ঘটেছে।[৯]

থমসন একপর্যায়ে আবেগাপ্লুত হয়ে লেখেন, আজও পার্লামেন্টের রেকর্ডপত্র উলটালে আমাদের তখনকার ভারতীয় গভর্নমেন্টের সেসব নথিপত্র পাওয়া যায়, যেগুলো পাঠে এ সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে—বিদ্রোহী ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

এক ইংরেজ অফিসার তার বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে লিখে, আমাদের এক অফিসার একজন অভিযুক্তকে বলেন 'তোমাকে এই শর্তে মুক্তি দিতে পারি—তুমি এমন তিনজনের নাম আমাকে বলবে, আমরা যাদের হত্যা করতে পারি। সে তিনজনের নাম উল্লেখ করলে আমরা ওদের ধরে এনে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেই।'

আরেক ইংরেজ লেখেন, দিল্লিতে রক্তলোলুপ সিপাহিরা তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে জল্লাদদের হাতে বখশিশ গুঁজে দিয়ে বলত, তারা যেন লাশকে দীর্ঘক্ষণ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখে, যাতে রক্তখেকো এই হিংস্র বন্য ইতররা ওদের মৃত্যুকালীন বীভৎস দৃশ্য অবলোকন করে তাদের বিকৃত হৃদয়াকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে! এ জন্যই জাজরার নবাবকে প্রাণ দিতে অনেক সময় লেগেছিল।

আরেক ইংরেজ ইতিহাসবিদ লেখেন, বেনারস, ইলাহাবাদ ও কানপুরে সংঘটিত ঘটনার আগে কতিপয় শিশুকে এই অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয় যে, তারা শিশুসুলভ চপলতায় বিদ্রোহীদের পতাকা হাতে মিছিল মিছিল খেলা করে। মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী আদালতের

---

[৮] প্রাগুক্ত : ৫৯।

[৯] প্রাগুক্ত : ৪০।

এ হৃদয়বিদারক পরোয়ানা শুনে এক অফিসার কমান্ডিং অফিসারের সামনে গিয়ে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে আবেদন করেন, 'স্যার, অনুগ্রহপূর্বক এ শিশুগুলোকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হোক।' কিন্তু হায়! তার সে কান্না অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হয়।

শুধু এ ঘটনাই নয়; এ ধারাবাহিকতায় এমনও অনেক ঘটনা রয়েছে, যেখানে প্রহসনমূলক আদালতে যাওয়ারও কোনো গরজ দেখানো হয়নি; বরং সন্দেহ হওয়ামাত্রই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে!

থমসন আবেগপ্রবণ হয়ে লেখেন, ফাঁসি দিতে স্বেচ্ছাভিত্তিক কেন্দ্র বানানো হয়। এই স্বেচ্ছাকর্মীরা যখন ফাঁসি দেওয়ার গরজে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেত, তখন দেখা যেত তাদের কাছে ফাঁসি দেওয়ার পর্যাপ্ত পরিমাণ সরঞ্জামও নেই। অনুরূপ তাদের অনেকে ফাঁসি দেওয়ার কলাকৌশল সম্পর্কেও ছিল অনভিজ্ঞ। এক স্বেচ্ছাকর্মী তার বিজয়ের গর্ব প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, 'আমরা ফাঁসি দিতে সাধারণত বড় আমগাছ আর হাতি ব্যবহার করতাম। অর্থাৎ, অভিযুক্তকে হাতিতে চড়িয়ে আমগাছের নিচে নিয়ে যেতাম। পরে তার গলায় রশি লাগিয়ে হাতিকে হাঁকিয়ে নিতাম। ফলে অভিযুক্ত লোকটি তড়পাতে তড়পাতে প্রাণ বিসর্জন করত। অনেক সময় ঝুলন্ত লোকটি ইংরেজি ৮ (আট) সংখ্যার মতো কুঁকড়ে যেত!'[১০]

এক ইংরেজ তার তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে লেখেন, লক্ষ্ণৌ শহর করায়ত্তের পর হত্যার বাজার গরম করা হয়। কাউকে হিন্দুস্থানি বলে চিহ্নিত করার পরই লোকটি বিদ্রোহী নাকি সাধারণ নাগরিক, না সামরিক বাহিনীর সদস্য, তা বাছবিচার না করেই নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এ ব্যাপারে কেউ তাদের প্রশ্ন করার ছিল না। প্রশ্ন করার কোনো সুযোগও ছিল না। কালো চামড়ার অধিকারী হওয়াটাই ছিল তাদের কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার বড় প্রমাণ। হত্যার জন্য একফালি রশি আর একটা গাছের ডালই ছিল যথেষ্ট![১১]

থমসন লেখেন, দিল্লির এক উঁচু জায়গায় চতুষ্কোণাকার একটি ফাঁসির মঞ্চ বানিয়ে রাখা হয়। সেখানে প্রতিদিন পাঁচ-ছয়জন করে হিন্দুস্থানিকে ফাঁসি দেওয়া হতো; আর পাশে বসে ইংরেজ অফিসারদের প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট উজাড় করতে দেখা যেত![১২]

নিকেলসন এডওয়ার্ডের কাছে এক চিঠিতে লেখেন, 'দিল্লিতে ইংরেজ নারী ও শিশুদের হন্তারকদের শায়েস্তা করতে আমাদের কাছে এমন একটা আইন থাকা চাই, যা এদের

[১০] প্রাগুক্ত : ৬৩, ৬৪, ৬৫।

[১১] প্রাগুক্ত : ৬৮।

[১২] প্রাগুক্ত : ৬৬।

পুড়িয়ে মারার অনুমতি আমাদের থাকবে; অথবা তাদের জীবন্ত শরীর থেকে মাংস আর চামড়া ছিলে তুলতে অনুমতি দেবে; কিংবা গরম লৌহশলাকা দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে ওদের হত্যা করতে বলবে। 'এই জালিমগুলোকে শুধু ফাঁসি দিয়ে হত্যা করতে হবে; অন্য কোনো পন্থায় নয়'—এমনটা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। হায়! আমি যদি পৃথিবীর কোনো অজানা প্রান্তে চলে যেতাম; আর মন উজাড় করে তাদের শাস্তি দিয়ে হত্যা করতে পারতাম!'

সভ্যতা ও চরিত্রের নমুনাটা প্রত্যক্ষ করুন! ওরা কি মানবতা ও লজ্জাবোধ পদতলে পিষ্ট করে রক্তখেকো হিংস্র পশুতে পরিণত হয়ে যায়নি?[১৩]

থমসন আরেকটু এগিয়ে লেখেন, 'নিকেলসনকে তার আশা পূরণ করতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি।' মিউপ্যারি থমসন তার কতিপয় কয়েদিকে বেদনাদায়ক অবস্থার বর্ণনা-সংবলিত এক চিঠিতে হ্যাজ ক্যাটনকে লেখেন, 'বিকেলের দিকে এক শিখ আরদালি আমার তাঁবুতে এসে অভিবাদনপূর্বক আমাকে উদ্দেশ করে বলে, স্যার, বন্দিদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনি সেটা দেখতে চান? কথাটা শুনে তৎক্ষণাৎ বন্দিদের তাঁবুর দিকে যাই। সেখানে গিয়ে হতভাগা মুসলিমদের অন্তিম মুহূর্তের যে হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখি, তাতে আমি একেবারে বাকহারা হয়ে পড়ি। দেখতে পাই, তাদের সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করে অণ্ডকোষগুলো কষে বাঁধা হয়েছে এবং তামার তপ্তশলাকা দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে দাগানো হচ্ছে! লোমহর্ষক এ দৃশ্য দেখার পর আমার পিস্তল দিয়ে তাদের জীবন শেষ করাই আমার পক্ষ থেকে তাদের ওপর বড় অনুগ্রহ মনে করি!'[১৪]

একজায়গায় এসে থমসন দারুণভাবে খেপে যান। সত্যপ্রকাশের বিপুল তাড়নায় লেখেন, এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হলো, কয়েদিদের পোড়া মাংসের গন্ধে পরিবেশ ক্রমেই বিষিয়ে উঠছিল!

হায়রে সভ্যতা! ঊনবিংশ শতাব্দীর যে মুহূর্তে পাশ্চাত্যজগত সভ্যতা ও মানবতাবোধের ঢোল পেটাচ্ছিল, সেই অভিশপ্ত ক্ষণেই দেখা যাচ্ছিল কিছু মানুষ মানুষেরই জ্বালানো আগুনে পুড়ে মরছে; আর শিখ ও ইংরেজ অফিসাররা পাশেই টুলিতে বসে অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে এ নারকীয় দৃশ্য উপভোগ করছে! এ যেন ছিল তাদের কাছে বিনোদনের একটা অংশ![১৫]

---

[১৩] প্রাগুক্ত : ৩৮।

[১৪] প্রাগুক্ত : ৪০।

[১৫] প্রাগুক্ত : ৪২।

এডওয়ার্ড থমসন লেখেন, এসব ঘটনার ফলে মস্তিষ্কে এমনই প্রভাব পড়ে যে, নবাব মাইনুদ্দিনের লেখা এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থটি পড়তেও মানুষ ভয়ে শিউরে উঠত। অথচ আজ অবধি তখনকার বাংলার গভর্নরের সরকারি রেকর্ডপত্রে এমনসব দলিল সংরক্ষিত আছে, যেগুলো দেখলে প্রতীয়মান হয়, ইংরেজরা অধিকহারেই এসব শাস্তি আরোপ করত।

এক ইংরেজ অফিসারের সেই চিঠি আজও সংরক্ষিত আছে, যেখানে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থা বর্ণনার পর এমন অমানবিক শাস্তির ওপর ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে লেখেন, 'অবশেষে আর কতকাল আমরা মানবতার ওপর এমন অমানবিক পন্থায় গরম লৌহশলাকা দাগানোর এবং তাদের শরীর ভুনা হওয়ার দৃশ্য দেখার কষ্ট সহ্য করে যাব?'[১৬]

থমসন লেখেন, *টাইমস অব ইন্ডিয়ার* সম্পাদক ডি লেইনর লিখেছেন, জীবিত মুসলমানকে শুয়োরের চামড়ার সঙ্গে সেলাই করা অথবা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানোর আগে তাদের গায়ে শুয়োরের চর্বি মর্দন করা; কিংবা তাদের জীবন্ত দাহ করা, অনুরূপ ভারতীয়দের একজনকে আরেকজনের সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হতে বাধ্য করা—এমনই ঘৃণিত আর হিংসাত্মক প্রতিশোধ; পৃথিবীর কোনো সভ্যতাই এমন ইতরোচিত প্রতিশোধের অনুমতি দেয় না। আজ লজ্জায় আমাদের ঘাড় কুঁকড়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় এটা খ্রিস্টবাদের ললাটে একটা বিশ্রী কলঙ্কচিহ্ন। অবশ্যই এর দায়ভার আমাদের বহন করতে হবে।[১৭]

থমসন এক ইংরেজ অফিসারের মায়ের কাছে লেখা চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, লর্ড এব্রিডস্ তার মায়ের কাছে লেখেন, 'আম্মা, আমরা পেশোয়ার থেকে ঝিলাম পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সফর করেছি এবং রাস্তায় রাস্তায় কিছু কাজও সমাধা করে গেছি। কাজটা হচ্ছে বিদ্রোহীদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া এবং ফাঁসির কাষ্ঠে তাদের ঝোলানো। মা, কামানের নলের সঙ্গে বেঁধে বিদ্রোহীদের হত্যার নতুন যে কৌশল আমরা রপ্ত করেছি, শুনে খুশি হবেন প্রক্রিয়াটা বিরাট ফায়দা দিচ্ছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে আমাদের ভীতি প্রবলভাবে কাজ করছে। যদিও প্রক্রিয়াটা অমানবিক হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।'[১৮]

এক প্রতিবেদকের বরাত দিয়ে থমসন লেখেন, যুদ্ধের পর বিপুলসংখ্যক হিন্দুস্থানিকে ফাঁসিতে লটকিয়ে হত্যা করা হয়; কিন্তু হিন্দুস্থানিরা এমন মৃত্যুর কোনোই পরোয়া করছে না—বিষয়টা প্রতীয়মান হওয়ার পরপরই সামরিক আদালত শাস্তির কৌশল

[১৬] প্রাগুক্ত : ৩৭।

[১৭] প্রাগুক্ত : ৪২।

[১৮] প্রাগুক্ত : ৩৪।

পালটিয়ে ঘোষণা দেয়, এখন থেকে চার-পাঁচজন করে কয়েদিকে একত্রে বেঁধে গুলি মেরে হত্যা করা হোক। নির্দেশের পর শাস্তিটা এভাবেই চলতে থাকে। একদিন প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ আর সেই সঙ্গে বিকট এক চিৎকার শুনে আমরা শিউরে উঠি। বিষয়টার খোঁজ নিলে এক অফিসার বলে, দৃশ্যটা ছিল সত্যিই বিভীষিকাময়। ঘটনাচক্রে কামানের ভেতর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বারুদ ঠাসা ছিল। ফলে ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদির শরীরের সমস্ত গোশত তুলোধুনা হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস সেই গোশতের রেণু আর রক্তকণিকা দর্শকদের ওপর ছড়িয়ে দেয়! এ ছাড়া তার ছিটকে পড়া মাথা এক পথচারীর ওপর গিয়ে পড়লে সে-ও কিছুটা আহত হয়![১৯]

এক ইংরেজের সূত্রে থমসন লেখেন, কুপার এর বর্ণনা : '১ আগস্ট ছিল মুসলিমদের ইদুল আজহা। ওই দিন মুসলিম সেনাদের ব্যারাকের বাইরে নিয়ে আসার একটা সংগত যুক্তি ছিল। ইদ উদ্‌যাপনের সুযোগ দেওয়ার নাম করে কিছুসংখ্যক মুসলিম অশ্বারোহী সেনাকে অমৃতসরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে ভিন্ন ধরনের এক কুরবানির জন্য কিছু ইংরেজ অফিসারসহ কতিপয় শিখ সেনা সেখানে থেকে যায়। এতে তারা নিশ্চিন্তে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়; কিন্তু দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতে লাশগুলোর দাফন নিয়ে তারা মারাত্মক বিপাকে পড়ে। ঘটনাচক্রে পাশেই একটা পরিত্যক্ত কূপ পেয়ে যায় এবং লাশগুলো সেখানেই গণকবর দেওয়া হয়!

১০ জন করে একটি একটি দলকে হত্যা করে যখন তারা ১৫০ জন সেনাকে হত্যা করে ফেলে, তখন হত্যাকারীদের এক বৃদ্ধ সদস্য হঠাৎ মূর্ছা খেয়ে পড়ে যায়। এতে তাদের খানিকটা সময় বিরতি নিতে হয়। পরে পুনরায় হত্যাযজ্ঞের পালা শুরু হয়। এভাবে নিহতের সংখ্যা ২৭৩-এ গিয়ে পৌঁছালে এক অফিসার এসে সংবাদ দেয়, বিদ্রোহীরা আর সেল থেকে বেরিয়ে আসছে না। এটা শুনে ওরা মারাত্মক রাগান্বিত হয়ে সেখানে পৌঁছে প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলে; কিন্তু তখন ওদের ওপর তাদের শরীরের ঝাল মেটানোর কোনো উপায় ছিল না। কেননা, দেখা যাচ্ছিল হতভাগাদের ৪৫টি লাশ সেখানে পড়ে আছে। এরা মূলত প্রচণ্ড ভয়, গরম, সফরের ধকল আর শ্বাসরুদ্ধকর ভিড়ের চাপে তড়পাতে তড়পাতে মারা যায়! এ অবস্থা দেখে তারা পার্শ্ববর্তী গ্রামের মেথরদের ডেকে লাশগুলো সেই অভিশপ্ত কূপে ফেলে দেয়।'[২০]

থমসন আরও লেখেন, কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই বর্বর কাজের ওপর ধন্যবাদ জানিয়ে জেনারেল লরেন্স ও মন্টগোমারি কুপারকে চিঠি লিখেছিলেন![২১]

---

[১৯] প্রাগুক্ত : ৩৬।

[২০] প্রাগুক্ত : ৫৫।

[২১] প্রাগুক্ত : ৫৭।

তিনি আরও লেখেন, শুধু যে শূলিতে চড়িয়েই আমাদের সেনারা ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়; বরং গ্রামাঞ্চলের হিন্দুস্থানি অসহায় বেসামরিক মানুষকে তাদের ঘরের বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে।[২২]

থমসন এই অবাধ বর্বর হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে নিচের ঘটনাগুলোও লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

প্রথম ঘটনা : ৩১ জুলাই ১৮৫৭ ব্রিটিশ কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেলের জারিকৃত এক ফরমানে হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটিশ শাসকদের বলে দেওয়া হয়, সুনির্দিষ্ট গুরুতর কোনো অন্যায় ছাড়া গ্রাম পুড়িয়ে ফেলার অভিযান বন্ধ করা হোক। এই ফরমানে বিচারপতিদের উদ্দেশ করে বলা হয়, নিরস্ত্র কোনো ব্যক্তিকে সেনা সন্দেহে শাস্তি দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া ফরমানে সামরিক আদালত কর্তৃক দেওয়া অনেক প্রাণদণ্ড আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশও মওকুফ করা হয়। এসব দণ্ড খুব নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই পালন করা হচ্ছিল, যা ছিল মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।[২৩]

দ্বিতীয় ঘটনা : ১০ আগস্ট গ্রান্টকে মধ্য-ভারতের গভর্নর পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তাকে নিযুক্তি দেওয়ার একমাত্র কারণ ছিল, নির্বিচারে সংঘটিত ফাঁসির শাস্তিটা যেন একটু নিয়ন্ত্রণে আনা যায়; কিন্তু দেখা যায় বিপুলসংখ্যক ইংরেজ ভাইসরয়ও গ্রান্টের নিযুক্তির প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বিক্ষোভ করছে। এমনকি তারা ফাঁসির নির্দেশ প্রত্যাহারকারী গ্রান্ট ও উদারপ্রাণ ক্যানিকে নিয়ে মশকরা করছে। তাদের নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজেদের ঘৃণ্য মনোবৃত্তির প্রতিফলন ঘটিয়ে চলছে।

তৃতীয় ঘটনা : আগস্টের সেই কালো দিনগুলোতে যখন তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজ আনজাম দিয়ে যাচ্ছিল; অর্থাৎ, বর্বর প্রতিশোধস্পৃহায় গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে চলছিল, তখন একদিন এক গ্রামে যাওয়ার পথে তাদের সহকর্মী একদল হিন্দুস্থানি সেনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং ইতরোচিত হিংসার বশে সেই লোকগুলোকে হত্যা করা হয়। এই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে স্বীকারপূর্বক *টাইমস অব ইন্ডিয়া* একে 'হিংস্র ন্যায়পরায়ণতা' বলে মন্তব্য করে। আর জেনারেল এডিটরিমের মন্তব্য ছিল—'এ হলো নিরপরাধ মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা।'[২৪]

থমসন নেইলের একটি নির্দেশনামার (যা তার ভাষায় বর্বর নির্দেশমালা) উদ্বৃতি দিয়ে লেখেন, রিনার্ড যখন কানপুরের অবরুদ্ধদের সহায়তায় এগিয়ে আসছিলেন, তখন তার

---

[২২] প্রাগুক্ত : ৬৩।

[২৩] প্রাগুক্ত : ৬৫।

[২৪] প্রাগুক্ত : ৪৪।

হাতে নেইলের এই নির্দেশনামা এসে পৌঁছায়; যেখানে বলা হয়, (চিহ্নিত করা কতকগুলো বস্তির ব্যাপারে) ওখানকার সকল পুরুষ অধিবাসীকে হত্যা করে ফেলবেন। বিদ্রোহী রেজিমেন্টের যে-সকল সেনা তাদের অপরাধমূলক তৎপরতার পক্ষে সন্তোষজনক কোনো উত্তর দিতে পারবে না, তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবেন। ফতেহপুর অঞ্চলটা অবরোধ করে সেখানকার সব বস্তি গুঁড়িয়ে দেবেন। কারণ, এ এলাকা হচ্ছে বিদ্রোহীদের আড্ডাখানা। লক্ষ রাখবেন, একজন বিদ্রোহী নেতাও যাতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। সেখানকার ডেপুটি কালেক্টরকে যেখানে পাবেন, সেখানেই গুলি মেরে হত্যা করে ফেলবেন। তার ছিন্ন মস্তকটা কোনো উঁচু টাওয়ারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবেন![২৫]

থমসন এক ইংরেজ অফিসারের লেখা থেকে উদ্বৃতি টেনে লেখেন, রাসেল তার দীর্ঘ আলোচনার পর লেখেন, 'বিদ্রোহীরা এ এলাকায় ছাউনি ফেলেছিল'—এটুকু অপরাধে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে ফেলা, শহরের পর শহর উজাড় করা মানবাধিকার ও ইনসাফের উলঙ্গ লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।[২৬]

অন্যত্র থমসন লেখেন, অবশেষে কতিপয় অফিসার এই বলে এমন পাইকারি হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেছিলেন—এ অবস্থা চলতে থাকলে তো শেষপর্যন্ত আমাদের সেনাবাহিনীকে দূর অভিযানে রসদ সরবরাহ ও সহায়তা-সংকটে ভুগতে হবে।[২৭]

আরও লেখেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে ফাঁসি দেওয়া হয়। সেখানে নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধের বাছবিচার করা হয়নি। গ্রামের পর গ্রাম আর ফসলে ভরা মাঠগুলো এমনভাবে বিরান করা হয়, যে কারণে ব্রিটিশের ওফাদার জনগণের মানসিকতায়ও পরিবর্তন এসে যায়। তারাও এটা ভাবতে বাধ্য হয়, তাদের গভর্নমেন্ট তো হিন্দুস্থানকে মুসলিম ও হিন্দুশূন্য খ্রিস্টান অধ্যুষিত একটা রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।[২৮]

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে লেখেন, ইংরেজরা শত শত মাইলব্যাপী প্রলম্বিত সড়কগুলোর উভয় পাশের গ্রামগুলোকে এমনভাবে বিরান করে দেয়, যার ফলে সেগুলো সুনসান মাঠের মতো ভূতুড়ে অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। দিল্লি থেকে বিদ্রোহীরা চলে গেলে সেখানে গণহত্যা চালানো হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতসমূহের রায়ে এমন শত শত মানুষকে ফাঁসিতে চড়ানো হয়, বিদ্রোহের সঙ্গে যাদের দূরতম সম্পর্কও ছিল না।'[২৯]

---

[২৫] প্রাগুক্ত : ৪৬।
[২৬] প্রাগুক্ত : ৫১।
[২৭] প্রাগুক্ত : ৬০।
[২৮] প্রাগুক্ত : ৬৭।
[২৯] প্রাগুক্ত : ৬৫।

থমসন লেখেন, বস্তিগুলোকে এ অবস্থায় জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করা হচ্ছিল যে, সেখানকার প্রতিটি ঘরে নারী-শিশু ও বৃদ্ধরা অর্গলবদ্ধ অবস্থায় ছিল।[৩০]

দিল্লি শহরে 'কাতলে আম' তথা সাধারণ হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ জারি করা হয়। অথচ সেখানে এমন অনেক মানুষ ছিলেন, যাদের ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত জানা ছিল— তারা ছিল আমাদের বিজয়প্রত্যাশী। আমাদের সেনাবাহিনীর জওয়ানরা কেবল রক্ত ঝরানোর আনন্দে হিন্দুস্থানের আরদালি থেকে নিয়ে ঘেষেড়াদের পর্যন্ত গুলি করে হত্যা করছিল।

অন্যত্র লেখেন, কানপুরের ঘটনার অনেক আগের কথা; একদিকে যেমন সামরিক আইন জারি করা হয়, তেমনি আইন প্রণয়ন কমিটিও মে ও জুন নাগাদ ভয়ংকর কিছু আইন প্রণয়ন করে। ইংরেজরা বড় হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের মতো সেগুলো বাস্তবায়ন করে। এ ছাড়া সামরিক ও সিভিল অফিসাররা জায়গায় জায়গায় ফায়ারিং স্কোয়াড স্থাপন করে অসংখ্য হিন্দুস্থানিকে হত্যা করে। অনেক সময় ভুয়া আদালতের ভুয়া হুকুমের মাধ্যমে ফাঁসি দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে নারী, শিশু, বৃদ্ধ কাউকে আলাদা করে দেখা হয়নি। এমন হত্যাকাণ্ডের পরও পুড়িয়ে মারার ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলছিল। বিশ্বাস না হলে আজও পার্লামেন্টের রেকর্ডপত্রের ফাইল ঘেঁটে তখনকার হিন্দুস্থানি গভর্নরের নথিপত্র বের করে দেখুন। দেখতে পাবেন সেখানে হিন্দুস্থানি নারী-শিশু-বৃদ্ধদের পুড়িয়ে মারার স্বীকৃতি রয়েছে। তাদের শুধু শূলিতে চড়িয়েই হত্যা করা হয়নি; বরং ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। গুলি খরচের ঝামেলায় তারা খুব কমই গেছে। এমনকি আমাদের জওয়ানরা গর্ব করে বলত, আমরা যথাসম্ভব কোনো হিন্দুস্থানিকে জীবিত ছেড়ে দিইনি।

তিনি বিস্তারিত বর্ণনায় লেখেন, লক্ষ্ণৌর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর সেখানে এমনভাবে হত্যার বাজার গরম করা হয়, লোকটি সেনা নাকি আওদাহ জেলার কোনো কৃষক, তা খতিয়ে দেখার কষ্ট করা হতো না। এমনকি তাদের যেমন কোনো প্রশ্ন করা হতো না, তেমনই নিজে থেকে তাদের পরিচয় দেওয়ারও কোনো অধিকার ছিল না। শুধু কালো চামড়ার অধিকারী হওয়াই ছিল তাদের অপরাধী হওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ। আর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে গাছের একটি ডাল আর এক গাছি রশিই ছিল যথেষ্ট। এগুলো পাওয়া না গেলে একটিমাত্র গুলি খরচ করা হতো। ফলে লোকটি সেখানেই স্তূপাকারে পড়ে থাকত।[৩১]

---

[৩০] *তাসবির কা দুসরা রুখ* : ৭৮।

[৩১] প্রাগুক্ত : ৬৮, ৬৯।

ব্রিটিশের বেধড়ক অত্যাচারের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি লেখেন, আমাদের সেনারা দিল্লিতে প্রবেশ করামাত্র যাকে যেখানে পায়, তাকে সেখানেই হত্যা করে। আর এদের সংখ্যাটাও ছিল বিপুল। আপনারা নিচে বর্ণিত একটি ঘটনা থেকেই বিপুলতার ব্যাপারটি আঁচ করতে পারবেন।

একটি ঘরে প্রায় ৪০-৫০ জন লোক আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের একজনও বিদ্রোহের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। তারা ছিল গ্রাম্য কৃষক ও অনুরূপ পেশার লোক। তারা আমাদের দয়ার ওপর ভরসা করে থেকে যায়। আমি সানন্দে (!) জানাতে পারি যে, তারা কেউই আমাদের জওয়ানদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাদের সবাইকে সেখানেই মৃত্যুর ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হয়।

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে লেখেন, নিরপরাধ শহরবাসীকে হাত জোড় করে ক্ষমাপ্রার্থনারত অবস্থায়ও গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি সে-সকল বুড়োকে পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে, পার্কিনসন রোগের ফলে যাদের হাত-পা কচি বাঁশের ডগার মতো কাঁপছিল।

থমসন *টাইমস* পত্রিকার প্রতিবেদকের বরাতে লেখেন, আমি দিল্লির বাজারে ঘোরাফেরা একদম ছেড়েই দিয়েছি। কেননা, রাস্তায় বেরোলেই এমনসব দৃশ্য চোখে পড়ে, যা ভাবতেও শরীরের লোমকুপগুলো কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই তো গতকাল এক অফিসারের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল জনা-বিশেক সেনা। হঠাৎ রাস্তার এক মোড়ে দেখতে পাই ১৪ জন নারীর মস্তকহীন দেহ পড়ে আছে। তাদের সবাইকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মহিলাদের নাকি তাদের স্বামীরাই হত্যা করেছে। কারণ, তাদের ভয় ছিল গোঁড়া সেনারা এদের নাগাল পেলে ওদের ইজ্জত হরণ না করে মারবে না। আরও জানতে পারি, স্ত্রীদের হত্যার পর নাকি তারাও আত্মহত্যা করে মারা গেছে। সত্যিই কয়েক কদম এগিয়ে গেলে আমরা সে লাশগুলোও দেখতে পাই!

এডওয়ার্ড থমসন লেখেন, আমাদের সেনারা মদের দোকানে হামলা চালিয়ে তা মাত্রাতিরিক্ত পান করত। পরে নেশায় বুঁদ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাকেই হাতের নাগালে পেত, তাকেই হত্যা করে ফেলত। অনেক সময় এরা নেশার ঘোরে নিজেদের লোকগুলোকেও মেরে ফেলত! কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এদের কোনো বিচার না করে ধর্মীয় পাগল বলে ছেড়ে দেওয়া হতো। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে যেন এ কথা বলে দেওয়া হতো, এদের ধারালো অস্ত্রের নিচে মাথা পেতে দেওয়াই হচ্ছে সাধুর পরিচয়।

থমসন আবেগভরা ভাষায় লেখেন, বিদ্রোহীদের অপরাধের তুলনায় দিল্লির সাধারণ মানুষকে হাজারগুণ বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। হাজার হাজার নারী-শিশুকে লোকালয় ছেড়ে গভীর জঙ্গলে হিংস্র পশুদের সঙ্গে বসবাস করতে হয়েছে। বাড়িতে তারা যা

কিছু রেখে গিয়েছিল, সেগুলো থেকে জীবনের মতো বঞ্চিত হতে হয়েছে। সেনারা যে ঘরেই অনুপ্রবেশ করেছে, তার প্রতিটি কোণ খোঁড়াখুঁড়ি করে মূল্যবান রত্নাদি উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আর যা নিতে পারেনি, তা-ও ভেঙেচুরে নষ্ট করে ফেলেছে।[৩২]

থমসন ইংরেজ ইতিহাসবিদ ওয়েলপুলের উদ্বৃতি দিয়ে লেখেন, ইংরেজদের দিল্লি শহর লুটতরাজ বর্বর নাদির শাহর লুটতরাজকে ম্লান করে দেয়। প্রকাশ্য রাস্তায় শূলির মঞ্চ তৈরি করা হয় এবং সেখানে দৈনিক পাঁচ-ছয়জন করে হিন্দুস্থানিকে শূলিবিদ্ধ করা হয়।

ওয়েলপুল লেখেন, এমন একটি শূলিমঞ্চে ৩ হাজার মানুষের প্রাণ বধ করা হয়। তাদের মধ্যে ১৭ জন ছিলেন শাহি খান্দানের সদস্য। *তাবসিরাতে তাওয়ারিখ* গ্রন্থের লেখক বলেন, দিল্লিতে ২৭ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এবং সাত দিনব্যাপী লুটতরাজ চালানো হয়।[৩৩]

শাহি খান্দান সম্পর্কে থমসন লেখেন, ১২৭৪ হিজরির ১ ও ২ সফর বাদশাহ বাহাদুরশাহ জাফরের বেয়াই এলাহি বখশের গুপ্তচরবৃত্তির সহায়তা নিয়ে মির্জা মোগল, মির্জা সুলতান ও মির্জা আবু বকর নামের তিন শাহজাদাকে 'মাকবারায়ে হুমায়ুন' থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়। পরে তাঁদের শিরশ্ছেদ করে ছিন্ন মস্তকগুলো বাদশাহর দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হৃদয়বিদারক এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে বাদশাহ একটু ম্লান হেসে বলেছিলেন, 'তৈমুরের খান্দানের বীর যুবকরা এভাবেই তাদের পিতার দরবারে এসে থাকে!'[৩৪]

উদ্বৃতিগুলো থমসন রচিত ও হুসামুদ্দিন অনূদিত *ইনকিলাবে ১৮৫৭ কি তাসবির কি দুসরি রুখ* গ্রন্থ থেকে সন্নিবেশিত। এগুলো লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, পাঠকরা যেন তখনকার ব্রিটিশ জুলুমবাজদের মানবাধিকারের ভয়াবহ লঙ্ঘনের বিষয়টি একটু আঁচ করতে পারেন। আশা করি এ কথাটাও ভুলে যাবেন না, তাদের সব অত্যাচারের মূল টার্গেট ছিলেন এ দেশের আলিমসমাজ। তাঁরাই ছিলেন মূলত এই বিশাল বিপ্লবের প্রবক্তা। যেমন, লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যুর লেখেন, মুসলিমদের দুর্বল আর প্রাণহীন করাটা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এমনটি ভাবার হয়তো সংগত কোনো কারণও থাকতে পারে। তবে যারা শিকারে অভ্যস্ত, তাদের নিশ্চয় এ অভিজ্ঞতাও আছে—কোনো সিংহের গায়ে আঁচড় লাগালে সেটি যতই দুর্বল, চলৎশক্তিহীন এবং মৃত্যুপথযাত্রী হোক না কেন, তার সত্তায় নিহিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে চারদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা আর তাণ্ডব ছড়িয়েই মৃত্যুকে বরণ করে থাকে।

---

[৩২] প্রাগুক্ত : ৬৮, ৬৯, ৭০।

[৩৩] প্রাগুক্ত : ৪৮।

[৩৪] প্রাগুক্ত : ৭৪।

স্যার উইলিয়াম মন্তব্যটি ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে; অর্থাৎ, ১৮৫৭-এর বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেই করেন। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়, তাদের দৃষ্টিতে আসল অপরাধী (?) ছিল মুসলিমরা। বিশেষ করে আলিমসমাজ। এ কথা তো দিবাকরের চেয়েও উজ্জ্বল যে, বেশির ভাগ শাস্তি আর কঠিনতম প্রক্রিয়াগুলো আলিমদের ওপরই পরিচালিত হতো। মাওলানা আহমাদ উল্লাহ শাহ মাদ্রাজি—যিনি লক্ষ্ণৌতে হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন, তাঁকে এক মহারাজার মাধ্যমে হত্যা করানো হয়। তাঁর ছিন্ন মস্তক বর্শায় গেঁথে হিন্দুস্থানের বড় বড় শহরে দেখানো হয়। মাওলানা ফাজলে হক খায়রাবাদি—যিনি ছিলেন বিপ্লব সংগঠকদের অন্যতম সদস্য; তদুপরি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তেও যিনি ছিলেন বেরেলি, আলিগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকার গভর্নর—তাঁকে ঘর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর শাস্তি নির্ধারণের জন্য লক্ষ্ণৌতে একটি বিশেষ ট্রাইবুনালও গঠন করা হয়। বিচার শুরু হলে যে লোক তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেয়, তাকে যখন তলব করা হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয়, 'তিনিই কি মাওলানা ফাজলে হক খায়রাবাদি?' তখন লোকটি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মাওলানাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'আজাদি ও জিহাদের ফাতওয়ায় স্বাক্ষর দানকারী মাওলানা তিনি কি না, তা আমি ঠিক করে বলতে পারব না।'

মাওলানা নিজেই ছিলেন নিজের উকিল। তিনি তাঁর ওপর আরোপিত সব কটি প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে খণ্ডন করেন। আদালত প্রাঙ্গনে উপস্থিত শত শত দর্শক তখন এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল—আগামীকালই তিনি মুক্তি পেতে যাচ্ছেন; কিন্তু পরদিন যখন রায় ঘোষণা দিতে এজলাস বসে, তখন মাওলানা অন্তহীন মনোবল নিয়ে উপস্থিত সকল জনতাকে স্তম্ভিত করে বলে ওঠেন, 'জেনে রেখো হে আজাদির হন্তারকরা, তোমাদের সাক্ষী যে সাক্ষ্য দেয়, তা ছিল নির্ভেজাল সত্য। আর এ কথাটিও সত্য যে, ফাতওয়াটি আমারই প্রদত্ত। এটা খোদ আমারই হাতে লেখা। এর ওপর স্বাক্ষরটাও আমার। তোমাদের সাক্ষী হয়তো আমাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েই এমন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকবে।' (আমাদের আত্মা তাঁর ওপর কুরবান হোক)।

আল্লাহর এ শার্দূল তখনো বুক ফুলিয়ে বলছিলেন, 'এখনো আমি আমার এ সিদ্ধান্তে অটল। অবশ্যই তোমরা জবরদখলকারী। তোমাদের সরকার সম্পূর্ণ অবৈধ। তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এমনই হয়ে থাকেন। তাঁরা প্রাণের মায়া ছেড়েই ময়দানে বেরিয়ে থাকেন। পরে শিয়ালের মতো পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর পরিবর্তে সিংহবিক্রমে লড়াই করে শাহাদাত বরণকে সৌভাগ্য ও মর্যাদার প্রতীক মনে করে থাকেন।'

মাওলানার এ বক্তব্য শুনে বিচারকরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারা কী সিদ্ধান্ত দেবে,

তা যেন ঠিক করতে পারছিল না। অবশেষে তাঁকে আন্দামানে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। আর এভাবেই নিখিল ভারতের এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। মাওলানা খায়রাবাদি আন্দামানে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে সেই অভিশপ্ত দ্বীপেই তিনি ইনতিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তা ছাড়া মাওলানা ফয়েজ আহমাদ বাদায়ুনি, মৌলবি আবদুল কাদির, মাওলানা উজির খান আকবারাবাদি, সাইয়িদ মুবারকশাহ রামপুরি, মাওলানা বেলায়েত আলি শাহ ইলাহাবাদি রাহ. প্রমুখকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং ফাঁসির মঞ্চে চড়েই তাঁরা দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যান।

এডওয়ার্ড থমসন নিজেই লেখেন, শুধু দিল্লি শহরেই ৫০০ আলিমকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। এবার আপনারাই অনুমান করুন, পুরো দেশে কত আলিমকে মৃত্যুর ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল! মাওলানা হাজি ইমদাদুল্লাহর অন্তরঙ্গ সাথি হাফিজ মাওলানা রমজান আলিও এই যুদ্ধে শহিদ হন। তবে মাওলানা ইমদাদুল্লাহ ও মাওলানা আবদুল গনি অজ্ঞাত পন্থায় হিজরত করে মক্কায় চলে যেতে সক্ষম হন। সেখানেই তাঁরা অবস্থান করতে থাকেন। সদরুস সুদুর মাওলানা সদরুদ্দিন আজারদাহ রাহ. ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করে লেখেন, شهدت بالحر 'শাহিদতু বিল হুররি।' (কেউ কেউ অবশ্য লিখেছেন, তিনি লেখেন 'শাহিদতু বিল খায়রি'।) সাধারণ মানুষ 'হুররি' দ্বারা স্বাধীনতাকেই বুঝছিল। মামলা দায়েরের পর মুফতি সাহেব বলেন, সেখানে 'বিল জাবরি' লেখা ছিল; শুধু নুকতাগুলো উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাখ্যার ফলে তিনি মুক্তি পান ঠিক, তবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

মাওলানা কাসিম নানুতুবির ওপরও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। তবে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। অবশেষে কতিপয় ব্যক্তির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার করা হয়। মাওলানা রাশিদ আহমাদ গাঙ্গুহিও গ্রেপ্তার হয়ে ছয় মাস কারাবরণ করেন। যেহেতু তাঁরা তখন বয়সে ছিলেন তরুণ এবং তখনো তাঁদের নামডাক তেমন একটা প্রচার পায়নি, তাই তাঁদের ওপর তেমন কঠোর কোনো শাস্তি আরোপ হয়নি। নতুবা তাঁরাও ছিলেন বিপ্লবের মধ্যমণি। কেননা, মুজাফফরনগর ও সাহারানপুরের আমির ছিলেন মাওলানা হাজি ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা রাশিদ আহমাদ প্রধান বিচারপতি আর মাওলানা কাসিম নানুতুবি সেনাপ্রধান। তাঁরা থানাভবন ও এর আশপাশ করায়ত্ত করার পর ইংরেজদের হেডকোয়ার্টার শামেলিও করায়ত্ত করে নেন। এমন অবস্থায় তাঁদের মুক্তি পাওয়া ছিল সম্পূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার; কিন্তু উল্লিখিত কারণ আর আল্লাহর গায়েবি সাহায্যে তাঁরা নিরাপদ থেকে যান। তাঁদের দিয়ে বোধহয় আল্লাহর আরও বড় কাজ করানোর ইচ্ছা ছিল।

দুই. ইংরেজদের ধোঁকা ও কূটচাল

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার শাসনক্ষমতা কোম্পানির হাত থেকে নিজেদের হাতে উঠিয়ে নেয় এবং রানি ভিক্টোরিয়ার সেই বাণীটি প্রচার করা হয়, যেখানে তিনি নিচের দুটি বিষয়ের ওপর বেশ গুরুত্বারোপ করেন :

- আজ থেকে অপরাধী ছাড়া হিন্দুস্থানি সাধারণ নাগরিকদের ওপর কোনো ধরনের অত্যাচার করা হবে না।
- রাষ্ট্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ভেতরে বা বাইরে কোনো সেনা অভিযান পরিচালিত হবে না।

কিন্তু এটা ছিল তাদের সেই অতীত কূটনীতি আর ধোঁকাবাজিরই একটা ধারাবাহিকতা। নতুবা হিন্দুস্থানের সীমান্ত সম্প্রসারণ আর সাম্রাজ্য বিস্তৃতির লক্ষ্যে তারা নিম্নোক্ত অভিযানগুলো পরিচালনা করে। এতে বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দুস্থানিদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি এসব অভিযান পরিচালনার ব্যয়ভারও বহন করতে বাধ্য করা হয়। অভিযানসমূহের নির্ঘণ্ট নিম্নরূপ :

- ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ভুটানে আধিপত্য বিস্তার করা হয়।
- ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার উত্তর সীমান্তে হামলা চালিয়ে তা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে মণিপুর রাজ্য কুক্ষিগত করা হয়।
- ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে চাতরাল রাজ্য উদরস্থ করা হয়।
- ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিরাহ রাজ্যে হামলা চালানো হয়।
- ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলে হামলা করা হয়। এতে ৪০ লাখ পাউন্ড ব্যয় হয়।
- ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সীমান্তের মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ পরিচালিত হয়। এতে ৪২ লাখ পাউন্ড ব্যয় হয়।
- ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিব্বত ও চীনে হামলা করা হয়। এতে ১ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড খরচ হয়।
- ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সীমান্তের মুজাহিদদের মোকাবিলায় পর্যায়ক্রমে ছয়টি অভিযান পরিচালিত হয়। এতে লাখ লাখ পাউন্ড ব্যয় হয়।

এসব অভিযানে হাজার হাজার হিন্দুস্থানি যুবক নিহত হয় এবং কোটি কোটি অঙ্কের ব্যয়ভার হিন্দুস্থানের জাতীয় রাজকোষের ওপর চাপানো হয়। এর ফলে আমাদের

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। দেশের অভ্যন্তর ছাড়াও বহির্বিশ্বে আরও অনেক অভিযান পরিচালিত হয়, সেগুলোতেও হিন্দুস্থানিদের বাধ্য হয়ে অংশ নিতে হয়। খরচের বোঝাটাও তাদের মাথায় চাপানো হয়। হিন্দুস্থানের জলপথের নিরাপত্তাবিধান ব্রিটিশের কাছে ছিল ফরজতুল্য। এ লক্ষ্যে তারা নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয় :

- ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ পাশার বিদ্রোহ দমাতে সুলতান আবদুল মাজিদ খানকে সহায়তা করে। এ লক্ষ্যে যে অভিযান পরিচালনা করা হয়, এর ব্যয়ভারও হিন্দুস্থানিদের রাজকোষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সুলতানকে সহায়তার নাম করে তারা এডেন বন্দরের আংশিক মালিকানা নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেয়। পরে কোনো এক অজুহাতে পুরো বন্দরটাই গ্রাস করে ফেলে, যা আজও তাদের কর্তৃত্বেই রয়ে গেছে।
- ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের খেদিব[৩৫] ইসমাইল পাশা ফরাসি কোম্পানির সহায়তায় সুয়েজ খাল খনন করেন; কিন্তু ইংরেজরা খেদিবের সঙ্গে এক গোপন চুক্তির ভিত্তিতে ৩৯ লাখ ৭৬ হাজার ৫৮২ পাউন্ড মূল্যে পুরো খালটির কর্তৃত্ব কিনে নেয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এ ট্রানজিটটি তাদের করায়ত্তে চলে আসে।
- তারপর ইসমাইল পাশার নতজানুহীন চলাফেরায় অতিষ্ঠ হয়ে ইংরেজরা ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর নির্বিচারে বোমাবাজি শুরু করে। লাগাতার দু-বছর রক্তপাত অব্যাহত রাখার পরও ইসমাইল পাশাকে কাবু করতে না পেরে তারা চক্রান্তের আশ্রয় নেয়। 'বাবে আলি'র দিকে সুলতান আবদুল মাজিদ খানের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে খেদিব ইসমাইল পাশাকে পদচ্যুত করিয়ে তাঁর স্থলে ক্রীড়নক তাওফিক পাশাকে মিসরের খেদিবের আসনে বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তাওফিক পাশা ছিল মূলত তাদের পুতুল। ইত্যবসরে স্যার ইউ ল্যাবন (যিনি ছিলেন লর্ড ক্রোমার নামে খ্যাত) মিসরে গেলে মিসর ও সুদানকে একত্রে মিলিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করেন। পরে দুটোকে তাদের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হয়। এই যুদ্ধেও হিন্দুস্থানিদের তাদের ইচ্ছার বাইরে জানমাল বিসর্জন দিতে হয়। রাজকোষের ওপর ১ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডের ব্যয়ভার চাপানো হয়।
- ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে হামলা চালিয়ে একটার পর একটা রাষ্ট্র তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে। এসব লড়াইয়েও প্রাণ আর সম্পদের ধ্বংস ছাড়াও হিন্দুস্থানিদের জাতীয় রাজকোষের ওপর ২ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ডের ঋণ চাপানো হয়। এই ঋণ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে বাড়তে ১৯১২

[৩৫] তখনকার মিসরের শাসনকর্তার উপাধি।

খ্রিষ্টাব্দে ১৪ বিলিয়ন ১৪ কোটির অঙ্ক ছাড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালেও বৃদ্ধির এ হার অব্যাহত থাকে এবং ইংরেজরা তা সুদে-আসলে আদায় করতে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা অর্থনৈতিক নিপীড়ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করব।

- ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আবদুল মাজিদ খানের সঙ্গে এক গোপন চুক্তির ভিত্তিতে সাইপ্রাস দখল করা হয়। একই বছর জিবরাল্টার প্রণালির ওপর হামলা চালিয়ে সেটাও তারা উদরস্থ করে। এভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাল্টা দ্বীপও জবরদখল করে। ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকায় মাল্টা, প্রাচ্যে সাইপ্রাস আর পাশ্চাত্যে জিবরাল্টার প্রণালি ভৌগোলিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল খুবই কৌশলগত এলাকা। যেহেতু স্থানগুলো ছিল ভারত ও ইংল্যান্ডের রাস্তায় অবস্থিত, তাই এগুলোর দখল-প্রতিষ্ঠায় ভারতীয়দের জড়িয়ে যুদ্ধের ব্যয়ভারটাও তাদের রাজকোষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

বিশাল তুর্কি খিলাফতের বিরুদ্ধে তারা যে ষড়যন্ত্র করে, তা লিখতে গেলে কয়েক খণ্ডের গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। এখানে আমরা সামান্য কিছু চিত্রাঙ্কন করছি। দেখুন সেটা কেমন ছিল :

- ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মলদাভিয়া ও ওডেসিয়ার খ্রিস্টানদের মাধ্যমে বিদ্রোহের সূচনা ঘটিয়ে ব্রিটিশরা আলেকজান্ডার কুজাকে এই এলাকাসমূহের অধিপতি বানিয়ে দেয়।
- ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহের আগুন উসকে দেয়। প্রথমে রাষ্ট্রগুলোকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের রূপ দেয়। পরে পুরো ইউরোপ মিলে দেশগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়।
- ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ওডেসিয়া আর মলদাভিয়ার লোকেরা রুমানিয়ার অভ্যন্তরে বিদ্রোহে মদদ দেয়। পরে ইউরোপ 'বাবে আলি'র দিক থেকে সুলতানের ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে এটিও দখল করে জার্মানির রাজকুমার চার্লসকে সেখানকার শাসক বানিয়ে নেয়।
- ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়া আন্তর্জাতিক আইনের বরখেলাফ করে কৃষ্ণসাগরে তাদের নৌবহর পাঠায় এবং সাগর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল কুক্ষিগত করে।
- ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের উসকানির ফলে বলকান অঞ্চলে বিদ্রোহ তুঙ্গে ওঠে। ইউরোপ তখন হস্তক্ষেপ করে 'বাবে আলি'র বিদ্রোহীদের কিছু দাবিদাওয়া মেনে নেয়। ফলে জেগে ওঠা এ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে।
- ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়া বলকানে আক্রমণ করে বসে; আর ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ তাদের মোকাবিলায় আসবে না মর্মে একটা গোপন চুক্তি করতে সক্ষম হয়।

এভাবে কয়েক মাস তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকলে একসময় তুর্কি খিলাফত নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এতে আদ্রিয়ানোপল তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের হস্তক্ষেপের ফলে পুনরায় সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

- ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্লিনে ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সে এসে তুর্কির 'বাবে আলি'র[৩৬] প্রতিনিধিরা বুঝতে পারেন, ইতিমধ্যেই ইউরোপ তুর্কি খিলাফতকে তাদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। এর ফলে তুর্কির যুবক সেনাদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তুর্কিদের এ অনুমান নিছক কোনো অনুমান ছিল না। পরবর্তী পরিস্থিতিই তাদের এ ধারণার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ।
- ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বাহিনী তুর্কির গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ আলজেরিয়ার ওপর চড়াও হয় এবং সেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে।
- ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স তিউনিসিয়াকেও নিজেদের করতলগত করে।
- ইউরোপ তুর্কি খিলাফতকে ভাগবাঁটোয়ারা করার গোপন যে চুক্তি করেছিল, তার ভিত্তিতে ফ্রান্সকে মরক্কো অধিকারের অনুমতি দেওয়া হয়। সুতরাং ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোর ওপর ফ্রান্স দখল প্রতিষ্ঠা করে।
- ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরানকে বাঁটোয়ারা করা হয়। রাশিয়া উত্তর-ইরান আর ব্রিটেন দক্ষিণ-ইরান গ্রাস করে নেয়।
- ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও গ্রিস যৌথভাবে মেসিডোনিয়ায় বিদ্রোহ বাধায়। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর এটিও তারা তুর্কির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়।
- ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ইতালি লিবিয়ার ওপর হামলা চালায়। দীর্ঘদিন লড়াইয়ের পরও যখন তারা কিছুই করতে পারছিল না, তখন মিত্রবাহিনীর সহায়তা নিয়ে লিবিয়াকে ইতালির হাতে তুলে দেয়।
- ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার ইঙ্গিতে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া ও গ্রিস যৌথভাবে বলকানের ওপর চড়াও হয়। এটাই সেই বলকানযুদ্ধ, যেখানে ভারতের স্বাধীনতাকামী লড়াকুরা আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে তুর্কির পক্ষে কাজ করেন। নতুবা এর আগে হিন্দুস্থানিদের পক্ষে রাজনৈতিক কোনো ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না।

[৩৬] উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে 'বাবে আলি' বা 'আসতানা' (রাজধানী) একটি বিশেষ পরিভাষা। এর দ্বারা উসমানি পার্লামন্ট বা খিলাফতভবন বোঝানো হয়।

এ তো গেল মুসলিমদের শাসনকেন্দ্র তুর্কি খিলাফতের বিরুদ্ধে পুরো ইউরোপের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের বর্ণনা; কিন্তু ঠিক সে সময় ব্রিটিশ ভারত ও তার আশপাশের এলাকার জনগণকে কেমন ঘোল খাইয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ এখানে পেশ করা আদৌ সম্ভব নয়।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তুর্কি সেনাবাহিনীর মধ্যে এক প্রবল জাগরণ অনুভূত হয়। আনোয়ার পাশার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীতে 'ইত্তিহাদুল মুসলিমিন' নামে রাজনৈতিক একটি দল প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, তা বিদূরিত করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদীর হাতের পুতুল দুর্বল খলিফার কর্তৃত্ব ছেটে ফেলতে হবে। রাজনৈতিক এ সংস্থাটি গঠিত হওয়ার পরই তাদের সংস্কার-কর্মসূচি ও নীতি ফলাও করে প্রচার করা হয়। দেখতে দেখতে এ পার্টি ক্ষমতা দখলে সক্ষম হয়। ক্ষমতাগ্রহণ করেই তারা সুলতানের ক্ষমতা সীমিত করে যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। এতে ইউরোপের সমূহ ষড়যন্ত্রের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তাদের পক্ষে তখন সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকেনি। তবে তাদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাদের হাতে সে সুযোগটি এনে দেয়; আর পুরো ইউরোপ মিলে জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলনকে স্রেফ তুরস্কের ভেতরেই ঠেলে দিতে সমর্থ হয়। এ ঘটনার বিবরণ আমরা একটু পরেই দিচ্ছি। আর এরই সঙ্গে রাজনৈতিক পীড়ন-প্রসঙ্গের ইতি টেনে আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় আগ্রাসনের বর্ণনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

সামনের পরিচ্ছেদে আমরা এটাই দেখাতে চাইব—ইংরেজদের ক্ষমতাগ্রহণের আগে হিন্দুস্থানিরা ছিল উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী; কিন্তু ইংরেজরা ক্ষমতাগ্রহণের পর তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় মূর্খতা ও বর্বরতা। ফলে বিশ্বের শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত জাতি বিশ্বসমাজে পরিণত হয়ে ওঠে ঘৃণার পাত্রে। সংস্কৃতির দিক থেকে তারা হয়ে পড়ে দেউলিয়া। এখানেও আমরা কেবল ইংরেজ ইতিহাসবিদদের উদ্বৃতিই পেশ করব। এমনটি না করলে হয়তো মানুষ মনে করবে, যেহেতু সংস্কৃতি বা উন্নত জীবনাচার মানুষের স্বভাবের একটা অংশ, সেটা আবার ইংরেজরা ধ্বংস করে কীভাবে? আমরা হয়তো নিজেরাই নিজেদের ঢাক বাজাচ্ছি। স্রেফ এ কারণেই আমরা ইংরেজদের অনুস্মৃতি পেশ করছি, যাতে মানুষের ধারণার অপনোদন ঘটে। তারা বুঝতে সক্ষম হয়, ইংরেজদের কল্যাণেই আমাদের চারিত্রিক এই অধোগতি। এর পরের পরিচ্ছেদে অর্থনৈতিক আগ্রাসন নিয়ে আলোচনা করব। অতএব, আসুন আমরা দ্বিতীয় আগ্রাসন নিয়ে আলোচনা করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

এক. হিন্দুস্থানিদের সংস্কৃতিবিমুখ বানানোর ব্রিটিশ পাঁয়তারা

এখানে আমরা এটাই প্রমাণের প্রয়াস পাব, ভারতীয়দের আভিজাত্য, চরিত্র ও সংস্কৃতি এতই উন্নত ও ঈর্ষণীয় ছিল যে, বিশ্ববাসী তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করত; কিন্তু ধূর্ত ইংরেজরা দখলপ্রতিষ্ঠার পর তাদের সেই সভ্যতা-সংস্কৃতি একেবারে ধ্বংস করে দেয়। বিশ্ববাসীর সামনে ভারতীয়দের অসভ্য ও জংলি হিসেবে পরিচিত করে তোলে। আজকে পৃথিবীর দিকে দিকে আমাদের যে বদনাম ছড়িয়ে পড়েছে, তা ওদেরই কারসাজির প্রতিফল। আমরা এ কথাটাও তুলে ধরার প্রয়াস পাব—তাদের আগ্রাসনের আগে আমাদের পূর্বসূরিরা ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক থেকে বিশ্বশিক্ষকের অবস্থানে; কিন্তু ষড়যন্ত্র আর নানাবিধ উৎপীড়নের মাধ্যমে তারা আমাদের একটি মূর্খ জাতিতে পরিণত করে।

শিক্ষা একটি জাতির আভিজাত্য আর উন্নত চরিত্রের সোপান। শিক্ষাই সচ্চরিত্রের উৎসধারা। যে জাতির মধ্যে শিক্ষা আছে, তারা হয় সুসভ্য, শান্ত, ভদ্র ও বিনীত। পক্ষান্তরে মূর্খরা হয়ে থাকে উদ্ধত, অভদ্র ও গোঁয়ার। অশিক্ষা আর কুশিক্ষার কারণেই মানুষ হয় পশুর চেয়েও অধম।

আমরা বলতে চাই, ইংরেজদের আসার আগে আমাদের পূর্বসূরিরা ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের এক একজন দিকপাল; কিন্তু ইংরেজরা তাদের সে জ্ঞান ছিনতাই করে নেয়। সূর্য না থাকলে যেমন পৃথিবী আঁধারে ছেয়ে যেতে বাধ্য, অনুরূপ জ্ঞানবিজ্ঞান ছিনতাই-কবলিত জাতির জন্যও আঁধারের যাত্রী তথা মূর্খ ও সভ্যতাবিবর্জিত হওয়া অবধারিত। এ প্রসঙ্গের আলোচনায়ও তাদেরই ইতিহাসবিদদের উদ্ধৃতি খুঁজে বেড়াব, যাতে পাঠকমনে সামান্যও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। অতএব, একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন।

দুই. মুসলিম বাদশাহদের রাষ্ট্রনীতি

স্যার বার্টেল বলেন, হিন্দুস্থানের বাদশাহর একজন ছেলের সরকারি বৈঠকও আমাদের কাউন্সিলের মতো হয়ে থাকত। একজন প্রাজ্ঞ প্রশাসকের অধীনে অনুষ্ঠিত এসব দরবারি সভায় যেকোনো শ্রেণির নাগরিকের জন্য প্রবেশের অনুমতি ছিল অবাধ। শুধু তা-ই নয়, সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা নির্ভয়ে নিজের স্বাধীন মতামত পেশ করতে পারত। এর মাধ্যমে শাসকরা তাদের প্রজাসাধারণের আবেগ-অনুভূতি জানতে পারতেন এবং সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতেন।[৩৭]

হিন্দু-মুসলিম পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার মতো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে নিয়ে সেনাপ্রধানের পদসহ সামরিক ও বেসামরিক সকল পদই ধর্ম-বর্ণ, জাতি-বিজাতি ইত্যাকার দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে বণ্টিত হতো। এমনকি বিজিত রাজ্যের যোগ্য ব্যক্তিকেও গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদানে কোনোরূপ ইতস্তত করা হতো না। তাঁরা হিন্দুদের রাজা-মহারাজা ও তালুকদার বানান। বড় বড় রাজ্য তাদের অধীনেই ছেড়ে দেওয়া হয়। 'সাত হাজারি' 'ছয় হাজারি' 'পাঁচ হাজারি'-সহ সব ধরনের পদ ও পদবিতে তারা যোগ্যতার ভিত্তিতে সমান আসন পেত।

প্রখ্যাত বাঙালি নেতা স্যার সি.পি. রায় বলেন, আওরঙ্গজেবের সময় বাঙালি হিন্দুদের উচ্চপদে বসানোর পাশাপাশি বিরাট বিরাট জায়গিরও তাদের দেওয়া হয়। তাদের ভূস্বামীতে পরিণত করা হয়। আওরঙ্গজেব হিন্দুদের গভর্নর বানান। ভাইসরয় বানান। এমনকি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আফগানিস্তানে যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনিও ছিলেন একজন হিন্দু রাজপুত।[৩৮]

ব্রেনিয়র ফ্রান্সিস বলেন, বাদশাহরা রাজপরিবারের নিরাপত্তার মতো জনগণের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতেন। কোনো সেনা, পুলিশ অথবা বাইরের কেউ জনগণের ওপর অত্যাচার করবে, এটা সহ্য করা হতো না।

কারিগরি কমিশন (যার সব সদস্যই ছিল ইংরেজ) সদস্যদের রিপোর্ট হচ্ছে, বর্তমান উন্নত কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যার রথী-মহারথীরা যখন ছিলেন গণ্ডমূর্খ এবং বর্বর জীবনে অভ্যস্ত, তখন হিন্দুস্থান তাদের শাসকদের সুদৃষ্টির ফলে বিশ্বসমাজে খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করে। এরপর ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয়রা সেখানে গেলে তারা হিন্দুস্থানকে যে অবস্থায় দেখতে পায়, তা আজকের উন্নত ইউরোপের চেয়ে কোনো দিক দিয়েই পিছিয়ে ছিল না।

---

[৩৭] *'রিপোর্ট আইনি ইসতিলাহাত' হেন্টিগো চেমিসফোর্ড*: ৩৮।

[৩৮] *রওশন মুসতাকবিল*।

স্যার থমাস মরো ব্রিটিশের অধীনপূর্ব ভারতের চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে লেখেন, উন্নত কৃষিব্যবস্থা, অতুলনীয় শিল্প ও প্রযুক্তিদক্ষতা, গ্রামে গ্রামে এমনসব বিদ্যালয়ের উপস্থিতি, যেখানে বিভিন্ন শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদানের দ্বার থাকে সম্পূর্ণ অবারিত; সর্বোপরি সংখ্যালঘুদের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা, তাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রভৃতি গুণ যে জাতির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, আমরা তাদের অসভ্য ও জংলি বলার অধিকার রাখি না। এসব গুণের অধিকারী জাতিকে ইউরোপের চেয়ে অনুন্নত ও নীচু জাতি বলা যায় না। যদি হিন্দুস্থানিদের সঙ্গে সংস্কৃতির লেনদেন করা হয়, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, হিন্দুস্থান থেকে আমদানিকৃত সংস্কৃতির মাধ্যমে ইংরেজরাই বেশি লাভবান হবে।

মাদ্রাজের প্রখ্যাত গভর্নর ও ভাইসরয় লর্ড উইলিয়াম ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি সরকারের সামনে এক ভাষণে বলেন, অনেক বিষয়ে মুসলিম সরকার ইংরেজ সরকারের চেয়ে ভালো ছিল। তাঁরা এই দেশ জয়ের পর এখানে বসতি গড়ে নেয়। ভারতীয় সমাজের গভীরে মিশে একাকার হয়ে যায়। পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে। মূল বাসিন্দাদের যৌক্তিক কোনো দাবি পূরণে তাঁরা কোনো কার্পণ্য করত না। তাঁরা বিজয়ী ও বিজেতা মানসিকতার ঊর্ধ্বে ওঠে প্রতিপক্ষকে আপন করে নেয়। তাঁদের সময়ে সাম্প্রদায়িকতার নাম-গন্ধও ছিল না; কিন্তু ইংরেজ সরকারের পলিসি হচ্ছে ভিন্ন। এখন কেবল স্বেচ্ছাচারিতা, অহংকার আর উদাসীনতাই লক্ষ করা যাচ্ছে। একদিকে শাসকদের লৌহকঠিন চাপ, অপরদিকে প্রশাসনে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছাড়া কিছুই নজরে আসছে না। বর্তমান প্রশাসনে হিন্দুস্থানিদের এতটুকু ভূমিকাও নেই।[৩৯]

পণ্ডিত সুন্দরলাল তাঁর *ভারত মে ইংরেজি হুকুমত* গ্রন্থে লেখেন, আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান, পরে আলমগির ও তাঁর উত্তরসূরিদের সময় কোনো ব্যাপারেই হিন্দু কিংবা মুসলিম কারও সঙ্গেই পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হতো না। বাদশাহদের পক্ষ থেকে হিন্দুদের মন্দিরের নামে জায়গির দেওয়া হতো। এ ছাড়া এগুলোর করও মওকুফ করা হতো।

তিন. ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা

পণ্ডিত সুন্দরলাল এই গ্রন্থে লেখেন, যখন থেকে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন থেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, অপদস্থ আর লাঞ্ছিতকরণ শুরু হয়। সাদা-কালো, দেশি-বিদেশি আর জাতপাতের ব্যবধান সৃষ্টি করে একটি সুসংগঠিত জাতিকে শতধা-বিভক্তকরণের

[৩৯] *হিন্দুস্থান মে ইসাইয়ুঁজ কি হুকুমত আজ মেজর বসু*: ৪/৪৪৬।

কাজ আরম্ভ হয় এবং এ ধারা অব্যাহতগতিতে বাড়তে বাড়তে এক মহা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে। অথচ এরা ভিনদেশ থেকে অতিথির মতো স্রেফ ব্যবসা করতে এসেছিল। মুসলিম শাসকদের মহানুভবতার কল্যাণে এবং তাঁদেরই আশ্রয়ের ছায়ায় লালিত হয়ে এরা দিন দিন উন্নতি লাভ করে; কিন্তু প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে শাহি চাকরিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শাসনপ্রক্রিয়ায় অংশীদার হয়ে যায়। পরে গাদ্দারের ভূমিকায় নেমে ক্রমান্বয়ে শাসনকাঠামোও ভেঙে দেয়। ১৭৬৫ থেকে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শতাব্দীকালের মধ্যেই তারা হিন্দুস্থানের ভাগ্যনিয়ন্তা বনে যায়। ১৭৬৫-এর পর থেকেই চুক্তিবিধি লঙ্ঘন করে হিন্দুস্থানি অফিসারদের অপসারণ করা শুরু করে এবং শূন্য পদসমূহে ইংরেজদের নিয়োগ দিতে থাকে।

স্যার জনসুর (১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের রাষ্ট্রনীতি ও বিভিন্ন আইনকানুনের ওপর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে) লেখেন, সম্মানজনক যেকোনো পদে যেকোনো ইংরেজপ্রার্থী পাওয়া গেলে—চাই সে যতই অযোগ্য হোক না কেন—কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাকে চাকরি দেওয়া হতো।[৪০]

মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ ও কোম্পানি সরকারের কাউন্সিলর স্যার ম্যালকম লুইস লন্ডন থেকে প্রকাশিত তার একটি গ্রন্থে লেখেন, আমরা ভারতীয়দের জাতীয়ভাবে অপদস্থ করি। তাদের উত্তরাধিকার আইন রহিত করে দিই। বিয়েশাদির বিধান পালটে দিই। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করি। উপসনালয়ের জায়গিরসমূহ বাজেয়াপ্ত করে নিই। সরকারিভাবে তাদের কাফির ঘোষণা দিই। তাদের বিত্তবানদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করি। লুটতরাজের মাধ্যমে দেশটাকে একেবারে উজাড় করে দিই। জবরদস্তিমূলকভাবে খাজনা উসুল করি। অভিজাত খান্দানগুলোকে করি নির্মূল। সোজাকথায়, তাদের এক অসহায় জাতিতে পরিণত করেছিলাম।[৪১]

লর্ড ম্যাকালে লেখেন, আদালতে কথায় কথায় তাদের শপথ করতে বাধ্য করা হতো। অথচ কাজটিকে তারা শালীনতা ও আত্মমর্যাদার নিম্নস্তরের মনে করত। তা ছাড়া তাদের হেরেমখানায় প্রবেশ করা এবং কোনো অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে তাদের নারীদের দিকে বেপর্দা অবস্থায় দৃষ্টিপাত করাকে ক্ষমাহীন অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করত। তাদের কাছে এর একমাত্র প্রতিকার ছিল—সংশ্লিষ্ট লোকটিকে চিরদিনের মতো দুনিয়া থেকে গায়েব করে দেওয়া; কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদের ওপর এ বিপদটা চাপিয়ে দেওয়া হয়। বাংলা আর বিহারের অভিজাত খান্দানসমূহে তখন মর্মভেদী কান্নার রোল ওঠে। আমাদের লম্পটরা তাদের সহযোগী হিসেবে স্থানীয়

---

[৪০] *হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি* : ২৭।

[৪১] *রিসালা হিন্দুস্থান কি সিয়াসি তারাক্কি* : ৩।

কিছু বদমাশ কসমখোর আর ভাঁড়দের একটা দল পেয়ে যায়। এ ছাড়া এরা সরকারি কর্মকর্তাদের সেই লম্পট-শ্রেণিটাকেও পেয়ে গিয়েছিল, যাদের তুলনায় ইংল্যান্ডের জেলখানার জল্লাদরাও ছিল অধিক বিনম্র। একইভাবে ভদ্র আর অভিজাত ব্যক্তিদের বন্দি করে তাঁদের হাতে-পায়ে শেকল পরিয়ে কলকাতার জেলখানায় পাঠানো হতো। এই খান্দানি লোকগুলোর হেরেমখানার মর্যাদা ও নিরাপত্তা এমনই ছিল যে, রাজা-বাদশাহরা পর্যন্ত তাদের সম্মান দিতে বাধ্য থাকতেন; কিন্তু কলকাতায় তাদের পাঠানোর পরপরই আমাদের 'নাজির' আর 'আমিন'রা তাদের হেরেমে ঢুকে পড়ত। ফলে অনেক জায়গায় এমনও দেখা গেছে, হেরেমখানার নিরাপত্তাবিধানের জন্য তাদের অনেকেই অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই করেছে এবং সেখানেই লাশ হয়ে পড়ে রয়েছে। মারাঠাদের আক্রমণের সময়ও তাদের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি, যা আমাদের আইন প্রণয়নের পর দেখা যায়।[৪২]

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে যখন আদালত-সংক্রান্ত বিধান তৈরি করা হয়, তখন রাজা রামমোহন রায় ভারতের হিন্দু-মুসলিমের পক্ষ থেকে পার্লামন্টে পাঠানো আবেদনপত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লেখেন, 'আদালত-সংক্রান্ত বিধানে ধর্মীয় ব্যবধান সৃষ্টির কারণে হিন্দুস্থানবাসী ভীষণ উদ্‌বিগ্ন। এই আইনের ফলে যেকোনো শ্রেণির খ্রিষ্টান একজন অভিজাত হিন্দুস্থানির বিচার করতে পারবে। পক্ষান্তরে একজন সাধারণ খ্রিষ্টানের বিচারও স্থানীয় আদালতে করা যাবে না। অনুরূপ হিন্দুস্থানিদের মামলার রায় প্রদানের জন্য ঘটিত জুরিবোর্ডে কোনো হিন্দুস্থানি উকিল প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। এর মাধ্যমে আসলে হিন্দুস্থানিদের চরম অবজ্ঞা করা হচ্ছে।'[৪৩]

স্যার থমাস মরো লেখেন, আইন প্রণয়ন কিংবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার রাখা হয়নি। হাতে গোনা মূল্যহীন কিছু পদ ছাড়া সামরিক কিংবা বেসামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো উচ্চপদে তাদের স্থান ছিল না। তারা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সব পদেই ছিল ইংরেজদের একক আধিপত্য। ফলে আমদানি ও উৎপাদনের সবকিছুই তাদের দেশে পাচার হয়ে যেত।

স্যার সাইয়িদ আহমাদ তাঁর *আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ* গ্রন্থে লেখেন, মানহানি সাংঘাতিক রকম ঘৃণ্য কাজ। এর ফলে সংশ্লিষ্ট লোকটির অন্তরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়; কিন্তু দেখা যায় আমাদের শাসকরা হিন্দুস্থানিদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহারকে খুব প্রাধান্য দিত। ওরা দুঃখে মরে গেলেও তা প্রকাশ করতে পারত না। অফিসারদের সহকারীরা সাহেবের রূঢ় বাক্যবাণ আর তুচ্ছতাচ্ছিল্যমূলক আচরণের ফলে নীরবে

---

[৪২] *রওশন মুসতাকবিল* : ৪৪।

[৪৩] *রাজা রামমোহনের জীবনী*, নিটসন : ৪৫।

কেঁদে যেত; আর মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলত, 'হায়! এই চাকরির চেয়ে ঘাস কেটে খাওয়াও ভালো ছিল!' মূলত ব্রিটিশ আর ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল আগুন আর শুকনো ঘাসের মতো। কিংবা সাদা-কালো দুটি পাথরসদৃশ্য, যেগুলোর পার্থক্য দিন দিন কেবল বেড়েই চলছিল। এমন আচরণের ফলে মনে করা হতো, বোধহয় হিন্দুস্থানে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো মানুষের অস্তিত্বই নেই।[৪৪]

হল্ট কামেঞ্জি ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে তার *রোজনামচায়* লেখেন, এরচেয়ে বিস্ময়কর আর দুঃখজনক কী হতে পারে যে, এমন সকল খ্রিষ্টান; আমরা যাদের উদারপ্রাণ হিসেবে জানি, যারা সত্যিকার অর্থেই ভালোমানুষ—তারাও হিন্দুস্থানিদের সঙ্গে অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন।

লডলু তার *ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* গ্রন্থে লেখেন, ইংরেজদের হাতে হিন্দুস্থান বিজিত হওয়ার ফল এটাই প্রকাশ পাবে যে, সেখানকার জনগণ উন্নতির ছোঁয়া পাওয়ার পরিবর্তে অধিকতর নীচ ও হীন প্রতিপন্ন হবে।[৪৫]

স্যার থমাস মরো (যিনি বাদশাহ জাহাঙ্গিরের যুগে এ দেশে এসেছিলেন) তখনকার হিন্দুস্থানিদের সভ্যতা-সংস্কৃতি দর্শনে একেবারে হতবাক বনে যান। দেশে ফিরে গিয়ে সেই কথাগুলোই ফলাও করে প্রচার করেন, যা আমরা এই পরিচ্ছেদের শুরুতে বলে এসেছি। পরে এখানকার জনগণের অনুকরণীয় গুণাবলির বর্ণনায় লেখেন, 'প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অতিথিপরায়ণতার মানসিকতা এত প্রবল যে, তাকে আশাহত করলে সে কেঁদে ফেলবে। সর্বাপেক্ষা যে বড় গুণটি তাদের সেটি হচ্ছে, তারা সংখ্যালঘুদের ওপর খুবই আস্থাবান। তাদের ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তাবিধানে অতন্দ্র প্রহরী। এগুলো এমনই মহৎ গুণ, যা থাকাবস্থায় আমরা তাদের সভ্যতাবিবর্জিত জাতি বলার অধিকার রাখি না। এত উন্নত গুণাবলি থাকার পরেও ইউরোপীয়দের তুলনায় তাদের নীচ বলা রীতিমতো অন্যায়। ভারত আর হিন্দুস্থানের মধ্যে সংস্কৃতির লেনদেন করা হলে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, সেখান থেকে আমদানি হয়ে আসা সংস্কৃতি ইংরেজজাতিকে সুসভ্যই করবে।'

কর্নেল সুলায়মান (যিনি প্রতারকদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন) বলেন, এমন শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে—একটি লোক ছোট্ট একটা মিথ্যার কারণে বেঁচে যেতে পারত, তার সম্পদ ও স্বাধীনতা বিপদমুক্ত হয়ে যেত; কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও তাকে দিয়ে মিথ্যা বলানো যায়নি।

---

[৪৪] *রওশন মুসতাকবিল*: ৮৮।

[৪৫] *হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি*: ১৮, ১৯।

স্যার এরিক্সন প্যারি এক সাব-কমিটির সামনে প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, বাণিজ্যিক খাতগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা এমনই ছিল যে, কোনো বিরোধসৃষ্ট লেনদেন আদালত পর্যন্ত গড়ানোটাই এর পক্ষে দ্বিধাহীন বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতো।

আজও সে-সকল হিন্দুস্থানি, যারা এই সভ্যতা ও প্রশাসনের বাইরে প্রত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় আছেন, তাদের মধ্যে অতীতের সেই সোনালি দ্যুতি ঝিলিক দিতে দেখা যায়।

হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি গ্রন্থের লেখক লেখেন, আজও যারা পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে যায়, তারা দেখতে পায় সেখানকার লোকগুলো এখনো চুরিচামারি রপ্ত করতে শেখেনি। তাদের হাতে যতই মূল্যবান বস্তু তুলে দেওয়া হোক না কেন, পথিমধ্যে তারা তা ছুঁয়েও দেখবে না। যার কাছে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে, তার সঠিক খোঁজ না পেলে সেগুলো নিজেদের কাছে না রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। তাদের তুলনা একমাত্র তারাই। মহান এ চারিত্রিক গুণ আজ অবধি থাকার হেতুটা হলো, তারা এ সভ্যতার বাইরে নিরাপদ দূরত্বে বসবাস করছে।

কিন্তু হায়! ইংরেজরা এ মহান গুণগুলো একেবারে ধ্বংস করে দেয়। তাদের মধ্যে চারিত্রিক অধঃপতনের মাধ্যমগুলো সৃষ্টি করে। লর্ড ম্যাকালে বলেন, অতীতে যেমন শক্তিমানরা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের আফিম খাইয়ে দুর্বল, ভীরু আর মাতালে পরিণত করে রাখত, অনুরূপ আমাদের প্রশাসনও ভারতীয়দের একেবারে নিষ্কর্মা বানিয়ে ছাড়বে।[৪৬]

১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজের বড় পাদরি কোম্পানির ডাইরেক্টরদের উদ্দেশে চিঠি লেখেন, এই লুটেরা ও খুনি কর্মচারীদের আচরণের ফলে হিন্দুস্থানিদের মানসিকতায় আপনাদের প্রভুর যে সম্মানহানি হচ্ছে, আপনাদের ধর্ম যেভাবে কলঙ্কিত হচ্ছে, তার সঠিক চিত্র আপনারা জানলে কান্নার পানিতে নদী বয়ে যেত। এখানে যারাই আসে তারাই রক্তখেকো হিংস্রে পরিণত হয়ে যায়। এমন লম্পটও আছে, দেশে যাদের স্ত্রী-সন্তান রয়েছে; অথচ এখানে এসে তারা পুনরায় বিয়েশাদি করে বসছে।[৪৭]

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি একটি প্রস্তাব মঞ্জুর করে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল। একটু লক্ষ করে দেখুন তাতে কী লেখা ছিল—দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদেই যেন অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখা না হয়। এখানকার সরকারকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, আমাদের কাজকর্মে সহায়তা দিতে যেন আমাদেরই লোক নিয়োগ দেওয়া হয়। কোনো খান্দানি হিন্দুস্থানিকে

[৪৬] প্রাগুক্ত : ৮৮।

[৪৭] (ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার পুরানো নথিপত্র কৃত নেইলর ৭০) *রওশন মুসতাকবিল* : ৩৪।

যেন চাকরি দেওয়া না হয়। কারণ, দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফলে কেউ তাদের সম্পদও লুটতরাজ করতে পারে।[৪৮]

স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস হচ্ছেন ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোধা। তিনি বলেন, ইংরেজরা এখানে আসার পর যেন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ বনে যায়। দেশে থাকতে যেসব অপরাধের কথা তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না, এখানে এসে অবলীলায় তা করে যায়। তারা যেন এসবের পক্ষে বৈধ কোনো সার্টিফিকেট পেয়ে যায়; কিন্তু এ কারণে যে তাদের বিচার হতে পারে, শাস্তি হতে পারে, তা তারা ভাবতেও পারে না।

টমাস হ্যান্সহাম লেখেন, আমি আজন্ম এটাই দেখে আসছি, অন্য ইউরোপীয়দের অধীন রাষ্ট্রের তুলনায় ব্রিটিশের অধীন রাষ্ট্রসমূহেই হত্যাযজ্ঞ বেশি হয়ে থাকে। হিন্দুস্থানও এর থেকে মুক্ত নয়।[৪৯]

অন্যত্র বার্ক লেখেন, তাতারদের আগ্রাসন হিন্দুস্থানের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেছিল ঠিক; কিন্তু আমাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা তাতারদের আগ্রাসন থেকে অধিকতর ধ্বংসাত্মক ছিল। আমাদের অধীন ভারতের শাসনভার ছিল কতকগুলো ছোকরার হাতে। জনগণের সঙ্গে এদের না ছিল কোনো পরিচয়-পরিচিতি, না ছিল তাদের প্রতি ভালোবাসার সামান্য লেশ। সম্পদের প্রতি লোভ আর উদ্ধত মেজাজ একজন যুবকের মধ্যে যতটুকু থাকা সম্ভব, তা তাদের মধ্যে ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। এখানে আসতে তারা ছিল উন্মাদপ্রায়। একটি ক্যাম্প লুণ্ঠন করে কোনো বিরতি ছাড়াই আরেকটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। হিন্দুস্থানিদের সামনে তাদের ভবিষ্যৎ ছিল নৈরাশ্যঘন একটা অন্ধকারমাত্র। জানি না কতদিন যাবৎ এ হিংস্র শিকারিদের নতুন নতুন আগ্রাসন অব্যাহত থাকবে। প্রতিটি আক্রমণ-অভিযানই লোভাতুর আত্মার লোভের খোরাক উত্তেজিত করে চলছে। অবশ্য তাদের ক্ষুধা মেটানোর বস্তু ধীরে ধীরে নাই হয়ে যাচ্ছে।[৫০]

সি হোল বলেন, যখন ভারতবর্ষে কোম্পানির লোকদের কাজ স্রেফ ব্যবসাবাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তারা সেখানকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ, তখন তারা নিজেদের অভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্য বেনেদের (বণিক) আশ্রয় নিয়ে থাকত।[৫১]

বার্ক বেনেদের ব্যাপারে লেখেন, বেনেরা ইংরেজদের ঘর-দোরের তত্ত্বাবধায়ক সেজে বসেছিল। তারা ইংরেজদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার খবর জানত। লোভী এই বেনেরা তদনুযায়ী কাজ করত। লুণ্ঠন চালাত। জোরপূর্বক সম্পদ ছিনিয়ে

[৪৮] *ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার ইতিহাস*, কৃত জেমস বিল : ২৩।

[৪৯] *ইলমুল মাশিয়াত বুরম্যান* : ৫৮৯।

[৫০] *বরাতে বার্কের রচনাসমগ্র* : ৩/৭৯৯৯৮।

[৫১] *রওশন মুসতাকবিল* : ৫১।

নিত। দেশব্যাপী ধ্বংসলীলায় মেতে উঠত। পরে এ থেকে তাদের ইংরেজ প্রভুদের কিছুটা দিয়ে বাকিগুলো নিজেরাই হাতিয়ে নিত। এই অসভ্যরা ইংরেজদের উসকানি আর সহায়তার জোরে খান্দানি অনেক হিন্দুস্থানিকে একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়ে। সরকারি শুল্কের হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে দেয়। খোদ ইংরেজ বড় সাহেবরাও এই বেনেদের পোষত। এদের কল্যাণে নিজেদের আর্থিক অবস্থা স্ফীত করত। দেখা যায়, তাদের শাসনামলে বেনেদের নামে বড় বড় জমিদারি লিখে দেওয়া হয়। এদের ঠিকাদার বানানো হয়। তবে এরা প্রকৃত ঠিকাদার ছিল না। এদের প্রত্যেকের আড়ালে কোনো-না-কোনো ইংরেজই হতো মূল ঠিকাদার। তারা এই বেনেদের সহযোগিতায় অভিজাত হিন্দু-মুসলিমদের জমিদারি জবরদখল করে মালিকদের বিতাড়িত করে দিত। অথচ এটা ছিল সরকারি আইনের পরিপন্থি। যদিও তখনকার আইন অনুযায়ী কাউকে একসঙ্গে ১ লাখের অধিক মুদ্রামানের ঠিকাদারি দেওয়ার বিধান ছিল না; তথাপি বেনেদের এ আইনের আওতামুক্ত রেখে দেওয়া হয়। যেমন খোদ ওয়ারেন হেস্টিংসের বেনে কণ্ঠবাবুর ঠিকাদারি ছিল ১৩ লাখ মুদ্রামানের।[৫২]

ওয়ারেন হেস্টিংসের আরেক বেনে কর্মচারীর নাম ছিল গঙ্গা গোবিন্দ সিং। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গণপরিষদের এক সভায় যখন তার নামে হিসাবের খাতা খোলা হয় তখন দেখা যায়, তার উপার্জন ছিল প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ মুদ্রা।[৫৩]

অনুরূপ গভর্নরের দেওয়ান রামচন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়, তার মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৬০ টাকা; অথচ মৃত্যুর সময় সে ১২ কোটি মুদ্রার সম্পদ রেখে যায়। কোম্পানির এজেন্ট রূপকৃষাণের হাতে এত অধিক সম্পদ ছিল, সে তার মায়ের মৃত্যু-উত্তর যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ৯০ লাখ মুদ্রা ব্যয় করে। এই বিপুল সম্পদ তার হাতে এল কী করে? প্রতারণা, লুটতরাজ আর ধান্দাবাজি ছাড়া সামান্য এক দেওয়ান কি এত বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে পারে?

দেবি সিং নামের আরেক বেনে ছিল কলকাতার ইংরেজ-প্রশাসকদের অতি প্রিয়ভাজন। বাংলার বড় বড় ঠিকাদারি তাকেই দেওয়া হয়। লোকটি সেখানকার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকগুলোকে হাতকড়া পরিয়ে হাজতে রাখত। নানা ধরনের অত্যাচারের মাধ্যমে অধিক সম্পদ রয়েছে কি না তা জেনে নিত। সে নির্ধারিত ট্যাক্স ছাড়াও নতুন নতুন করব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়। ফলে জমিদারদের ওপর এমন পাহাড় পরিমাণ খাজনা জমা হচ্ছিল, যা অনেক সময় তাদের জিম্মায় বকেয়া থেকে যেত। এরপর হঠাৎ করে তাগাদার পরিপ্রেক্ষিতে তারা তা আদায়ে সমর্থ না হলে তাদের ঘরবাড়িসহ যাবতীয়

---

[৫২] *মুকাদ্দিমায়ে ওয়ারেন হেস্টিংস*, মিস্টার বার্ক, প্রথম খণ্ড : ১৩৯।

[৫৩] প্রাগুক্ত : ২১৩।

সম্পদ নিলামে তোলা হতো। নিলামে তারাই নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়ে চিরদিনের মতো আত্মসাৎ করে ফেলত। দেবি সিং বিগাপ্রতি চার আনা করে উসুল করত; ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তার ঠিকাদারি এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছিল।

বার্ক বলেন, এহেন অত্যাচারের ফলে জমিদাররা যুগ যুগ ধরে তাদের বাপ-দাদাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছিল। পেছনে পড়ে থাকছিল চাকর-নকর আর সেসব জমিদারি, যা তাদের বাপ-দাদারা এ জন্যই তাদের হাতে রেখে গিয়েছিলেন—এগুলোর আমদানি দিয়ে তারা ইয়াতিম, বিধবা, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও বিভিন্ন ধরনের অসহায় মানবতার সাহায্য করবে। এমনও জায়গা ছিল, যা তারা নিজেদের কবরের জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন। যাওয়ার সময় তারা অবিরাম অশ্রু মুছছিল আর বার বার সজল চোখে পেছন ফিরে চেয়ে চেয়ে দেখছিল বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সে ঘরবাড়ি, যেখানকার আঙিনায় এখনো রয়ে গেছে তাদের শৈশবের ছাপ—নিষ্ঠুর জালিমরা নিলামে তুলে উচ্চৈঃস্বরে মূল্য হাঁকাচ্ছে।

হায়রে জালিম! অবশেষে তোমরা মৃত্যুর পর বাপ-দাদার ভিটায় কবরস্থ হওয়ার মতো একটু জায়গাও রাখলে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জন করা অতুল বিত্তবৈভবের একফোঁটোও নিতে দিলে না। এমনকি আবাল্যের প্রিয় জন্মস্থানের একমুঠি ধূলিও নিতে দিলে না। উহ! কত-না জালিম ছিল ওরা! কত-না নিষ্ঠুর ছিল ওদের অত্যাচারী হাত! ওদের এ অত্যাচার ছিল চিতার আগুনের চেয়েও কষ্টদায়ক। কবরের চেয়েও সংকীর্ণ। মৃত্যুর চেয়েও বিভীষিকাময়।[৫৪]

স্যার উইলিয়াম ওডারবার্ন লেখেন, সাধারণত আমাদের উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিরা নিজেদের সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। এ জন্যই তারা সত্যভাষী বিশ্বস্ত লোকগুলোকে এড়িয়ে চলতেন। তারা শুধু তাদেরই নিজেদের কাছে টানতেন, খাতির যত্ন করতেন, যারা ছিল হীনম্মন্য, চরিত্রহীন, খোশামোদে; সর্বোপরি ভারতীয়দের জন্য ক্ষতিকর।[৫৫]

রাষ্ট্রীয় পদসমূহ থেকে হিন্দুস্থানিদের বিতাড়নের ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ অবস্থা দাঁড়ায় যে, প্রশাসনে দক্ষ ও কর্মসম্পাদনকারী লোকের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। যাদের মধ্যে তখনো কিছুটা যোগ্যতা ছিল, তারাও অবস্থার শিকার হয়ে যোগ্যতা হারান। এর সঙ্গে চরম দেউলিয়াপনা তাদের চরিত্রে মারাত্মক ধস নামিয়ে দিয়েছিল।[৫৬]

স্যার থমাস তার জানা সত্যকে এক রিপোর্টে এভাবে ব্যক্ত করেছেন, প্রশাসনে তাদের কোনোই প্রতিনিধিত্ব ছিল না। হাতে গোনা ব্যতিক্রম দুয়েকটা ছোটখাটো সিভিল

[৫৪] *রওশন মুসতাকবিল*: ৫২, *বার্কের রচনাসমগ্র*: ১/২১৯২২০।

[৫৫] *হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি*: ৫০, *ওয়াডারবার্নের রচনা*: ২০৪-২০৮।

[৫৬] *হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি*: ১৫।

ছাড়া সামরিক পদে আসীন হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তাদের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে রাখা হয়। বর্তমানে সকল উচ্চপদ আর বিশেষ করে সামরিক বিভাগ ইউরোপীয়দের জন্য বরাদ্দ। এর ফলে টাকাপয়সা তাদের হাতেই চলে যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে ছিটকে পড়ার কারণে হিন্দুস্থানিদের চরিত্রে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। ঐতিহ্য হারিয়ে তারা অনেকটা ইংরেজদের মতোই হিংস্র হয়ে উঠছে।

স্যার থমাস তার ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের রচনায় উল্লেখ করেন, ব্রিটেন কোনো বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে এবং তার জনগণকে প্রশাসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলে চরিত্র, ধর্মীয় ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের চরম উৎকর্ষও তাদের মূর্খ, বন্য আর বেইমান হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না।

লডলু তার *ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া* গ্রন্থে লেখেন, ইংরেজদের হাতে বিজিত হওয়ার পরিণতিতে তারা উন্নত হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর হীন হবে।

থমাস মরো লেখেন, ইংরেজশাসিত প্রদেশসমূহে হিন্দুস্থানিরা অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনার শিকার।[৫৭]

মোটকথা, শত শত জমিদার, হাজার হাজার সেনা ও অসংখ্য চাকরিজীবী বেকার সমস্যায় নিপতিত হয়। এরা জীবিকার কোনো অবলম্বন না পেয়ে শেষপর্যন্ত সন্ত্রাস আর লুটতরাজকে জীবিকার মাধ্যম বানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ফলে নাগপুর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা পিন্ডারিদের[৫৮] স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়ে ওঠে। এরা ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের শীতে মাত্র ১০ দিনে ১৮২ জনকে হত্যা এবং ৫০০ জনকে আহত করে। এ ছাড়া প্রায় ৩ হাজার মানুষকে নানা ধরনের নিপীড়নের পাশাপাশি প্রায় ১ কোটি মানুষের সম্পদ লুটে নেয়।[৫৯]

তাদের স্বভাব, সম্ভ্রম, ধর্ম এবং নারীদের ইজ্জতকে আমাদের প্রবর্তিত আইনের মোকাবিলা করতে হয়েছে। সম্পদের প্রশ্নে গৃহীত প্রাথমিক কার্যক্রম ছিল ট্যাক্স আদায়ে বকেয়া রেখে দেওয়া কিংবা বকেয়া আদায়ে ব্যর্থতার কারণে গ্রেপ্তার করা। অথচ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এ জাতির কাছে গ্রেপ্তার তো পরের কথা, নজরবন্দিটাও ছিল অসহ্য বেইজ্জতির অংশ। প্রাচ্যের দেশসমূহে তাদের নারীদের হেরেমখানায় বেগানা কোনো পুরুষের প্রবেশ কিংবা পরনারীদের দেখে ফেলাটা ছিল ক্ষমাহীন অপরাধের শামিল। এমন অপমানের চেয়ে মৃত্যু ছিল তাদের কাছে অতি সহজ। এ অপরাধের শাস্তিকে তারা মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কল্পনাও করতে পারত না; কিন্তু আমাদের

---

[৫৭] প্রাগুক্ত : ১৯।

[৫৮] মারাঠা দস্যুদলবিশেষ।

[৫৯] *আগইয়ার কে ঘর মে, ফেটিং—রওশন মুসতাকবিল* : ৫৯-৬০।

দখলদারির পর বাংলা, বিহার ও উরিষ্যার অভিজাত খান্দানগুলোকে এ অপমানও নীরবে মুখ বুজে সয়ে যেতে হয়েছে। আদালতসমূহের আশপাশে হিন্দুস্থানিদের সেই চোগলখোর, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী, মামলাবাজ, দাগাবাজ আর সম্পদ আত্মসাৎকারী শ্রেণির ভিড় ছিল, যাদের তুলনায় ইংল্যান্ডের প্রতারকরাও অধিকতর বিশ্বস্ত আর দরদি বলে প্রতীয়মান হয়।[৬০]

চার. শিক্ষার উত্থান-পতন

ব্রিটিশপূর্ব হিন্দুস্থানের পরিস্থিতি ছিল—রাষ্ট্রপ্রধান আমিররা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের নামে জায়গিরের ভূমি ওয়াকফ করে দিতেন। দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পরও শুধু রোহিলাখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় ৫ হাজার আলিম বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। হাফিজুল মুলক (নবাব রোহিলাখণ্ড) হাফিজ রহমত খান মরহুম তাঁর রিয়াসত থেকে এদের ভাতা দিতেন।[৬১]

ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন তার সফরনামায় লেখেন, বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সময় শুধু সিন্ধুর ঠাট শহরেই ৪০০ কলেজ[৬২] ছিল। এসব কলেজে বিভিন্ন শাস্ত্রের তালিম দেওয়া হতো। আল্লামা মাকরিজি তাঁর *কিতাবুল খিতাতে* লেখেন, বাদশাহ মুহাম্মাদ তুগলকের সময় শুধু দিল্লি শহরেই ১ হাজার মাদরাসা ছিল।[৬৩]

ক্যারি হার্ডি ম্যাকস্ মুলারের বরাতে লেখেন, ইংরেজ শাসনপূর্ব যুগে পূর্ব-বাংলায় ৮০ হাজার মাদরাসা ছিল। অর্থাৎ, সেখানে গড়ে প্রতি ৪০০ জনের জন্য একটি করে মাদরাসা ছিল। অনুরূপ লডলু *হিন্দুস্থানের ইতিহাস* গ্রন্থে লেখেন, সনাতন হিন্দুদের শিক্ষানুরাগী ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া জানত; কিন্তু যেসব স্থানে আমরা বাংলার মতো শিক্ষাব্যবস্থা উচ্ছেদ করেছি, সেসব স্থান থেকে গ্রাম্য স্কুলগুলোও হারিয়ে গেছে।[৬৪]

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত রিফার্ম সোসাইটি তাদের এক গ্রন্থে উল্লেখ করে, আগে হিন্দুদের প্রতিটি গ্রামেও অন্তত একটি করে বিদ্যালয় ছিল; কিন্তু আমরা পঞ্চায়েতপ্রথা আর মিউনিসিপ্যালিটি ভেঙে দিলে সেখানকার লোকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। আমরা এ যাবৎ এগুলোর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করিনি।[৬৫]

---

৬০ *হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি,* ম্যাকালে : ১৫-১৭।

৬১ *হায়াতে হাফিজ রহমত খান* : ২৭১।

৬২ এখানে কলেজ বলা হয়েছে মাদরাসা নয়; অতএব, মাদরাসা যে কী পরিমাণ ছিল এবং এগুলোর শিক্ষার মান কেমন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

৬৩ *বারতানবি তালিমি হিন্দ।*

৬৪ *রওশন মুসতাকবিল* : ১২৪—*তারিখে বসু,* পঞ্চম খণ্ড : ১৪।

৬৫ *রওশন মুসতাকবিল* : ১২৪।

স্যার উইলিয়াম ডগবি স্পার্স *ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া* গ্রন্থে মেজর স্মিথকে করা প্রশ্নের জবাবে লেখেন, **প্রশ্ন নং ৫৬৩ :** আপনি কি এটা রোধ করতে পারবেন যে, ওরা (হিন্দুস্থানিরা) কোনোদিনই তাদের শক্তি ও আত্মপরিচয় আবিষ্কার করতে পারবে না?

জবাব : আমার জানামতে, মানবসভ্যতায় এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যে, কিছুসংখ্যক মানুষ ৬ কোটি জনঅধ্যুষিত একটা বিশাল রাষ্ট্র জয় করে সেখানে বেশিদিন তাদের দখলদারিত্ব বজায় রাখতে পারে, যদি-না তাদের থেকে তাদের জাতীয় শিক্ষা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তাদের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সাময়িকভাবে করা গেলেও যেইমাত্র ওরা শিক্ষার আলোয় নিজেদের আত্মপরিচয় আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে, তখনই তাদের থেকে বিভেদ ও বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। তাদের আত্মাটাও উদার হয়ে উঠবে। এরপর বিজয়ী জাতিকে সেখান থেকে তাদের গাঁটরি নিয়ে পালাতে হবে।[৬৬]

১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে আর্নেবল আনফেস্টন ও আর্নেবল এফ ওয়ার্ডন মিলে যে আবেদনপত্র ব্রিটিশ সরকারের হাতে হস্থান্তর করেন, তাতে এ কথাগুলোও ছিল—আমরা সেখানকার অধিবাসীদের মেধা ও প্রজ্ঞার উৎস একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের বিজয়াভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে সে পথে কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া। এতে তাদের থেকে ধর্মীয় জ্ঞান ও পূর্বপুরুষের জ্ঞানের উৎস একেবারে নাই হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অতএব, ইনসাফ ও মানবতার খাতিরে হলেও আমাদের জন্য এ অভিযোগটা দূর করার কোনো একটা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।[৬৭]

এদিকে কোম্পানি সরকার দেশীয় শিক্ষার বিরোধিতায় এবং বিশেষ করে খ্রিষ্টবাদ শিক্ষার পক্ষে যে রেজুলেশন পাশ করেছিল, তা-ও দেখা প্রয়োজন।

কোনো একটি ধর্ম যখন শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায়, তখন সে ধর্মানুসারীদের উদ্দেশ্যও খুবই সহজে একীভূত হয়ে যায়। হিন্দুস্থানে এমনটি হলে মনে করতে হবে আমাদের দিন শেষের দিকে। মানুষকে তার ধর্মের ওপর চলতে দেওয়ার নীতিটা এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটা অচল নীতি ছাড়া কিছু নয়। এখানে কয়েক লাখ লোককে আমরা খ্রিষ্টান বানিয়ে নিতে সক্ষম; কিন্তু এটা আমাদের জন্য কোনো শুভ ফল বয়ে আনবে না। এটা হবে আমাদের জন্য একটা কাল। আমেরিকায় আমরা শিক্ষা বিস্তার করার ফল হাতেনাতে পেয়েছি। শুধু শিক্ষা বিস্তারের কারণে আমেরিকা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। একইভাবে যুবক পাদরিরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে সেটাও আমাদের বিপদ ত্বরান্বিত করবে। হিন্দুস্থানিরা শিক্ষালাভ করতে চাইলে এখানে নয়, ইংল্যান্ডে চলে যাক।[৬৮]

---

[৬৬] *খুশহাল বারতানুবি হিন্দ*, তরজমা স্পার্স ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া।

[৬৭] *রওশন মুসতাকবিল* : ২৮।

[৬৮] প্রাগুক্ত : ১২৫—*তারিখে তালিম*, বসু : ২০৩।

পাঁচ. ব্রিটিশরা শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের স্থায়িত্বের মাধ্যম বানিয়েছিল

যেহেতু বাস্তববাদী অনেক ইংরেজ হিন্দুস্থানিদের মানসিকতার সঙ্গে ছিলেন একমত, তাই ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষাবিস্তার ও এর কাঠামো নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন হয়। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ এই কমিটির যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সর্বসম্মতভাবে লর্ড ম্যাকালেকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। এই সভার সভাপতি ও সদস্যদের ঐকমত্যে পাশ হয়—হিন্দুস্থানে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন। পরে লর্ড ম্যাকালে তার স্কিম ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, এখানে এমন একটি শ্রেণি গড়ে নিতে হবে, যারা আমাদের এবং কোটি কোটি প্রজার মধ্যে দোভাষীর কাজ আনজাম দিতে পারে। তাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, রক্ত ও বর্ণের দিক দিয়ে হিন্দুস্থানি হলেও চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে হবে এক একজন খ্রিষ্টান।[৬৯]

উইলিয়াম উইলসন হান্টার বলেন, আমাদের এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন একটি ছাত্রও বের হয়নি, যারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেনি। এশিয়ার ধর্মগুলো যখনই আমাদের বিজ্ঞানের মোকাবিলায় গিয়েছে, তখনই তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।[৭০]

ইংরেজ সরকার শিক্ষার আড়ালে হিন্দুস্থানিদের আবহমান সম্প্রীতি ধ্বংসের অভিশপ্ত পাঁয়তারা চালিয়েছিল। তারা মুসলিম বাদশাহদের কল্পিত অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে হিন্দুদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এ উদ্দেশ্যে এ ধরনের বই পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং এতে তারা যথেষ্ট সফলও হয়।

স্যার জন ম্যালকম বলেন, এই বিপুল-বিস্তৃত রাষ্ট্রে আমাদের হুকুমতের স্থায়িত্ব এ বিষয়টির ওপরই নির্ভরশীল ছিল যে, এখানকার লোকগুলো থাকবে শতধাবিচ্ছিন্ন। দল-উপদলে যতদিন তারা বিভক্ত থাকবে, সম্ভবত ততদিন বিদ্রোহ দেখা দেবে না; দেখা দিলেও তা সফল হতে পারবে না।

ছয়. শিক্ষার আড়ালে হিন্দুস্থানিদের বিচ্ছিন্ন করা

এ লক্ষ্যে এমনসব ইতিহাস প্রণীত হয়, যেগুলোর মধ্যে হিন্দুদের ওপর মুসলিম বাদশাহদের কল্পিত অত্যাচারকে ভয়াবহ আকারে উপস্থাপন করা হয়। এদের মধ্যে কুখ্যাত ব্যক্তিটি হলেন 'হেনরি ইলিয়ট'।

---

[৬৯] *রওশন মুসতাকবিল* : ১৩১—*তারিখে তালিম*, মেজর বসু : ১০৫।

[৭০] *হামারি হিন্দুস্থানি মুসলমান* : ২০২।

ক্যাপ্টেন ইলিয়ট নিজেই লেখেন, হিন্দু লেখকদের[১১] ওপর খুবই আক্ষেপ হয়, তারা এখনো নিজেদের লেখায় ইসলামি প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। তারা মুহাররাম মাসকে 'মুহাররাম শরিফ' আর কুরআনকে 'কালামে পাক' বলতে এতটুকু দ্বিধা করে না। এমনকি নিজেদের লেখাটাও তারা বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করে থাকে।

মুসলিমদের সম্মান করার কারণে ইলিয়ট হিন্দুদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ইলিয়ট আরেকটু এগিয়ে গিয়ে লেখেন, এতদিন নাহয় তাদের নিষ্ঠুর-নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে এমনটি করেছিল; কিন্তু এখন কেন? এখন তো তারা আজাদ। এখন তো বিনা বাধায় মনের কথা প্রকাশ করতে পারছে। এরপরও কেন এই গোলামি মানসিকতা? কেন তারা স্বকীয় চিন্তাধারা ও মনমানসিকতার প্রতিফলন ঘটাতে পারছে না? কেন দীর্ঘ অত্যাচারিত জীবনের করুণ অধ্যায়টি তুলে ধরছে না?

স্যার ইলিয়টের পর শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ক্যামসনও অনুরূপ ইতিহাস লিখে গেছেন। স্যার সাইয়িদ আহমাদ তাঁর *ইতিহাসের জবাব* গ্রন্থে লেখেন, তবে খুশির কথা এই যে, বাস্তববাদী খ্রিষ্টানরা এমন নির্জলা মিথ্যাকে হজম করেননি; বরং তারা সত্য প্রকাশের তাগিদেই এগুলোর প্রতিবাদ করে গেছেন।

টরেন্স তার লেখা *এশিয়া মে শাহানশাহিয়াত* গ্রন্থে লেখেন, আলমগিরকে সাম্প্রদায়িক আর সুলতান টিপুকে ধর্মবিদ্বেষী বলে প্রচার করা হয়; কিন্তু যখন আমরা হিন্দুস্থানের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে প্রবেশ করি, তখন এ ধরনের কথিত সাম্প্রদায়িকতার কোনো নাম-গন্ধও ছিল না। অথচ এই অভিশাপ ব্রিটেনসহ ইউরোপের সর্বত্র মানুষকে তাদের অধিকার-বঞ্চিত করে রাখে, যার কারণে মানুষহত্যা বৈধ রাখা হয়। যখন আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের তাদের বাস্তুভিটার উত্তরাধিকারী গণ্য করা হতো না, তাদের জন্য সরকারি কোনো চাকরিতে অংশ নেওয়ার অধিকার ছিল না। যখন সুইডেনে খ্রিষ্টান ছাড়া প্রশাসনে কারও কোনো স্বীকৃতি ছিল না, ঠিক সে সময়টাতে হিন্দুস্থানের প্রতিটি শাহি দরবারে হিন্দু-মুসলিমরা সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যায়। তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো খুব ধুমধামেই পালিত হতো। মুসলিমদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হতো না। গরু, গানবাজনা, মুহাররাম আর রামলায়লা নিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের নাম-গন্ধও ছিল না। রোহিলাদের হুকুমতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার উৎপত্তি ঘটেছিল ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী বেরেলির দাঙ্গার মধ্য

[১১] যাদের ওপর আমরা আশাবাদী ছিলাম যে, তাদের কলম থেকে তাদের মন-মানসিকতা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের খবর জানতে পারব।

দিয়ে। তখন রোহিলাদের শাসন-কাঠামোর অস্তিত্বই ছিল না।[৭২]

ইতিপূর্বে কর্নেটিক্স ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে *এশিয়াটিক জার্নালে* লেখেন, রোমানদের নীতি 'বিবেদ জিইয়ে রাখো আর শাসন করতে থাকো'—হিন্দুস্থানে আমাদের শাসন টিকিয়ে রাখতে গ্রহণ করা প্রয়োজন—চাই সেটা রাজনৈতিক ব্যাপারে হোক কিংবা সামরিক।[৭৩]

থমসন তার *ইনকিলাবে হিন্দুস্থান কি দুসরা রুখ* গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠায় লেখেন, ব্রিটিশ রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ গ্লেডস্টোন ও সেলসব্রিদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছি। কেননা, সময়ের চাহিদা ভিন্ন। কিন্তু হিন্দুস্থানের ব্যাপারে আমরা সেই সেকেলে চিন্তাধারাই অনুসরণ করে চলেছি। হিন্দুস্থানিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি আর জিইয়ে রাখাটা আমাদের রাজনীতিকদের একটা শখের বিষয় বনে গেছে। তবে আজ হিন্দুস্থানিরা তাদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনের বিষয়টি অনুভব করতে পারছে এবং এ অনুভূতি দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর থেকে কেসিবির একটা আশ্চর্যরকম সাক্ষ্য লক্ষ করুন!

প্রশ্ন নং ৫৬৩ : আপনি কি এটা রোধ করতে পারবেন যে, ওরা (হিন্দুস্থানিরা) কোনোদিনই তাদের শক্তি ও আত্মপরিচয় আবিষ্কার করতে পারবে না?

জবাব : আমার জানামতে, মানবসভ্যতায় এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যে, কিছুসংখ্যক মানুষ ৬ কোটি জন-অধ্যুষিত একটা বিশাল রাষ্ট্র জয় করে সেখানে বেশিদিন তাদের দখলদারিত্ব বজায় রাখতে পারে; যদি-না তাদের থেকে তাদের জাতীয় শিক্ষা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তাদের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কেননা, যখনই তারা শিক্ষার আলোয় নিজেদের আত্মপরিচয় আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে, তখনই তাদের থেকে বিভেদ ও বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। তাদর আত্মাটাও উদার হয়ে উঠবে। এরপর বিজয়ী জাতিকে সেখান থেকে তাদের গাঁটরি নিয়ে পালাতে হবে।[৭৪]

চার্চিল ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জুন ভাষণে বলেন, প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িকতা বাড়ানোর ফরমান জারি করবেন; কিন্তু আমার ধারণায় এটা হবে অনুচিত পদক্ষেপ। এভাবে একটা সম্প্রদায়কে খুশি রাখা যাবে ভাবলে এটা হবে কল্পনাবিলাস। রোমানদের নীতি ছিল 'বিভক্ত করো আর শাসন করো।' কিন্তু আমরা ঐকমত্যে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এটা উচিত নয়। তবে আমরা এ কথাও বলছি না যে, এমন কোনো পলিসি অবলম্বন করা হোক, যার মাধ্যমে

---

[৭২] *হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি* : ৫৫।

[৭৩] প্রাগুক্ত : ৫২।

[৭৪] *খুশহাল বারতানুবি হিন্দ,* তরজমা স্পার্স ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া।

তাদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়। অবশ্য তাদের ঐক্য আমাদের সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতির কারণ। আসল কথা হলো, ব্যাপারটা খুবই জটিল। আশঙ্কা হচ্ছে আমরা এই ভয়ংকর জটিলতায় ফেঁসে যেতে পারি।[৭৫] স্যার জন মিনার্ড বলেন, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার শুরু ব্রিটিশদের হাতে।[৭৬]

হিন্দু-মুসলিম বৈরিতার একটি অদ্ভুত নমুনা লক্ষ করুন! উকিল অম্বিকাচরণ মজুমদার বলেন, আমার শাসনামলের শুরুর দিকে হিন্দুদের মুসলিমবিদ্বেষী করে তোলা হয়। পরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের। ফলে ধীরে ধীরে মুসলিম-হিন্দু দ্বন্দ্ব-কলহ চরমে পৌঁছাতে থাকে।[৭৭]

আর এস রোনেকার এফ.সি.পি. ব্রিটেন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, সুইজারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও ব্রিটেন সফরকালে আমি শীর্ষস্থানীয় নেতা, আইনজ্ঞ, জার্নালিস্ট ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পেয়েছি। লন্ডন সফরকালে আমি গুজব শুনতে পাই, কতিপয় কনজারভেটর হিন্দুস্থানে দাঙ্গা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমি এ-ও শুনতে পাই, এরা হিন্দুস্থানের ইতরশ্রেণিকে এর জন্য অর্থের জোগান দিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া এ গুজবও শুনতে পাই যে, কনজারভেটিব পার্টির এক সদস্য দাঙ্গা সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে হিন্দুস্থান রওনা হয়ে গেছে।[৭৮]

সাত. সারসংক্ষেপ

মোটকথা, ইংরেজরা হিন্দুস্থানিদের আকাশউঁচু চরিত্র ধ্বংস করে দেয় এবং এ লক্ষ্যে প্রথমেই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেয়। তারা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটায়, যা একদিকে ভারতীয়দের নিজ ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী আর ইংরেজদের আস্থাভাজন হিসেবে গড়ে তুলছিল। অপরদিকে তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টিতে ইন্ধন জোগাচ্ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাদের 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি কার্যকারী হয়। এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই হিন্দুস্থানিদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছিল।

---

[৭৫] *লিড নিউজ*, ১৪ জুলাই ১৯৩২।

[৭৬] *রওশন মুসতাকবিল* : ২৩১—*আন হেপি ইন্ডিয়া* : ৩০৮।

[৭৭] *রওশন মুসতাকবিল* : ১৫৫—*হিন্দুস্থান কি কওমি ইরতেকা* : ২৪৭।

[৭৮] *প্রতাপ লাহোর*, ২১ নভেম্বর ১৯৪৬ সংখ্যা : ২৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক আগ্রাসন

এক. হিন্দুস্থানের অতীত অর্থনীতি

ডক্টর বেকার বলেন, ভারতের প্রবাদতুল্য বিত্তবৈভব, ব্যবসাবাণিজ্য আর জনগণের সমৃদ্ধ জীবন আলেকজান্ডারের অন্তরে দারুণ রেখাপাত করে। ইরান বিজয়ের পর এদিকে রওনা হলে তার সেনাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, এখন তোমরা সেই সোনার ভারতে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, যেখানে রয়েছে সম্পদের অন্তহীন খনি। ইরানে তোমরা যা দেখেছ, এখানের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হতে পারে না।

প্রফেসর হ্যারিন *হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ* গ্রন্থের ২৬৮ পৃষ্ঠায় লেখেন, *ক্যামব্রিজ এনসাইক্লোপিডিয়ায়* আছে—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দুস্থান সম্পদের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ ছিল।[৭৯]

থার্নটন তার *সফরনামায়* লেখেন, ইউরোপের সভ্যতার গুরু গ্রিস আর ইতালি যখন জংলি জীবনযাপন করছিল, তখন হিন্দুস্থান সভ্যতার শীর্ষত্বের আসনে বসে পা দোলাচ্ছিল। তখন থেকেই হিন্দুস্থান ছিল অর্থনৈতিক জগতের কেন্দ্রভূমি। এখানকার সর্বত্র শিল্প ও কারিগরি বড় বড় প্রতিষ্ঠান বিপুল উৎপাদনে ব্যস্ত থাকত। শ্রমিকরা রাতদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ভূমি ছিল খুবই উর্বর। 'উসুল' উৎপন্নের হারও ছিল খুব বেশি। এখানে এমন সুযোগ্য কারিগর আর শিল্পীরা ছিলেন, যাদের তৈরি জিনিসের চাহিদা বিশ্ববাজারে ছিল অন্তহীন। উৎপাদিত পণ্যের মানও ছিল অত্যন্ত উন্নত। এশিয়া-ইউরোপসহ সর্বত্র ছিল এর বিপুল চাহিদা। বিশেষ করে বাংলার মিহি সুতোর কাপড় (মসলিন) ছিল এমনই বিরল মানসম্পন্ন যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও এ মানের কাপড় উৎপাদন হতো না।

ফ্রান্সের বিখ্যাত পর্যটক ব্রায়োনিয়র কালবার্ক এক চিঠিতে ভারত সম্পর্কে বলেন, এটা এমন এক তুলনাবিহীন উপসাগর, যেখানে পৃথিবীর সকল জায়গা থেকে সোনা-রুপার

[৭৯] *রেসালা তলক*, প্রথম খণ্ড : ৬।

স্রোত এসে নিপতিত হয়। অথচ খুব কষ্ট করেই একফোঁটা সম্পদ বেরিয়ে যায়।[৮০]

ইতিহাসবিদ আবদুল্লাহ ওয়াসসাফ লেখেন, আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকে এ যাবৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণের এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যেখান থেকে এখানে সোনা-রুপা এসে জড়ো হয়নি। পক্ষান্তরে এখান থেকে জড়ি-বুটি আর কিছু গাছ-গাছড়া ছাড়া অন্য কিছুই বেরিয়ে যায়নি। এমন কোনো দেশ নেই, যার মুদ্রা এখানকার বস্তু কেনায় ব্যবহৃত হয়নি।

লর্ড ম্যাকালে লেখেন, মারাঠা দস্যু আর জালিমদের লুটতরাজের পরও বাংলা ছিল 'বাগে ইরাম'-সদৃশ্য। প্রচুর জনবসতির পরও উৎপন্নজাত বস্তুর প্রাচুর্য ছিল এত অধিক যে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কখনো অভাব অনুভূত হতো না। লন্ডন আর প্যারিসের পুরনারীরা এখানকার মিহি সুতোর কাপড় পরে নিজেদের আভিজাত্যের প্রদর্শনী করে থাকত।[৮১]

মেজর বসু লেখেন, নাগরিকদের ঐশ্বর্যময় সমৃদ্ধ জীবনযাপনের বিচারে মুসলিম শাসকদের শাসনামলের কথা সোনালি হরফে লিখে রাখার দাবিদার। বিশেষ করে বাদশাহ শাহজাহানের সময় নাগরিক-জীবনের সুখী ও ঐশ্বর্যময় জীবন ইতিহাসের এক বিরল অধ্যায়।

ফাতিং নামের এক চীনা পর্যটক লেখেন, এখানকার জনগণ খুবই সুখী এবং নিশ্চিন্ত জীবনের অধিকারী। তাদের কোনো প্রকার কর আদায় করতে হয় না। নেতাদের পক্ষ থেকেও কায়কারবারে অসুবিধার সৃষ্টি করা হয় না। খাজনাস্বরূপ নামমাত্র যা কিছু উসুল করা হয়, তা উল্লেখেরও দাবি রাখে না। এখানকার রাজা-বাদশাহরা কাউকে দৈহিক শাস্তি দেন না।

প্রখ্যাত ইংরেজি পর্যটক ক্যান্টি লেখেন, গঙ্গার উভয় তীরে গড়ে ওঠা শহর এবং সেগুলোর পাশঘেঁষা দৃষ্টিনন্দন বাগানের সারি যেকোনো দর্শকের হৃদয়-মন জুড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। শহরের বাইরে রয়েছে সোনালি ফসলের বিস্তীর্ণ সাগর, যেন হাওয়ার সঙ্গে সোনা-রুপার শীষ দোল খাচ্ছে। এ ছাড়া এখানে রয়েছে সোনা-রুপা আর হীরে-মতির বিপুল খনিজ সম্পদ।'[৮২]

ডু ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে লেখেন, বাংলার নাবাব সিরাজুদ্দৌলার শাহাদাতের পর যারা বাংলার মাঠ-ঘাট দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের জিজ্ঞেস করলেই এ সত্য জানা হয়ে যাবে যে, এ ভূখণ্ডই ছিল পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা সম্পদের অধিকারী। এখানকার কৃষি, কারিগরি আর শিল্পব্যবস্থা ছিল নজিরবিহীন। এখানকার শরিফ খান্দানের লোক আর ব্যবসায়ীরা যেন অর্থ আর বিলাসী জীবনের যাবতীয় উপকরণ দু-হাত ভরে লুটছিলেন।

---

[৮০] *রেসালা মাজলুম কেসান* : ১৩।

[৮১] প্রাগুক্ত : ১৬, ১৭।

[৮২] প্রাগুক্ত : ১৩, ১৪।

নিম্নপর্যায়ের কৃষকদের ওপরও যেন সুখ আর শান্তির বৃষ্টি বর্ষাচ্ছিল।[৮৩]

১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে দেশে কম-বেশ হাজার প্রকার মুদ্রার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে ১৩৯ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, ৪১ প্রকার সোনার হিন (দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মুদ্রা), যাকে প্যাগোডাও বলা হতো । ৫৫৬ প্রকার রৌপ্যমুদ্রা এবং ২১৪ প্রকার ভিনদেশি মুদ্রার কথা না বললেই নয়। শুধু বোম্বাই এলাকার দেওয়ানি আদালতসমূহের সুবিধার্থে প্রচলিত মুদ্রার যে সূচি তৈরি করা হয়েছিল, তাতে ৩৮ প্রকার স্বর্ণমুদ্রার এবং ১২৭ প্রকার রৌপ্যমুদ্রার কথা উল্লেখ ছিল। এ সূচি তৈরির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এগুলোর বিনিময়ে ইংরেজি মুদ্রা ভাঙাতে যেন সহজ হয়। সোজাকথায়, শুধু ওই এলাকায়ই যেন ১৬৫ প্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। এ ছাড়া তামার মুদ্রা তো ছিলই।[৮৪]

১. সম্রাট আকবরের শাসনামলে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার ওজন

মুদ্রার নাম	পরিমাণ
১ নং মহরে শাহি মূল্যমান ১ হাজার রুপি	ওজন ১২০ তোলা
২ নং মহরে শাহি	ওজন ৯০ তোলা
৩ নং মহরে শাহি	ওজন ৫০ তোলা
৪ নং মহরে শাহি	ওজন ২৫ তোলা
৫ নং মুদ্রা	ওজন ২০ তোলা
৬ নং মুদ্রা	ওজন ৩ তোলা
৭ নং মুদ্রা	ওজন ২ তোলা
৮ নং মুদ্রা	ওজন ১ তোলা
৯ নং মুদ্রা	ওজন ১৭ গ্রেন বা ১১ মাষা

২. সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময় নিম্নোক্ত মুদ্রার প্রচলন ছিল

মুদ্রার নাম	পরিমাণ
নুরে শাহি	১০০ তোলা
নুরে সুলতানি	৫০ তোলা
নুরে দৌলত	২০ তোলা
নুরে করম	১০ তোলা
নুরে মহর	০৫ তোলা
নুরে জাহানি	০১ তোলা

[৮৩] *রওশন মুসতাকবিল*: ৪৪।

[৮৪] *হিন্দুস্থানের অর্থনীতি*: ৩১৭।

নুরানি	০৬ মাষা
জাওয়াজি	০৩ মাষা

এগুলোর সবটিই ছিল স্বর্ণমুদ্রা। এ ছাড়া রৌপ্যমুদ্রাও ছিল

মুদ্রার নাম	পরিমাণ
কাওকাবে চাঁদ	১০০ তোলা
কাওকাবে ইকবাল	৫০ তোলা
কাওকাবে মুরাদ	২০ তোলা
কাওকাবে বখত	১০ তোলা
কাওকাবে চাঁদ দ্বিতীয়	০৫ তোলা
জাহাঙ্গিরি	০১ তোলা
সুলতানি	০৬ মাষা
মুনশারি	০৩ মাষা
খায়রে কবুল	১০/২ মাষা।[৮৫]

আওরঙ্গজেব ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর দিল্লি ও আগ্রার শাহি খাজানার অর্থ পুনঃশুমারির নির্দেশ দেন। কয়েক হাজার লোক ছয় মাস যাবৎ রৌপ্যমুদ্রাগুলো ওজন করছিল। ছয় মাস পর বাদশাহ খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, এ যাবৎ শাহি খাজানার মাত্র এক কোণার মুদ্রা গণনা শেষ হয়েছে। স্বর্ণমুদ্রা আর মূল্যবান পাথরের পালা এখনো আসেইনি। এ কথা শুনে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শুমারি কর্মসূচি বন্ধ করে দাক্ষিণাত্যের অভিযানে রওনা হয়ে যান।[৮৬]

এ জন্যই জার রুশ পেট্রা তার মৃত্যুকালীন অসিয়তনামায় লিখে যান—রুশরা যেন হিন্দুস্থান দখল করে সেখানকার সোনা-রুপা সংগ্রহ করে এবং এর দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যে হুকুমত চালাতে থাকে!

সেখানকার জনগণ ছিল অন্তহীন সুখী আর নিশ্চিন্ত জীবনের অধিকারী। তাদের জীবন ছিল খুবই আরামের। বাদশাহরা বছরে দু-বার সোনা-রুপা দ্বারা নিজেদের পরিমাপ করে থাকতেন। অর্থাৎ, নিজেদের শরীরের ওজন পরিমাণ সোনা-রুপা প্রতিবছর গরিবদের বণ্টন করে দিতেন।[৮৭]

সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁর নিজের লেখা *তুজকে জাহাঙ্গিরি*তে লেখেন, প্রথমবার আমার ওজন দাঁড়ায় ৩ মন ১০ সের। এরপর ফল-ফলাদিসহ আরও ১২ দফা আমি পরিমিত

---

[৮৫] *তুজকে জাহাঙ্গিরি*: ১৮। (মাষা হলো এক তোলার ১২অথবা ১০ কিংবা ০৮ ভাগের একভাগ।—*অনুবাদক*।

[৮৬] *ইলমুল মাশিয়াত*।

[৮৭] *নকশে হায়াত*, প্রথম খণ্ড।

হই। এভাবে বছরে দু-দফা আমি পাল্লায় ওঠি। প্রতিবারই সোনা-রুপা আর ফল-ফলাদির সঙ্গে পরিমিত হই। প্রথম দফা পরিমিত হই সৌরবছরের শুরুতে এবং দ্বিতীয় দফা চন্দ্রবছরের শুরুতে। যে বস্তুর সঙ্গে পরিমিত হই, তা পৃথক খাজাঞ্চিকে দিই, যেন তারা এগুলো ফকির-মিসকিনদের সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে দেয়।[৮৮]

প্রতিদিন বিকেলে যখন বাদশাহরা হাওয়া খেতে হাতির পিঠে চড়ে বেরোতেন, তখন তাঁদের সওয়ারির ওপর ডানে-বামে থাকত অজস্র মুদ্রায় পূর্ণ দুটি থলে। বাদশাহরা রাস্তা দিয়ে যেতেন আর দুহাতে তা বিলিয়ে দিতেন। প্রতিদিন ঘুমানোর সময় তাঁদের বালিশের পাশে হাজার হাজার মুদ্রায়-পূর্ণ থলে রাখা হতো। সকালে ঘুম থেকে উঠেই কোনো কাজ শুরুর আগে এগুলো বিলিয়ে দিতেন। অশেষ সম্পদ না থাকলে যে এমন উদারতা প্রকাশ সম্ভব ছিল না, তা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রাখে না।[৮৯]

আল্লামা মাকরিজি তাঁর *কিতাবুল খিতাতের* দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৪ পৃষ্ঠায় লেখেন, বাদশাহ মুহাম্মাদ তুগলক প্রতিবছর ২ লাখ জামা জনসাধারণকে দিতেন। বাহিনীর সেনারা ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবছর ১০ হাজার ঘোড়া বণ্টন করতেন। প্রত্যেক শাসকের সঙ্গে দৈনিক ২০ হাজার মানুষ আহার করতেন। শাহি বাবুর্চিখানায় রোজ আড়াই হাজার গরু আর ২ হাজার বকরি জবাই করা হতো। প্রতিদিন ২০০ আলিম বাদশাহর দস্তরখানায় খেতেন। শুধু দিল্লি শহরেই জনগণের স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ছিল ৭০টি হাসপাতাল। পথিক আর মুসাফিরদের জন্য ছিল প্রায় ২ হাজার পান্থশালা ও আস্তাবল। এ ছাড়া ছিল ১ হাজার মাদরাসা, যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হতো।

উপরের উদ্বৃতিসমূহের আলোকে অনুমান করা যায়, তখনকার উপমহাদেশ কী পরিমাণ সুখী আর সমৃদ্ধ ছিল। তারা বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে কী পরিমাণ সভ্য আর মর্যাদাবান জাতি হিসেবে বিবেচিত হতেন; কিন্তু এই সোনার দেশটিই ইংরেজদের শাসনামলে একটা বিরাণভূমিতে পরিণত হয়।

এবার একটু ইংরেজদের প্রতারণা আর লুটতরাজের দাস্তান শুনুন এবং হৃদয় দিয়ে অনুভবের চেষ্টা করুন—আমাদের সোনার উপমহাদেশের কী হাল হয়। এখানেও আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার চেষ্টা করব।

দুই. ব্রিটিশ-ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার খণ্ডচিত্র

লর্ড সেল্সব্রি ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ, হিন্দুস্থানে তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাবস্থায় লেখেন, হিন্দুস্থান থেকে প্রচুর অর্থ আমাদের ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়; অথচ এর প্রতিদানস্বরূপ

[৮৮] *তুজকে জাহাঙ্গিরি* : ৪১-৪২, ৯১-৯৮-১২৬।

[৮৯] *নকশে হায়াত*, প্রথম খণ্ড।

আমরা হিন্দুস্থানবাসীকে কিছুই দিইনি। এটা কি তাদের ওপর ছোটখাটো কোনো আঘাত ছিল? কিন্তু শুধু এটাই নয়; বরং হিন্দুস্থানের আরও অনেক গভীরে আমরা আঘাত হেনেছিলাম। রক্ত বইয়ে দিতে হলে তো এমন স্থানেই ছুরি চালাতে হয়, যেখান থেকে বেশি পরিমাণে রক্ত বেরোয়। খুনের অভাবে দুর্বল গ্রাম্য কৃষকশ্রেণির ওপর আঘাত হানার কোনোই প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমরা কাউকে রেহাই দিইনি। আজ সময় এসেছে রক্তের এই হোলিখেলা বন্ধ করার।[৯০]

স্যার চার্লস ইলিয়ট[৯১] ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে লেখেন, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এখানকার অধিকাংশ কৃষক এমন পর্যায়ে আছে যে, তারা বছরে একবেলা পেট পুরে খাওয়া কাকে বলে তা জানে না![৯২]

আরবান[৯৩] লেখেন, নিঃসন্দেহে শহুরে লোকেরা উপবাসের যে কষ্ট সহ্য করেছেন, কৃষকদের তুলনায় তা কিছুই নয়। পর্দানশিন মহিলা আর অভিজাত খান্দানের লোকেরা, যাদের আয় প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য, যারা পুরানো আভিজাত্যের ফলে ভিক্ষেও করতে পারছেন না; তারা যে কী অবর্ণনীয় অবস্থায় আছেন, তা ভাষায়ও ব্যক্ত করার নয়। একে তো সর্বগ্রাসী অভাব, তদুপরি জিনিসপত্রের দুর্মূল্য। সব মিলে যেন অবস্থাটা হচ্ছে মরার ওপর খাড়ার ঘায়ের সমতুল্য।

হিন্দুস্থান সফর শেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এ. এ. বার্সেল তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ওরা মশা-মাছির মতো মারা যাচ্ছে।

লালা রাজপুত রায় এক আমেরিকান মিশনারির বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, দক্ষিণ-হিন্দুস্থানের লোকগুলো জীবন অতিবাহিত করছে না; বরং তারা যেন অসীম কষ্টে জগদ্দল পাথরের মতো চেপেবসা জীবনের একেকটা দিন ঠেলে-ধাক্কিয়ে পার করছে। আমি অনেক ঘরে মৃত ভক্ষণ করতে পর্যন্ত দেখেছি; অথচ তখন অজন্মাও ছিল না।

ডব্লিউ এস ব্লিন্ট বলেন, আমি হিন্দুস্থানি অর্থনীতির রহস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে তালিম নিয়েছি। আমার এই শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি ও কমিশনার। আমি আমার অধ্যয়নের আলোকেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই—আমরা এ প্রক্রিয়ায় দেশকে এগিয়ে নিতে চাইলে ভবিষ্যতে এমনও দিন আসবে, তারা একে অন্যকে খাওয়া শুরু করবে। কেননা, সেদিন তারা মানুষ ছাড়া খাওয়ার মতো আর কিছুই পাবে না।[৯৪]

---

[৯০] *হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি* : ৪৫।

[৯১] ভারতের আসামের চিফ কমিশনার।

[৯২] *হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি* : ৮২।

[৯৩] রায়বেরেলির ডেপুটি কমিশনার।

[৯৪] *হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি* : ৮৩।

কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সেবিল মেরিট ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে লেখেন, ব্রিটিশের শাসনামলকে খুবই কল্যাণমুখী আর প্রজাদরদি হিসেবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে; কিন্তু তাদের শাসনামলকে মুসলিম শাসনামলের সঙ্গে তুলনা করলে বাধ্য হয়েই বলতে হবে, মুসলিমদের শাসনামলই ছিল সবদিক দিয়ে উত্তম। তখন প্রজারা ছিল শান্তি-সুখে; আর এখন তারা ধ্বংসের কৃষ্ণগহ্বরে নিপতিত।[৯৫]

এ. এ. বার্সেল ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে তার হিন্দুস্থান সফরে সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার পর লেখেন, হিন্দুস্থানের একটা বিপুল জনগোষ্ঠী জন্মের পর থেকে মৃত্যু অবধি একটা দিনও পেট পুরে খেতে পারছে না; অথচ সেখানে ব্রিটিশ শাসনামলের প্রায় শতবর্ষ পার হয়ে যাচ্ছে। বাঙাল ও বোম্বের মতো যেসব স্থানে তাদের সম্পর্কটা অত্যন্ত নিবিড়, সেখানেও স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচ্ছন্নতার চিহ্নমাত্র নেই। সর্বত্রই যেন একটা ঘুমন্ত বিদ্রোহ হাই তুলছে বলে মনে হচ্ছে। ২৫ কোটিরও অধিক মানুষ এমন রয়েছেন, যারা জীবনভর পেট পুরে খাওয়ার মতো চাল পাচ্ছে না।[৯৬]

সাইমন তার রিপোর্টে লেখেন, বিশাল একটা জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি পশ্চিমা মানদণ্ডের তুলনায় অনেক অনেক নিচে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই নেই।[৯৭]

খ্যাতিমান অর্থনীতিজ্ঞ এইচ এম স্যান্ডুম্যান বলেন, হিন্দুস্থান রোজ রোজ দুর্বল হতে চলেছে। মনে হচ্ছে সেখানকার জনগণের শরীর থেকে দ্রুতলয়ে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে![৯৮]

ডক্টর রজারফোর্ড ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে লেখেন, এখানকার সর্বত্র জীবন বাঁচানোর ভয়ংকর সংগ্রাম চলছে।

অন্যত্র প্রান্তিক লোক সম্পর্কে লেখেন, একজন ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে আমার সবচেয়ে দুঃখ আর আফসোস হয়, আমিও বোধহয় এদের শারীরিক কঙ্কালসার দেহের জন্য দায়ীদের একজন। আমরা আজও বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার কিংবা খাল খনন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন বাড়ানোর কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করিনি। এমনটি করলে হয়তো এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কিছুটা এড়ানো যেত।[৯৯]

পার্লামেন্টের অভিজ্ঞ সদস্য এবং কমনওয়েলথ অব ইন্ডিয়া লিগের চেয়ারম্যান ফ্রিম্যান ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে লেখেন, ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী হিন্দুস্থানে

---

[৯৫] প্রাগুক্ত : ২৭/২৮।

[৯৬] *আখবার ছাব লক্ষ্ণৌ*, ১২ জুলাই ১৯২৮—*ডেইলি হেরাল্ডলন্ডন*, ২৯ মে ১৯২৮।

[৯৭] *হিন্দুস্থান টাইমস*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩০—*রিপোর্ট অব সাইমন কমিশন*।

[৯৮] *মায়িশাতে আম্মা*।

[৯৯] *মডার্ন ইন্ডিয়া* : ১৫৪।

কল্যাণধর্মী শাসন প্রতিষ্ঠায় বাধ্য; কিন্তু আমরা কি সেই চুক্তির কানাকড়ি মূল্য দিচ্ছি? আমি একটু আগে যেসব উদাহরণ ও বাস্তবতার বিবরণ দিয়েছি, ওগুলোই এ তিক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। বলা হচ্ছে, হিন্দুস্থানিদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হলে জনসাধারণের মাথায় বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়বে। আমি বলি, ব্রিটিশ সরকার ১০০ বছর ধরে তাদের ওপর যে বিপদ চাপিয়ে দিয়েছে, এর চেয়ে বড় বিপদ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। আমরা যে আইন প্রণয়ন কমিটি তৈরি করেছি, সেখানে তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই। আমরা দরিদ্রদের দুর্বল কাঁধেই ট্যাক্সের ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি।

এটা সরকারি রিপোর্ট। এই রিপোর্টেই যখন এ সত্য প্রকাশ পায় তখন বাস্তব অবস্থা যে কোন পর্যায়ের ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

দুর্ভিক্ষ যেন হিন্দুস্থানি উপোস জনগণের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। ৪ থেকে ৭ কোটি মানুষ ছিল এমন; উপবাসই ছিল যাদের আজন্ম সাথি।[১০০]

প্রিয় পাঠক, এই ছিল প্রিয় মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের অতীত-বর্তমানের খণ্ডচিত্র। এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ, এটা কোনো আবেগতাড়িত লেখকের কথা নয়; বরং খোদ ইংরেজদের মুখে উচ্চারিত নিরেট ও অনস্বীকার্য সত্য। আর এ কথা বোধহয় আপনারা সবাই জানেন, জাতির ভবিষ্যৎ বর্তমানের গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়ে থকে। সুতরাং আপনারাই বলুন, দেশমাতৃকার আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোনো সন্তান; বিশেষ করে যারা দেশ ও দশের কথা নিয়ে ভাবেন, দেশের জন্য নিজের জানবাজি রাখতে কেন দ্বিধা করবেন? তারা কি প্রিয় জন্মভূমির এ করুণ অবস্থাদৃষ্টে নিশ্চুপ আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? দেশ যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল তখন কি তার ডাক্তারের পক্ষে চিকিৎসার হাত না বাড়িয়ে নীরব বসে থাকা সম্ভব?

এ অবস্থাই ছিল তখনকার দেশের সিংহশাবক আলিমের সামনে। দেশের এ ভয়াবহ অবস্থা দেখেই বিচলিত হয়ে ময়দানে নেমে আসেন আজাদির তুর্যবাদক মহাভারতের মহান সন্তান মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহ.। দেশ ও জাতির মুক্তিকামনাই ছিল যাঁর দিন-রাত্রির একমাত্র আরাধনা। তাঁর স্বপ্ন ছিল আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যাবেন সুন্দর ও সমৃদ্ধ এক মহাভারত। সেই মহান ব্রত সামনে রেখেই তিনি ছাত্র আর মুরিদদের ভেতর জাগিয়ে দেন মুক্তিসংগ্রামের এক আগুন; জীবন-মৃত্যুকে পায়ে দলে জিহাদের ময়দানে এগিয়ে আসার অনন্ত প্রেরণা। নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়েন আজাদির সেই মহান জিহাদে। জগৎ আজও যাকে 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' নামে স্মরণ করে থাকে। আমাদের এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ও এটি।

---

[১০০] *মদিনা বিজনৌর*, ২৫ মার্চ ১৯৩০—*লন্ডন নিউজ*।

শায়খুল হিন্দের সামনে ইংরেজদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পুরো চিত্র ছিল উপস্থিত। এ বিষয়ে তিনি এত গভীর জ্ঞান রাখতেন, ইতিহাস-বিশারদরাও তাঁর মুখে আগ্রাসনের বিস্তারিত তথ্য জেনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন। তাঁর কাছে ভারতের এ করুণ অবস্থার জন্য দায়ী ছিল একমাত্র ইংরেজরাই। তাঁর ধারণাটি ছিল শতভাগ যথার্থ। ওরা এখানকার সম্পদকে এমনভাবে দু-হাতে লুটে চলছিল যে, মানুষ তাঁর মুখে ইংরেজদের গাদ্দারি, প্রতারণা আর লুণ্ঠনের দাস্তান শুনে ভাবত; তিনি হয়তো গোটা জীবনটাই অর্থনীতির গবেষণায় কাটিয়েছেন।

পেছনে বা সামনে আমরা যেসব তথ্য উপস্থাপন করেছি, তা মূলত হজরতের মুখ থেকে শোনা তথ্যের প্রতিধ্বনি। সামনের কটা পৃষ্ঠা অভিনিবেশসহ পাঠ করলে অধিকতর অনুমিত হবে যে, তিনি এ ব্যাপারে কত গভীর জ্ঞান রাখতেন। তাঁর মস্তিষ্ক ছিল একটা জীবন্ত লাইব্রেরিতুল্য। যেখানে সবকিছুর জ্ঞান ছিল বিদ্যমান। আপনারা একটু অনুমান করুন, ইংরেজদের লুটতরাজের দাস্তান কেমন তরতাজাভাবে তাঁর স্মরণের কোঠায় বন্দি ছিল। পরিসরের স্বল্পতাহেতু আমরা তা সংক্ষিপ্তাকারে বলতে বাধ্য। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে কয়েক খণ্ডের একটা বিশাল গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন।[১০১]

একটি দেশের উন্নতি তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল : কৃষি, শিল্প এবং মুদ্রার স্থিতিশীলতা। বিশাল ভারতবর্ষ এ তিনটি বিভাগে ছিল নিজেই নিজের উদাহরণ। পৃথিবীর কোথাও তার কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না; কিন্তু ইংরেজ জালিমরা তাদের শাসনামলে বিভাগ তিনটি একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়। ফলে তাদের হাতে হিন্দুস্থান দরিদ্র আর কাঙালের দেশে পরিণত হয়; অথচ তাদের আগে এখানকার উৎপন্নদ্রব্য বিশ্বের সর্বত্র রপ্তানি হতো।

যেসব দ্রব্যাদি ছিল রপ্তানি-তালিকার শীর্ষে : সুতা, তুলা, মোটা সুতার কাপড়, সব ধরনের মিহি সুতা ও রেশমের কাপড়, সব ধরনের তেল, হীরা, মূল্যবান পাথর, গরদ কাপড়, নীল, চিনি, লাক্ষা, সিরকা, আদা, ঘি, ক্ষার, বিষের প্রতিষেধক, মরিচ, মোম, লবণ, কাগজ, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য, সুতি ও পশমি মখমল, সিসা, সিসাজাত দ্রব্য, লোহা ও অস্ত্রশস্ত্র। এসব দ্রব্য বার্মা, জাভা, সুমাত্রা, জাপান, কাবুল, ইরান, ইরাক, আরব, তুর্কিস্থান এবং ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে রপ্তানি হতো। সেসব জায়গায় এসব পণ্যের চাহিদাও ছিল প্রচুর। ফলে হিন্দুস্থানের অর্থনীতি দিন দিন কেবল শক্তিশালী হচ্ছিল। দ্বিগুণ-ত্রিগুণহারে প্রতিদিন বৈদেশিক মুদ্রা এসে রাজকোষকে করছিল সমৃদ্ধ।

কৃষিখাতে উন্নতি ছিল আরও বিস্ময়কর। যদিও মুসলিম রাজা-বাদশাহদের আমলে হিন্দুস্থান কৃষিনির্ভর কোনো দেশ ছিল না। এখানকার মাত্র ৪০% মানুষ কৃষির মাধ্যমে

[১০১] *নকশে হায়াত*, দ্বিতীয় খণ্ড।

নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন; তথাপি যেহেতু কৃষকের তুলনায় জমি ছিল প্রচুর, তাই প্রত্যেক কৃষকের মালিকানায় ছিল প্রচুর অনাবাদি জমি। কৃষকরা জমির একাংশ চাষ করে বাকি অংশ এমনি ফেলে রাখতেন, এতে জমির উৎপাদনশক্তি বেড়ে যেত। দু-তিন বছর পর আবাদকৃত অংশ ফেলে রেখে অনাবাদ অংশে চাষ শুরু করতেন। ফলে জমির উর্বরাশক্তি একটুও কমত না; কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে শিল্পব্যবস্থা লাটে উঠলে কৃষকের সংখ্যা ৮০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। এতে স্বাভাবিকভাবেই মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমে যায়। মানুষ একই জমিতে কয়েকবার ফসল ফলাতে বাধ্য হয়। বছরে কয়েক দফা চাষের ফলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় এবং জমির উর্বরাশক্তিও ব্যাহত হয়। আর এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে রপ্তানিখাতও দারুণভাবে মার খায়। এ ছাড়া যে সামান্য পরিমাণ উৎপাদন হতো, তা-ও জোরপূর্বক ব্রিটেনে পাচার করা হতো। ফলে উপবাস আর দুর্ভিক্ষ হয়ে ওঠে হিন্দুস্থানিদের ললাট-লিখন। সামনে এ নিয়ে কিছু লেখা হচ্ছে।

তৃতীয় হচ্ছে নগদ অর্থ : শিল্পব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার ফলে বহির্দেশ থেকে নগদ অর্থ আমদানির পথও বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া নগদ অর্থের যে খাজানা তখনো ছিল, তা লুটেপুটে নেওয়া হয়। একসময় যে হিন্দুস্থানে সোনা আর রুপা সের ও মন ধরে বিক্রি হতো, এখন সেখানে তোলা আর মাষার বাটখারায় পরিমাপিত হয়। এখন একটুকরো সোনা দেখতে মানুষকে ভিড় জমাতে দেখা যায়। অনেকে সোনা কেমন, তা জানেনও না।

লক্ষণীয়, এ আকাশ-পাতাল তফাতটা কী জন্য ঘটল? দেশটা উন্নতির শীর্ষদেশ থেকে কেন পতনের অতল খাদে গড়িয়ে পড়ল? এ বিষয়গুলোর কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য দেশের শ্রেষ্ঠতম মেধাগুলো অকস্মাৎ চমকে ওঠে। তাঁদের অন্তরের গোপন কুঠুরিতে ইংরেজদের প্রতি ঘৃণার অনুভূতি তীব্রতর হচ্ছিল। জাতির এমন করুণ অবস্থা দেখে তাদের আবেগ শরবিদ্ধ আহত পাখির মতো তড়পাচ্ছিল। তাঁদের হৃদয় থেকে সুখের আমেজ তিরোহিত হয়ে যায়। রাত-দিনের ২৪টি ঘণ্টা তাদের ব্যাকুল দেখাচ্ছিল। তাঁদের চোখের সামনে ছিল না-খেয়ে মরা হাজারো লাশের স্তূপ। তাঁরা দেখতে পাচ্ছিল ক্ষুধাতুর শিশুদের মরণ-গোঙানি আর তড়পাতে তড়পাতে মরার দৃশ্য। তাদের কানে বাজছিল সর্বব্যাপী হাহাকার আর কান্নার কোরাস। এটাই ছিল এ মহান বিপ্লবের পটভূমি।

সংক্ষিপ্ত এ উপস্থাপনার পর আমরা কথাটা এখানে রেখেই এগোচ্ছি। ব্যাখ্যা জানার ভার পাঠকদের ওপরই ছেড়ে গেলাম। আমাদের কথার মোটামুটি ফলাফল দাঁড়ায় এই—একসময় যে ভারত ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী দেশ, ইংরেজ গোঁড়াদের কল্যাণে তা হয়ে যায় কাঙালের দেশ; কিন্তু কেন এমনটি হলো?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইংরেজদের লুটতরাজের দাস্তান

এক. ইংরেজদের ত্রিকালব্যাপী লুটপাট

হিন্দুস্থানের অর্থনীতির ওপর এই ধ্বংসাত্মক বিপ্লব কেন সংঘটিত হলো? হ্যাঁ, স্রেফ ইংরেজদের লুটতরাজের বদৌলতে। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির হাতেই শুরু হয়েছিল এই দীর্ঘ লুটতরাজের সূত্রপাত। আমরা আলোচনার স্বার্থে এ অভিযানটিকে তিনটি কালে বিভক্ত করেছি।

প্রথম কাল : শুধু বণিক হিসেবে।

দ্বিতীয় কাল : আধা-বণিক ও আধা-শাসক হিসেবে।

তৃতীয় কাল : পরিপূর্ণ শাসক হিসেবে।

প্রথম কালের মেয়াদ ছিল ১৬০০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় কালের মেয়াদ ছিল ১৭৫৭ থেকে ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

তৃতীয় কালের মেয়াদ ছিল ১৮৩২ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

দুই. কোম্পানির লুটতরাজের প্রথম কাল

১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রানি এলিজাবেথের নির্দেশে কোম্পানি বাদশাহ শাহজাহানের শাসনামলে মাত্র ৩০ হাজার পাউন্ডের পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় নামে। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে রানি কোম্পানির কাছে ১০ হাজার পাউন্ড কর্জ চাইলে তারা তা দিতে অপারগতা দেখায়; কিন্তু পরের বছর ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারকে ১৩ হাজার পাউন্ড উপহারস্বরূপ দেয়। এরপর ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে তারা সরকারকে ৪০ হাজার পাউন্ড নজরানা দেয়। এভাবে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে দেয় ৬০ হাজার, ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ৪ লাখ এবং ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে দেয় ১০ লাখ পাউন্ড। সরকার এর প্রতিদানস্বরূপ হল্যান্ড, পর্তুগিজ, ফরাসি ও জার্মান কোম্পানিগুলোকে ব্যবসার অনুমতি না দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একক ঠিকাদারি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানিকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

এবার আপনারাই ভেবে দেখুন, যে কোম্পানি এত বিপুল অঙ্কের নজরানা সরকারকে দিতে পারে, তাদের লাভের পরিমাণটা ছিল কত বিশাল? অবশ্য তারা সে অঙ্কটা কোনো কালেই প্রকাশ করেনি।

তিন. লুটতরাজের দ্বিতীয় কাল

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এসে কোম্পানির অবস্থা আমূল পালটে যায়। এখন তারা আর স্রেফ বণিক নয়; এখন প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের অনুপ্রবেশ।

১. রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

অর্থাৎ, এ পর্যায়ে একজন নবাবকে সরিয়ে আরেকজনকে তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা আর এর বিনিময়ে ফায়দা হাসিলকারী পক্ষের কাছ থেকে ঘুস নেওয়াই ছিল তাদের মূল পলিসি। কাজেই দেখা যায় :

- ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তারা মির জাফরকে সিরাজুদ্দৌলার মসনদে বসানোর জন্য তার কাছ থেকে ৩ কোটি ৬১ লাখ ৭ হাজার ৫০০ রুপি ঘুস নেয়।
- ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মির কাসিমকে মসনদে বসাতে ঘুস নেয় ৩৬ লাখ ২৭ হাজার ৬০০ শত ৯ রুপি।
- ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মির জাফরকে পুনরায় মসনদে বসাতে ঘুস নেয় ১৪ কোটি ১৮ লাখ ০৪ হাজার ৯১০ রুপি।
- ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে নাজমুদ্দৌলাহকে শাসনক্ষমতায় বসাতে নেয় ১৯ লাখ ৭৬ হাজার ৯০০ রুপি।
- ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মির জাফর আলির বিশেষ একটি কাজ সমাধা করার প্রেক্ষিতে লর্ড ক্লাইভ ৩০ লাখ রুপি ঘুস নেয়।
- ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মির জাফরের কাছ থেকে কোম্পানি কলকাতার দক্ষিণের একটি বিরাট জায়গির নিয়ে নেয়, যার বার্ষিক আয় ছিল ১০ লাখ রুপি।
- ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কাউন্সিলের সদস্যদের ৬ লাখ রুপি নজরানা দেওয়া হয়।
- ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে ষড়যন্ত্রের প্রতিদানস্বরূপ কোম্পানির ডাইরেক্টররা ২৯ কোটি ৫০ লাখ রুপি উপহার পায়।
- ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বার্ক ওয়ারেন হেস্টিংসের ওপর এই অভিযোগে মামলা দায়ের করেন যে, তিনি ৪০ কোটি রুপি ঘুস খেয়েছেন।

২. সরকারি পর্যায়ে

একজনকে আরেকজনের আসনে বসাতে গিয়ে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে এবং এতে যে যুদ্ধলব্ধ মাল তাদের হস্তগত হয়েছে, তা উপর্যুক্ত হিসাবের বাইরে :[১০২]

- ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ম্যাকালে লেখেন, ৮০ লাখ মুদ্রা মুর্শিদাবাদ থেকে কোম্পানির সদর দপ্তরে প্রেরিত হয়।
- লর্ড ক্লাইভ বলেন, ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ৩ কোটি মানুষকে লুটে-পুটে কলকাতায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা হয়।
- ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রুক এডিসন বলেন, ইংরেজরা কোটি কোটি মানুষকে লুটে-পুটে ইংল্যান্ডকে সম্পদের গুদাম বানিয়ে ফেলেছিল।

এটা ছিল সেই সময়কার কথা, যখন লন্ডনের আশেপাশে সবেমাত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছিল। অতএব, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাদের আজকের উন্নতি আর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো মূলত হিন্দুস্থানি সম্পদের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে।

৩. বাণিজ্যিকভাবে

এ সময় কোম্পানি ব্যবসার মাধ্যমে যে অর্থ হাতিয়ে নেয়, তা অনুমান করতে নিম্নের চিত্রটি খুবই সহায়ক হবে।

১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ৮০ লাখ পাউন্ড, ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ১ কোটি, ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ১.৫ কোটি, ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ৪ কোটি পাউন্ড ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারকে উপহার হিসেবে দেয়।

এ হিসাব থেকেই আপনারা কোম্পানির আয়ের অঙ্কটা কত বিশাল ছিল, তা অনুমান করতে পারেন। তা ছাড়া তখন কোম্পানি বাদশাহ ফররুখ সিয়ারের কাছ থেকে শুল্ক কর মওকুফ করিয়ে নেয়। এর পরিণাম কী হতে পারে? দেশি ব্যবসাবাণিজ্য কি আর পথে না বসে পারে?

৪. কোম্পানির হর্তাকর্তাদের প্রাইভেট লুটতরাজ

উপরোল্লিখিত সময়ে কোম্পানির হর্তাকর্তারা ঘুস, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আর জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে যা কামাই করে, পূর্বোল্লিখিত হিসাবগুলো এসবের বাইরে। লর্ড ক্লাইভ বলেন, বজ্জাতি, ঘুসগ্রহণ আর অত্যাচারের মাধ্যমে সম্পদ লুণ্ঠনের তালিকায় বাংলার স্থান ছিল সব স্থানের ঊর্ধ্বে।

[১০২] উপরে উল্লিখিত হিসাবের নির্ঘণ্ট শুধু ঘুস ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত।

লর্ড ম্যাকালে লেখেন, তখন প্রতিটি ইংরেজ পরিবারে প্রাচুর্যের আলামত পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ব্রুক এডিসন বলেন, হিন্দুস্থান থেকে লুটতরাজ চালিয়ে ইংল্যান্ডে যা পাচার করা হয়, তা ছিল অনুমানের বাইরে।

৫. পরিণতি

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব সাধিত হয়। ব্রুক এডিসন তার *কানুনে তামাদ্দুন ও তানাজ্জুল* গ্রন্থে লেখেন, প্রথম যখন আমি ব্রিটেনে আসি, তখন সেখানে শহর, ব্যাংকব্যবস্থা বা কোনো প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না; কিন্তু বাংলার সোনা-রুপা এখানে এসে পৌঁছলে শুধু অর্থখাত নয়; বরং এখানকার জনজীবনের মোড়টাই আমূল বদলে যেতে দেখতে পাই।

স্যার উইলিয়াম ডগবি লেখেন, পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ স্রোতের মতো লন্ডনে এসে জড়ো হতে থাকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে এর ফলও প্রকাশ পাওয়া শুরু হয়। দেখা যায়, ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের আগে যেখানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোনো নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্পপ্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে।

ন্যাবিয়ার লেখেন, ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের আগে লিডসে সুতো তৈরির যে তাঁত ছিল, তা ছিল একেবারে সাদামাটা ধরনের। হিন্দুস্থানের তাঁতের সঙ্গে এগুলোর মোকাবিলা দূরের কথা; ধারে-কাছে পৌঁছারও উপযুক্ত ছিল না; কিন্তু পলাশির পর যখন বাংলার সোনা-রুপার স্রোত লন্ডন অভিমুখে বইতে শুরু করে, তখন লিডসের তাঁত শুধু যে হিন্দুস্থানি তাঁতকে ছাড়িয়ে যায় তা-ই নয়; বরং তা এখানকার তাঁতিদের তৈরি শিল্পকে অনেক পেছনে ফেলে দেয়। কেননা, আবিষ্কার একটি প্রাণহীন বস্তু। তাকে যতই নাড়াচাড়া করা হবে, ততই তার মধ্যে শক্তির উন্মেষ ঘটবে।

মেজর ভেনগেট বলেন, ১৭৫৭ থেকে ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ইংল্যান্ড ভারতবর্ষ থেকে ১৫ বিলিয়ন মুদ্রা নিয়ে যায়।

চার. লুটতরাজের তৃতীয় কাল

তৃতীয় এ কাল ছিল সম্পূর্ণ শাসনমূলক। এ কালে তারা একদিকে যেমন ছিল শাসক, তেমনি ছিল বণিক। অর্থাৎ, ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ। এ সময় সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম ডগবি লেখেন, আজ হিন্দুস্থানকে এমনভাবে লুণ্ঠন করা হচ্ছে, যা ইতিপূর্বের সব লুণ্ঠনকে ম্লান করে দিচ্ছে।

- ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মন্টোগোমারি লেখেন, সম্পদের এমন স্রোত ইংল্যান্ড থেকে

আসতে থাকলে অচিরেই তা শেষ হয়ে যেত। অতএব, একটু খেয়াল করুন, হিন্দুস্থানের ওপর কি এর কোনো প্রতিক্রিয়া পড়ছে না?

- ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুস্থানের ভাইসরয় জনশুর বলেন, আমাদের শাসনপ্রক্রিয়ার অধীনে দেশ ও তার অধিবাসীরা ক্রমশ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে।

উপরোক্ত উদ্বৃতিগুলো পেশ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই নির্লজ্জ লুণ্ঠনের কথা একটু স্মরণে দিয়ে রাখা। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলোও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

- ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ : আইনসিদ্ধভাবে যে পরিমাণ মুদ্রা হিন্দুস্থান থেকে ইংল্যান্ডে পাচার হয়েছিল, স্যার উইলিয়াম ডগবির অনুমান অনুযায়ী তার পরিমাণ ৯১ বিলিয়ন ২০ কোটি রুপি।
- ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ : হ্যান্ডোম্যানের অনুমান অনুযায়ী ১৯০০ থেকে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাচারকৃত মুদ্রার পরিমাণ হচ্ছে ২৭ বিলিয়ন ২৬ কোটি রুপি। সুতরাং ১৮৩২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত সময়ে আইনসিদ্ধভাবে হিন্দুস্থান থেকে পাচারকৃত অর্থের অঙ্ক দাঁড়ায় ১ ট্রিলিয়ন ১৮ বিলিয়ন ৮০ কোটি রুপি।
- ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অটল ভাই প্যাটেল এই হিসাবের কথা অস্বীকার করে তার ধারণা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, হিসাবটা ৪৫ ট্রিলিয়ন ৫০ বিলিয়ন পরিমাণের।

১. বেআইনিভাবে লুটতরাজ

এ তো গেল আইনসিদ্ধভাবে পাচারকৃত অর্থের হিসাব। এ ছাড়া ব্যবসাবাণিজ্য আর লুটতরাজসহ অভিশপ্ত অন্যান্য পলিসি অবলম্বনের মাধ্যমে যা পাচার হয়েছিল, তার তো কোনো হিসাব ছিল না। সে অঙ্কটা কি এর চেয়ে কম হবে? এ ছাড়া বিস্ময়কর সত্য হলো, একদিকে যেমন হিন্দুস্থানকে লুণ্ঠন করা হচ্ছিল, অপরদিকে এখানকার রাজকোষের ওপর চক্রবৃদ্ধিহারে সুদি ঋণ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এবং আসল ও সুদ উভয়টাই বছরের পর বছর ধরে এখানকার জাতীয় অর্থশালা থেকে আদায় করা হচ্ছিল। কর্জের ধরনটাও ছিল অধিকতর তাক লাগানোর মতো। যেমন ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন পুরো ভারতবর্ষটাই কোম্পানির হাত থেকে খরিদ করে নেয়।[১০৩]

ব্রিটেন যে পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কিনেছিল, সে টাকার দায়দায়িত্ব কিন্তু এখানকার রাজকোষের ওপরই চাপানো হয়। এতে যে পরিমাণ ঋণ হয়েছিল, তা চক্রবৃদ্ধিহারে হিন্দুস্থানি রাজকোষের ওপরই ফেলা হয়। এ ছাড়া ব্রিটেন তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে পৃথিবীর যে প্রান্তেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, সে যুদ্ধের ব্যয়ভারটা এখানকার

[১০৩] এ যেন ছিল কোম্পানির বাপ-দাদাদের মৌরসি সম্পত্তি।

রাজকোষ থেকেই আদায় করেছে। এ ক্ষেত্রেও তারা রাজকোষের ওপর ঋণের পাহাড় চাপিয়েছে; আর পরে তা সুদে-আসলে আদায় করে ছেড়েছে। এ ধরনের উদ্ভট ঋণের প্রথা কোম্পানির শাসনামল থেকেই শুরু হয়। নিম্নবর্ণিত চিত্রটা একটু লক্ষ করুন :

সাল	পরিমাণ
১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে	৭০ লাখ পাউন্ড
১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে	১ কোটি পাউন্ড
১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে	২ কোটি ১০ লাখ পাউন্ড
১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে	৩ কোটি পাউন্ড
১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে	৩ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ড
১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে	৪ কোটি ৩ লাখ পাউন্ড
১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে	৫ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড
১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে	৬ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড
১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে	৬ কোটি ৯৫ লাখ পাউন্ড
১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে	১০ কোটি পাউন্ড।
১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে	৩০ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ড
১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে	৪৮-৫৮ লাখ ৪০ হাজার পাউন্ড
১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে	৫১ কোটি ১৭ লাখ ৮০ হাজার পাউন্ড
১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে	১ বিলিয়ন পাউন্ড।[১০৪]

এবার আমরা সরকারিভাবে লুটতরাজকে আরও তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করছি :

১. প্রশাসনের ছত্রছায়ায়।

২. শিল্পের মাধ্যমে।

৩. ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে।

২. প্রশাসনের ছত্রছায়ায়

প্রশাসনের ছত্রছায়ায় হিন্দুস্থানকে নিঃস্ব আর দারিদ্রের একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছানো হয়। মানুষ, ব্যবসা ও ভূমির ওপর ট্যাক্স সবই দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণে নেওয়া হয়। আরোপিত ট্যাক্সের মোটামুটি একটা নমুনা দেখুন :

[১০৪] *হুকুমতে খোদ ইখতিয়ারি।*

খ্রিষ্টাব্দ	জনপ্রতি	পরিমাণ
১৮৭১	জনপ্রতি	১ রুপি ১৩ আনা ৯ পাই
১৮৮১	জনপ্রতি	৩ রুপি ২ আনা ১১ পাই
১৮৯১	জনপ্রতি	২ রুপি ৩ আনা ১১ পাই
১৯১০	জনপ্রতি	২ রুপি ১০ আনা ২ পাই
১৯১১	জনপ্রতি	২ রুপি ১৩ আনা ১১ পাই
১৯১৩	জনপ্রতি	৩ রুপি ১ আনা ৯ পাই
১৯২০	জনপ্রতি	৫ রুপি ১৩ আনা
১৯২২	জনপ্রতি	৬ রুপি ৭ আনা
১৯২৩	জনপ্রতি	৭ রুপি[১০৫]

৩. জমাবন্দি

মোগল শাসনামলে আমদানির মাত্র এক-চতুর্থাংশ খাজনাস্বরূপ নেওয়া হতো। কোনো বছর ফসল উৎপন্ন না হলে সরকার আলাদা করে খাজনা না চাপিয়ে কৃষক-মজুরদের সঙ্গে ক্ষতি ভাগ করে নিত। উৎপাদন বেশি হলে সবাই লাভবান হতেন; কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ সহজ নীতি পালটে নতুন রীতির প্রবর্তন ঘটায়। তারা একরপ্রতি জমির খাজনা উসুলের রীতি জারি করে এবং এভাবে উসুলও করতে থাকে। উৎপাদনের তারতম্যের কোনো খেয়াল করা হয়নি। এভাবে তারা শতকরা পাঁচ শতাংশকে পিছে ফেলে ৭৫ শতাংশ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ১০০ শতাংশই আদায় করতে থাকে। এর ফলে কৃষিজীবীদের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে নেমে যায়। তবে ব্রিটিশ সরকারের আয় দিন দিন কেবল বাড়তেই থাকে। নিচের নকশার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন :

প্রদেশ	মোগল শাসনামল	ব্রিটিশ শাসনামল
বাংলা	৮১,৭৫,৫২০	২,৬৮,০০,০০০
সংযুক্ত আগ্রা ও অযোধ্যা	১,৩৫,১৩,৪৭০	১,৬৮,২৩,০৯০
মহারাষ্ট্র	৮,৮০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০

এবং এ ব্যবধান দিন দিন কেবল বাড়তেই থাকে। অতএব, আরেকটু নজর দেখুন :

১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে	১,৫০,০০,০০০	১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে	১,৭৩,০০,০০০
১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে	১৯,৯৬,০০,০০০	১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে	২,৪৬,০০,০০০

[১০৫] *আখবারে ওকিল অমৃতসর*, ২৪ নভেম্বর ১৯২৩।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে	২,৫৯,১০,০০০	১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে	২,৬৫,০০,০০০
১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে	২৬,২৫,০০,০০০	১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে	৩১,২৫,০০,০০০

এ ছাড়াও হিন্দুস্থানের শিল্পজীবীদের ওপর পৃথক ট্যাক্স আরোপ করা হয়। আর তা ছিল ইংল্যান্ড থেকে আগত পণ্যের খরচের সমান। অর্থাৎ, সেই অর্থটা যেন এ দেশের শিল্পজীবীদেরই আদায় করতে হতো। ফলে দেখা যায়, সেখান থেকে পণ্য আমদানির খরচ ছিল শতকরা ৩.৫ শতাংশ। এই সাড়ে তিন শতাংশ খরচটাও এখানকার শিল্পজীবীদের কাছ থেকে আদায় করা হতো। দুনিয়ার কোনো দেশে এমনতর ট্যাক্সের নজির না থাকলেও ইংরেজরা কিন্তু এ দেশ থেকে ঠিকই আদায় করে ছাড়ত।

এগুলো হচ্ছে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। লর্ড এলিজন কর্তৃক জারিকৃত একটি ফরমানের ভিত্তিতেই এমনটি হয়; কিন্তু ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে বিক্রয় আর মুনাফার ওপরও করারোপ করা হয়।

মোটকথা, তারা কর, খাজনা আর ট্যাক্সের মাধ্যমে দেশটাকে একেবারে উজাড় করে ফেলে।

৪. প্রযুক্তিগত লুটতরাজ

হিন্দুস্থান তার কারিগরি উৎকর্ষের বিচারে একসময় ছিল বিশ্বখ্যাত। থার্নটন লেখেন, ইউরোপের সভ্যতার গুরু ইতালি ও গ্রিস যখন আধা-বন্য জীবন অতিবাহিত করছিল, তখন হিন্দুস্থান সভ্যতা, শিল্প, বাণিজ্য ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছিল।[১০৬]

মেরিড্থ টাউনশেন্ড তার *এশিয়া ও ইউরোপ* গ্রন্থে লেখেন, আমাদের আগে হিন্দুস্থানিদের জীবন ছিল সুখে পরিপূর্ণ। তাদের প্রতিটি কায়কারবারের নিয়মনীতি ছিল অত্যন্ত সহজ।[১০৭]

ডক্টর ফ্রান্সিস লেখেন, এটা সম্পূর্ণতই ভুল ধারণা যে, হিন্দুস্থানিদের সাধারণ পেশা ছিল কৃষি। মূলত হিন্দুস্থানিরা ছিল শিল্পজীবী। তাদের উৎপাদিত কাপড় ও শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্য ছিল খুবই উন্নত।[১০৮]

লর্ড ওয়েলেসলি (গভর্নর জেনারেল) এক চিঠিতে কোম্পানির ডাইরেক্টরদের উদ্দেশে লেখেন, কলকাতার বন্দরে ১০ হাজার জাহাজ পড়ে রয়েছে, এগুলো এখানকার তৈরি।

---

[১০৬] *মাজলুম কেসান*: ১৩।

[১০৭] *রেসালা তলক সাহেব*: ১১।

[১০৮] *ইলমুল মাশিয়াত*: ৫৮০।

টেইলর বলেন, হিন্দুস্থানি পণ্যবাহী জাহাজগুলো যখন পণ্য নিয়ে লন্ডনের বন্দরে নোঙর করত, তখন সেখানে এমন সাড়া পড়ে যেত, মনে হতো টেমস নদীতে যেন শত্রুর নৌবহর এসে ঢুকে পড়েছে। এখান থেকে কিছু জাহাজ নেওয়া হলে লন্ডনের জাহাজ নির্মাণশিল্পীরা এই বলে বিক্ষোভ করতে থাকে—'এভাবে হিন্দুস্থান থেকে জাহাজ আমদানি অব্যাহত থাকলে এখানকার জাহাজ-নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে আর তাদের পোষ্যরা না খেয়ে মারা যাবে। অতএব, অবিলম্বে হিন্দুস্থান থেকে জাহাজ আমদানি বন্ধ করা হোক এবং হিন্দুস্থানি মাল্লাদেরও চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। কেননা, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা আদৌ সম্ভব নয়। এ ছাড়া তারা যখন আমাদের এ দুরবস্থা দেখবে, তখন আমরা তাদের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যাব।' শ্রমিকদের এ আন্দোলনের ফলে সরকার শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই তা আইনে পরিণত করে নেয়।[১০৯]

উইলিয়াম ডগবি লেখেন, গভর্নর জেনারেল ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে এক রিপোর্টে জানান, কলকাতা বন্দরে হিন্দুস্থানিদের তৈরি ১০ হাজার জাহাজ পড়ে রয়েছে।[১১০]

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওরাগস ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি করা রিপোর্টে উল্লেখ করেন, ইউরোপের তৈরি জাহাজ মাত্র ১০ বছর সার্ভিস দেওয়ার সক্ষমতা রাখত। পক্ষান্তরে বোম্বাইর সেগুন কাঠের তৈরি জাহাজগুলো ৫০ বছরেও নষ্ট হতো না।

স্যার উইলিয়াম ডগবি লেখেন, ইউরোপের তৈরি জাহাজগুলো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়; তদুপরি নির্মাণমূল্যও আসে খুব বেশি। পক্ষান্তরে হিন্দুস্থানের তৈরি জাহাজ হয় টেকসই, তেমনি নির্মাণমূল্যও আসে খুব কম।

নিম্নোক্ত ছক থেকে তফাতটা অনুমান করুন :

বোম্বাই		
জাহাজসংখ্যা	নির্মাণের মেয়াদ	নির্মাণমূল্য
২টা	১৮ মাস	৭৫ পাউন্ড
৪টা	৩ বছর	১৫০ পাউন্ড
২০টা বা নৌবহর	১৫ বছর	৭৫০ পাউন্ড

ইংল্যান্ড		
জাহাজসংখ্যা	নির্মাণের মেয়াদ	নির্মাণ মূল্য
২টা	অজ্ঞাত	১০০ পাউন্ড

[১০৯] *মায়িশাতুল হিন্দ* : ৬৯৮।

[১১০] *ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* : ৯০৮।

৪টা	অজ্ঞাত	৩০০ পাউন্ড
২০টা বা নৌবহর	অজ্ঞাত	১০০০ পাউন্ড

র‍্যান্ডলে লেখেন, দিল্লিতে একটি লোহার দণ্ড ছিল এবং এর খ্যাতি ছিল দেশব্যাপী। এটা ছিল ১ হাজার ৫০০ বছরের পুরানো। অতএব, লৌহশিল্পে হিন্দুস্থানিদের অভিজ্ঞতা কত দিনের ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

উপরোক্ত সূত্রগুলো কেবল এ উদ্দেশ্যেই পেশ করা, যাতে এ অভিযোগটা ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হয় যে, হিন্দুস্থানিরা ছিল প্রাচীনকাল থেকেই কৃষকের জাতি। এর সঙ্গে এটাও প্রমাণ করা যে, ইংরেজদের আগমনের আগে এরা ছিল একটা শিল্পোন্নত জাতি; কিন্তু ইংরেজদের অভিশপ্ত পলিসি সেই উন্নত শিল্পকাঠামোকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিশ্বাস না হলে আরও কটা উদ্বৃতি দেখুন!

১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি তার ডাইরেক্টরদের এ মর্মে নির্দেশ দেয়, হিন্দুস্থানে রেশমের উৎপাদন বাড়ানো হোক। তবে দেশীয় তাঁতশিল্পে রেশমের জোগান বন্ধ করা হোক। আর কারিগরদের বাধ্য করা হোক তারা যেন কেবল কোম্পানির কারখানায়ই শ্রম বিক্রি করে।

১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ গণভবনে সিলেক্ট কমিটির একটা জরুরিসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত সদস্যরা ভারতের সার্বিক অবস্থার ওপর নিজেদের মতামত প্রকাশপূর্বক যে রেজুলেশন পাশ করে তা হলো, হিন্দুস্থানে এখন রেশমের চাষ বাড়ছে। সেখানকার রেশমশিল্পের সঙ্গে জড়িত লোকজনও এখন কোম্পানির কারখানায় শ্রম দিচ্ছে। এই সভা সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, এ ধারা অব্যাহত রাখা হোক। তবে হিন্দুস্থানিদের কেউ স্ব-উদ্যোগে এই শিল্পে বিনিয়োগ করলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

স্যার থমাস মরো ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেক্ট কমিটির উদ্দেশে ভাষণে কোম্পানির পলিসির প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, তারা জোলাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। এর প্রমাণ হলো, একদিন কোম্পানির কর্তারা একদল জোলাকে 'বারমহল' নামক একটি কক্ষে বন্দি করে ফেলে এবং যে পর্যন্ত-না তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য কোম্পানি ছাড়া অন্য কারও কাছে বিক্রি করবে না মর্মে ওয়াদা দেয়, ততক্ষণ তাদের সেখানেই আটকে রাখে। এরপরও তারা প্রতিটি জোলার পেছনে একজন করে দারোগা নিয়োগ করে রাখে। জোলারা এরপরও গোপনে কারও কাছে তাদের মাল বিক্রি করলে দারোগার পিয়ন তাদের কাছ থেকে দৈনিক ১ আনা করে জরিমানা আদায় করত। এ ছাড়া পিয়নদের হাতে থাকত একটা করে তীক্ষ্ণ বর্শা। ফলে জরিমানা আদায়ে তাদের কোনো বেগ পোহাতে হতো না।

১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে কক্স লেখেন, হিন্দুস্থানের জমিদারদের এ মর্মে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা যেন কোম্পানির অফিসারদের কাজে বাধা না দেয়। এদের সঙ্গে তাদের অবশ্যই সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে।

ব্যবসায়ী সমিতির ডায়েরিতে দেখা যায়, ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে গরিব জোলাদের অন্যান্য পেশার লোকদের তুলনায় অধিক অত্যাচার করা হচ্ছে। এদেরকে জরিমানা, জেল ও বেত্রাঘাত করা হচ্ছে। ফলে সেখানে জোলাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

এহেন জুলুমের মাধ্যমেই হিন্দুস্থানিদের তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তি ও শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। যেটুকু অনুমতি ছিল, তা শুধু তাদের কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে।.এ অভিশপ্ত কর্মপলিসি দ্বারা কৃষির দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া হয় এবং সেটাও তাদেরই স্বার্থে, যাতে তাদের শিল্পকারখানায় কাঁচামালের ঘাটতি না পড়ে।

এ ছাড়া ইংরেজরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিয়ন্ত্রণমূলক বাণিজ্যের প্রচারণা শুরু করে এবং এ ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত হিসেবে চালাতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। মানুষকে তাদের এ মতবাদে আকৃষ্ট করতে ব্যাপকভাবে লিফলেট বিলি করে। খবরের কাগজে বড় বড় প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপে। তারা বলে বেড়াতে থাকে—'দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে হলে বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আরোপ অপরিহার্য। নতুবা বহির্দেশি পণ্যের মোকাবিলায় দেশীয় শিল্প মার খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে।'

কিন্তু এ ছিল তাদের চিরাচরিত ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ। এ প্রচারণার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যাতে হিন্দুস্থানি পণ্য ইংল্যান্ডে ঢুকতে না পারে। কারণ, এতে ইংল্যান্ডের শিল্পের মার খাওয়ার আশঙ্কা ছিল প্রবল। সৎ উদ্দেশ্যে এ প্রচারণা চালানো হলে কিছুদিনের ব্যবধানে যখন হিন্দুস্থানের শিল্পকাঠামো ভেঙে পড়ে এবং ইংল্যান্ডের কারখানাসমূহে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হতে থাকে, তখন কেন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার পরিবর্তে খোলাবাজার অর্থনীতির কল্যাণ বর্ণনা শুরু হয়ে যায়? এতেই প্রমাণিত হয়, তাদের পূর্বসিদ্ধান্ত ছিল ষড়যন্ত্রমূলক। যেহেতু তারা নিজেরাই হচ্ছে বর্তমান ইকোনমিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারক, তাই হিন্দুস্থানসহ অধীন রাষ্ট্রসমূহের পণ্য তাদের বাজারে প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত হয়। হিন্দুস্থানের রপ্তানিখাত একেবারে ভেঙে পড়ে। আর মন্টগোমারির স্বীকৃতি অনুযায়ী যে অল্প-স্বল্প পণ্য তখনো রপ্তানি-তালিকায় টিকে রয়েছিল, সেগুলোর ওপর দ্বিগুণ-চতুর্গুণহারে শুল্ক চাপিয়ে এগুলোও বন্ধ করা হয়। প্রথম প্রথম শুল্কহার ১০% হলেও ধীরে ধীরে তা ২০%, ৩০%, ৫০% এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ১০০% পর্যন্ত নেওয়া হয়। অথচ ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত বস্তুর ওপর

শুল্কহার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই ৩.৫ শতাংশ বহাল থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়ায়—হিন্দুস্থানি উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। নিচের চিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন :

হিন্দুস্থানি পণ্য			
পণ্যের নাম	**শুল্কহার ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ**	**শুল্কহার ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ**	**শুল্কহার ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ**
২ রেশমি কাপড়	আমদানি নিষিদ্ধ	আমদানি নিষিদ্ধ	২০%
কিংখাব	আমদানি নিষিদ্ধ	আমদানি নিষিদ্ধ	৩০%
শাল ও চাদর	৭১%	৬৭.৫%	৩০%
ছিটকাপড়	৭১.৬৬%	৬৭.৫%	১০%
কার্পেট	৬৮.৩৩%	৫০%	২০%
জরিদার উত্তরীয়	৭১%	৫০%	৩০%
সুতি কাপড়	২৭.৩৩%	৫০%	২০%

অপর চিত্রটির প্রতিও লক্ষ করুন :

ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত			
বস্তুর নাম	**পরিমাণ**	**খ্রিষ্টাব্দ**	**মূল্য**
মলমল	৫ লাখ থান	১৭৮৫	১,২০,৫০,৪০০
মলমল	৫ লাখ থান	১৭৮৭	৩০,০০,০০০
মলমল	৫ লাখ থান	১৮১০	৮,০০,০০০
মলমল	৫ লাখ থান	১৮১৩	৩,৫০,০০০
মলমল	আমদানি নিষিদ্ধ	১৮১৭	

কিন্তু পাহাড়প্রমাণ করারোপ করেও যখন হিন্দুস্থানি পণ্যকে প্রতিহত করা যাচ্ছিল না; বরং হিন্দুস্থানি শিল্প দিন দিন ইংল্যান্ডের শিল্পকে কোণঠাসা করে ফেলছিল, তখন ব্রিটিশ সরকার বিকল্প ব্যবস্থাস্বরূপ আমদানিকারকদের শাস্তি দেওয়া শুরু করে। এরপর হিন্দুস্থানেও এই মর্মে আদেশ জারি করা হয় যে, 'যারা হিন্দুস্থানি ছিটকাপড় বিক্রি করবে তাদের ২০০ রুপি এবং ক্রেতাকে ৫০ রুপি করে জরিমানা গুণতে হবে।' এভাবে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের আইনে বলা হয়, 'হিন্দুস্থানি রেশমি কাপড় বিক্রেতাকে ৫০০ আর ক্রেতাকে ১০০ রুপি করে জরিমানা আদায় করতে হবে।'

১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে নিম্নোক্ত পণ্যসমূহের ওপর আরোপিত শুল্কের তালিকাটি একটু প্রত্যক্ষ করুন :

বস্তুর নাম	শুল্কহার	বস্তুর নাম	শুল্কহার
কার্পাসের কাপড়	৮১%	কার্পাস	প্রতি মন ১৫ রুপি
ছিটকাপড়	৮১%	শীতল পাটি	৮৪%
মিহি সুতোর কাপড় ও তৈরি বস্তু	৩২%	ভেড়ার পশমের জামা	৪১%

কিন্তু ঠিক এ সময়ে হিন্দুস্থানে আমদানিকৃত বিলেতি বস্তুর শুল্কহার ছিল মাত্র ২.৫ শতাংশ। ইরেজদের স্থূল চালাকির নমুনা দেখুন! যেসব বস্তুর প্রতি তাদের প্রয়োজন ছিল তীব্র, সেসবের ওপর আরোপিত শুল্কের হার ছিল নামমাত্র। যেমন : সবুজ রেশমে ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে শুল্কের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩ আনা, ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ৪ আনা এবং ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১ আনা।

ইংরেজদের এই বহুমুখী ষড়যন্ত্রের ফলে অন্যান্য দেশেও হিন্দুস্থানের পণ্য আমদানির হার শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। নকশাটি প্রত্যক্ষ করুন :

আমদানিকারক দেশ	আমদানিকৃত পণ্য	খ্রিষ্টাব্দ	পরিমাণ
ইংল্যান্ড	সুতি কাপড়	১৮০৩	১৪,৮১৭ গাঁটরি
আমেরিকা	সুতি কাপড়	১৮০১	১৩,৬৩৩ গাঁটরি
ডেনমার্ক	সুতি কাপড়	১৮০০	১,৪৫৭ গাঁটরি
পর্তুগাল	সুতি কাপড়	১৭৯৯	৯,৭১৪ গাঁটরি
আরব ও পারস্য	সুতি কাপড়	১৮১০	৬০০ গাঁটরি
ইংল্যান্ড	সুতি কাপড়	১৮২৯	৪৩৩ গাঁটরি
আমেরিকা	সুতি কাপড়	১৮২৯	২৫৮ গাঁটরি
ডেনমার্ক	সুতি কাপড়	১৮২০	১৫০ গাঁটরি
পর্তুগাল	সুতি কাপড়	১৮২৫	১০০ গাঁটরি
আরব ও পারস্য	সুতি কাপড়	১৮২৫	২০০ গাঁটরি

ফলাফল : হিন্দুস্থানের অর্থনীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং বিলেতের শিল্প ও প্রযুক্তি উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান নেয়। অথচ এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূল পুঁজি কিন্তু এখান থেকে চুরি করে, ধোঁকা দিয়ে, ঘুসের মাধ্যমে এবং জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া সম্পদ। এ ছাড়া এগুলোর কাঁচামাল এখান থেকেই সরবরাহকৃত। তা ছাড়া উৎপাদিত পণ্যের বাজারও ছিল এই হতভাগা হিন্দুস্থান। এভাবেই তারা কোটি কোটি টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে।

৫. বাণিজ্যিক লুটতরাজ

এতক্ষণের আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে, শিল্পব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তারা ব্যবসাবাণিজ্যকেও সংকুচিত করে ফেলেছিল। শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্য খতম হয়ে গেলে হিন্দুস্থানিদের হাতে কৃষিপণ্য আর শিল্পের কাঁচামাল ছাড়া কিছুই বাকি থাকেনি; কিন্তু এগুলোতেও ছিল তাদের কঠোর নজরদারি। ইতিপূর্বে প্রদত্ত চিত্রে দেখতে পেয়েছেন ইংরেজরা যখন যে বস্তু কিনতে চেয়েছে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করেছে ঠিক; কিন্তু এর উৎপাদনের ওপর নানামুখী করের হার একটুও কমায়নি। এ ছাড়া এমন কোনো পন্থা নেই, যা তারা এখানকার রপ্তানিমুখী বাজার ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করেনি। ফলে হিন্দুস্থানের পুঁজিতে গঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে হিন্দুস্থানেরই কাঁচামালে উৎপাদিত বস্তুতে যখন ইংল্যান্ডের বাজারগুলো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তারা এগুলো বাইরে রপ্তানির চিন্তাভাবনা করতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কিছুদিন যেতে না-যেতেই তারা খোলাবাজার অর্থনীতির বগলবাদ্য নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। অর্থাৎ, বলতে থাকে প্রত্যেক দেশেরই এ অধিকার থাকা চাই যে, সে তার উৎপাদিত পণ্য অন্য দেশের বাজারে প্রদর্শন করবে। সুতরাং রাতারাতি অতীত পলিসি পালটে যায় এবং দেয়ালে দেয়ালে খোলাবাজার অর্থনীতির মনোরম পোস্টার শোভা ছড়াতে থাকে। পত্রপত্রিকাগুলোও তাদের বোল ও ভোল পালটে এর মাহাত্ম্য বর্ণনা শুরু করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, সভা-সেমিনার করে এর উপকারিতা মানুষের মগজের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় চলতে থাকে। এভাবে ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে খোলাবাজার অর্থনীতির আইন পাশ করিয়ে নেওয়া হয়।

আর যায় কোথায়; এবার স্রোতের মতো বিলেতি পণ্যের আমদানিতে হিন্দুস্থানের বাজারগুলো সয়লাব হয়ে যায়। আর এসব আমদানির পেছনে শুল্কের হারও রাখা হয় নামমাত্র। যেহেতু ইতিমধ্যে হিন্দুস্থানের শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তাই শহর থেকে গ্রাম্য বাজার পর্যন্ত সবখানেই কেবল বিলেতি পণ্য নজরে আসে এবং হিন্দুস্থান নামক কলোনির অসহায় লোকগুলো উচ্চমূল্যে এগুলো কিনতে বাধ্য হয়। এভাবে ইংরেজরা দিনে দুইগুণ রাতে চারগুণ হারে লাভবান হতে থাকে। এতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় যে গুটিকতেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল, তারাও চিরদিনের মতো অজানা গন্তব্যে হারিয়ে যায় এবং নিখিল হিন্দুস্থানবাসী জীবিকার তাগিদে একমাত্র কৃষিকেই অবলম্বন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। নিচের নকশার প্রতি একটু দৃষ্টি দিন :

খ্রিষ্টাব্দ	কৃষিজীবীর হার	খ্রিষ্টাব্দ	কৃষিজীবীর হার
১৮৫০	৪০%	১৮৯০	৫০%

১৯১০	৬৬%	১৯১১	৭১%
১৯১৮	৬১%	১৯১৫	৭২%
১৯২২	৮০%		

কারখানা শ্রমিকদের মোট সংখ্যা

খ্রিষ্টাব্দ	সংখ্যা	খ্রিষ্টাব্দ	সংখ্যা
১৯০১	১৫,০৫,০০,০০০	১৯১১	১১,০১,০০,০০০
১৯২১	১০,০৩,০০,০০০	১৯৩১	৯,০৭,০০,০০০
১৯৪২	৩,১০,০০,০০০		

এহেন লুটতরাজের ফলে অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে। দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। মানুষ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মশা-মাছির মতো মারা যেতে থাকে। ইংরেজ শাসনামলে দ্রব্যমূল্য ইতিপূর্বের সকল রেকর্ডকে ম্লান করে দেয়। দেখুন :

শাসনকাল	পণ্য	মূল্য	পরিমাণ
আলাউদ্দিন খিলজি	গম	১ রুপি	১ মণ ২৯ সের
মুহাম্মাদ তুগলক	গম	৯ আনা	১ মণ ০৫ সের
ফিরোজ তুগলক	গম	৫.৫ আনা	১ মণ
ইবরাহিম লোদি	গম	১ রুপি	১০ মণ
সম্রাট আকবর	গম	৮ আনা	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	গম	১ রুপি	৪ মণ
আলাউদ্দিন খিলজি	চাল	১ রুপি	৪ মণ ১৯ সের
মুহাম্মাদ তুগলক	চাল	৯ আনা	১ মণ
মুহাম্মাদ তুগলকের দ্বিতীয় শাসনামল	চাল	১ রুপি	৩ মণ
সম্রাট আকবর	চাল	২ রুপি	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	চাল	১ রুপি	৩ মণ
আলমগির	চাল	১ রুপি	৭ মণ ১০ সের
আলাউদ্দিন খিলজি	ঘি	১ রুপি	৩৩ সের
ফিরোজ তুগলক	ঘি	২.৫ পয়সা	১ সের
ইবরাহিম লোদি	ঘি	১ রুপি	৫ সের
সম্রাট আকবর	ঘি	৩ রুপি	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	ঘি	১ রুপি	১ মণ ২৪ সের
আলাউদ্দিন খিলজি	চানা	১ রুপি	৪ মণ ১৯ সের
মুহাম্মাদ তুগলক	চানা	৩ আনা	১ মণ

ফিরোজ তুগলক	চানা	৩ আনা	১ মণ
সম্রাট আকবর	চানা	৫ আনা	১ মণ
আলাউদ্দিন খিলজি	চিনি	১ রুপি	১৫ সের
মুহাম্মাদ তুগলক	চিনি	৩ রুপি	১ মণ
ফিরোজ তুগলক	চিনি	৩.৫ পয়সা	১ মণ
সম্রাট আকবর	চিনি	৩ রুপি ১২ আনা	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	চিনি	১ রুপি	১৮ সের
আলাউদ্দিন খিলজি	লাল চিনি	১ রুপি	২৪ সের
সম্রাট আকবর	লাল চিনি	১ রুপি ১৪ আনা	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	লাল চিনি	১ রুপি	২ মণ ৩০ সের
আলাউদ্দিন খিলজি	সরিষার তেল	১ রুপি	৬৭ সের
সম্রাট আকবর	সরিষার তেল	২ রুপি ১১ আনা	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	সরিষার তেল	১ রুপি	৩ মণ
মুহাম্মাদ তুগলক	মিছরি	৩ রুপি ১২ আনা	১ মন
মুহাম্মাদ তুগলক	বড় ষাঁড়	২ রুপি	১ টা
মুহাম্মাদ তুগলক	বড় ছাগল	২ রুপি	১ টা
মুহাম্মাদ তুগলক	বড় মহিষ	২ রুপি	১ টা
মুহাম্মাদ তুগলক	মুরগি	২ পয়সা	১ টা
মুহাম্মাদ তুগলক	খাসির গোশত	২ পয়সা	১ সের
সম্রাট আকবর	খাসির গোশত	২ পয়সা	৪ সের
আলমগির	খাসির গোশত	২ পয়সা	৮ সের
মুহাম্মাদ তুগলক	গরুর গোশত	১ পয়সা	৩ সের
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	গরুর গোশত	১ পয়সা	৪ সের
আলমগির	গরুর গোশত	আধপয়সা	১ সের
মুহাম্মাদ তুগলক	শালিধান	৬ আনা	১ মণ
সম্রাট আকবর	শালিধান	১২ আনা	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	শালিধান	৫ আনা	১ মণ
আলমগির	শালিধান	২ আনা	১ মণ
মুহাম্মাদ তুগলক	উত্তম সুতিকাপড়	১ রুপি	৩০ গজ
ইবরাহিম লোদি	উত্তম সুতিকাপড়	১ রুপি	১০ গজ
সম্রাট আকবর	গুড়	১ রুপি ৭ আনা	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	গুড়	১ রুপি	১ মণ ৩০ সের
সম্রাট আকবর	যব	৬ আনা	১ মণ
সম্রাট আকবর	বাজরা	৫ আনা	১ মন

আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	বাজরা	১ রুপি	৩ মণ
সম্রাট আকবর	লবণ	৬ আনা	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	লবণ	১ রুপি	২ মণ ৩০ সের
আলমগির	লবণ	২ রুপি ৮ আনা	১ টন
সম্রাট আকবর	ময়দা	১৩ আনা	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	দুধ	১৫ আনা	১ মণ
আলমগির	মাখন	১ আনা	০.৫ সের
আলমগির	বড় মাছ	২ আনা	১০০ টা
আলমগির	বড় মাছ	৩ পয়সা	২০ পাউন্ড ওজন
সম্রাট আকবর	মুগ ডাল	৬ আনা	১ মণ
আকবরের দ্বিতীয় শাসনামল	মাষ কলাই	১ রুপি	৮ মণ

কিন্তু ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করামাত্রই প্রতিটি পণ্যের মূল্য লাগামহীন অশ্বের মতো ছুটতে থাকে। অতএব দেখুন :

খ্রিষ্টাব্দ ১৭৩৮	চাল	২ মণ ৩০ সের	১ রুপি	গম	২ মণ ২০ সের	১ রুপি	সরিষার তেল	১২ সের	১ রুপি
১৭৫০	চাল	২ মণ ১০ সের	১ রুপি	গম	২ মণ ১০ সের	১ রুপি	সরিষার তেল	১০ সের	১ রুপি
১৭৫৮	চাল	১ মণ ৩০ সের	১ রুপি	গম	১ মণ ৩৫ সের	১ রুপি	সরিষার তেল	৮.৫ সের	১ রুপি
১৭৮২	চাল	১ মণ ৫ সের	১ রুপি	গম	১ মণ ১৫ সের	১ রুপি	সরিষার তেল	৭ সের	১ রুপি
১৮২৫	চাল	৩০ সের	১ রুপি	গম	৩২ সের	১ রুপি	সরিষার তেল	৬ সের	১ রুপি
১৮৫৮	চাল	১৫ সের	১ রুপি	গম	১৮ সের	১ রুপি	সরিষার তেল	৫ সের	১ রুপি
১৮৮০	চাল	১২ সের	১ রুপি	গম	১১ সের	১ রুপি	সরিষার তেল	৪.৫ সের	১ রুপি

আরেকটি চিত্র দেখুন :

খ্রিষ্টাব্দ ১৮৫৮	চাল	৮ ১/২ সের	গম	৩৬ সের	চানা	৫১ ১/২ সের	ঘি	৪ সের	১ রুপি
১৮৯০	চাল	১২ সের	গম	২৫ সের	চানা	২৮ সের	ঘি দুধ	২ সের ৯ সের	১ রুপি
১৯২৮	চাল	৪ সের	গম	৮ সের	চানা ডাল	৯ সের ৪ সের	ঘি দুধ	৮ ছটাক ৪ সের	১ রুপি

আরেকটি চিত্র দেখুন, বুঝতে পারবেন কী ভয়াবহ গতিতে দ্রব্যমূল্য বাড়ছিল :

খ্রিষ্টাব্দ ১৮১৪	গম	৩৭	চাল	৩৭	সরিষার তেল	৫ ½ সের	১ রুপি
১৮২১	গম	৩৩	চাল	৩০	সরিষার তেল	৫ সের	১ রুপি
১৮৩৫	গম	২২	চাল	২৪	সরিষার তেল	৪ ½ সের	১ রুপি
১৮৭৫	গম	১৪	চাল	১৭	সরিষার তেল	২	১ রুপি
১৯২৫	গম		চাল	৪ ½ সের	সরিষার তেল	১ ¼ সের	১ রুপি

এবার অনুমান করলেন, কী রকেটগতিতে মূল্য বাড়ছিল! এর একমাত্র কারণ ছিল অবাধ লুণ্ঠন আর আইনের অজুহাত দেখিয়ে ব্রিটেনে পাচার। এগুলো তাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছিল; আর হিন্দুস্থানে তাদের শিল্পপণ্যের আমদানি ঘটিয়ে চলছিল। কেননা, হিন্দুস্থানই ছিল তাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতম বাজার। এখানে শিল্পব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি খতম হচ্ছিল, তত তাড়াতাড়ি তাদের ওখানে গজিয়ে উঠছিল। এবার বিলেতি কাপড়ের রপ্তানির হারটাও একটু দেখে নেওয়া চাই :

খ্রিষ্টাব্দ	রপ্তানির পরিমাণ	খ্রিষ্টাব্দ	রপ্তানির পরিমাণ
১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ	রপ্তানি নেই	১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ	৮ লাখ গজ
১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ	২ কোটি গজ	১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ	৫ কোটি গজ
১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ	৬১ কোটি গজ	১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ	১ বিলিয়ন ৫৬ কোটি গজ

এই বিশাল পরিমাণের কাপড় ছিল বিলেত থেকে হিন্দুস্থানে আসা, যা এখানকার মানুষকে বাধ্য হয়েই ব্যবহার করতে হয়েছে। এবার হিন্দুস্থান থেকে রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণটাও দেখে নেওয়া যাক :

১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ	১১ কোটি ৮ লাখ ৮৩ হাজার ৭১০ মণ
১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ	৩ কোটি ৫ লাখ মণ
১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ	৮৩ লাখ ৮০ হাজার টন
১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ	২৯ লাখ ১০ হাজার টন
১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ	৪৫ লাখ ১০ হাজার টন

উপরোল্লিখিত হিসাবটা ছিল গমের। চালের হিসাবটাও দেখে নেওয়া প্রয়োজন :

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ	প্রতি মিনিটে ১১৮ মণ
১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ	১ কোটি ৭৫ লাখ মণ
১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ	৪০ লাখ ৮৮ হাজার মণ
১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ	৫৬ কোটি ৫০ লাখ মণ

ফলাফল এখানকার মানুষ না খেয়ে মরতে থাকে। যারা আজন্ম দুর্ভিক্ষ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত ছিল না, তারা একের পর এক দুর্ভিক্ষের শিকার হতে থাকে। এসব দুর্ভিক্ষের শিকার লাখ লাখ মানবসন্তান পথেঘাটে লাশ হয়ে পড়ে থাকে। নিচে একটা চিত্র প্রদত্ত হলো :

খ্রিষ্টাব্দ	ইংল্যান্ডে	ভারতে	দুর্ভিক্ষের ব্যাপ্তি
১০০০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত	২০ দফা	২ দফা	শুধু দিল্লিতে
১১০০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত	১৫ দফা	১ দফা	দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে
১২০০ থেকে ১৩০০ পর্যন্ত	১৯ দফা	৩ দফা	স্থানীয়ভাবে
১৩০০ থেকে ১৪০০ পর্যন্ত	১৬ দফা	৩ দফা	স্থানীয়ভাবে
১৪০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত	৯ দফা	২ দফা	স্থানীয়ভাবে
১৫০০ থেকে ১৬০০ পর্যন্ত	১৫ দফা	৩ দফা	স্থানীয়ভাবে
১৬০০ থেকে ১৭০০ পর্যন্ত	৬ দফা	৬ দফা	স্থানীয়ভাবে

এবার পরিবর্তিত পরিস্থিতির খণ্ডচিত্রের ওপর একটু নজর দেওয়া যাক :

১৭০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭ দফা ইংল্যান্ডে, ১১ দফা পুরো ভারতবর্ষে।
১৮০০ থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১ দফা ইংল্যান্ডে, ৩১ দফা পুরো ভারতবর্ষে।

স্যার উইলিয়াম ডগবি এই ৩১টি দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতির যে পরিমাণটা স্বীকার করেছেন তা হচ্ছে :

শতাব্দীর প্রথম ভাগের দুর্ভিক্ষে	৫০ লাখ মানুষ মারা যায়।
শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের দুর্ভিক্ষে	১০ লাখ মানুষ মারা যায়।
শতাব্দীর তৃতীয় ভাগের দুর্ভিক্ষে	১ কোটি মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
শতাব্দীর শেষ ভাগের দুর্ভিক্ষে	২ কোটি ৬০ লাখ মানুষ ধ্বংস হয়।

মোটকথা, হিন্দুস্থানিরা না খেয়ে যে হারে মারা পড়ছিল, তার চেয়ে সহস্রগুণ হারে ইংরেজদের লোভ বেড়ে চলছিল। নির্মম ও নিষ্ঠুর ওই জাতি এ করুণ অবস্থাদৃষ্টেও লুটতরাজ থেকে বিরত থাকেনি। এবার আমরা প্রসঙ্গটার এখানেই ইতি টানছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্দোলনে বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ের নানামুখী প্রয়াস এবং বিপ্লব-প্রচেষ্টা

- বিশ্ববাসীর নৈতিক সমর্থন আদায়ের প্রয়াস
- বিপ্লব ছড়ানো ও বাস্তবায়নের চেষ্টা-সংগ্রাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্ববাসীর নৈতিক সমর্থন আদায়ের প্রয়াস

এক. বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ে মিশনারি প্রক্রিয়া

বিপ্লবের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্য নিয়েই পাঁচটি দেশকে টার্গেট বানিয়ে কাজ শুরু করা হয়। দেশগুলো হচ্ছে জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন ও বার্মা (মায়ানমার)। কাজ করা হচ্ছিল স্রেফ মিশনারি প্রক্রিয়ায়। বিশ্বসম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে আজকের দুনিয়ায় যেভাবে বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন আছে—যেমন : জাতিসংঘ, আরবলিগ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রভৃতি। তখনকার সময় অনুরূপ কোনো সংস্থা ছিল না। লিগ অব নেশন্স আর জাতিসংঘ পরে গঠিত হয়েছে। তখন বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ের জন্য দুটিমাত্র পথ খোলা ছিল। প্রথমটি হচ্ছে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মিশনারি প্রক্রিয়ায়। যেহেতু প্রথম প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হলে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন; আর হিন্দুস্থানিদের দখলে তখন রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল না, তাই কাজের জন্য বিপ্লবীদের সামনে দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করা ছাড়া কেনো বিকল্প ছিল না।

দুই. চীনা এবং বার্মিজ মিশন

মিশনটি পরিচালিত হয় মাওলানা মাকবুলুর রাহমান ও মাওলানা শওকত আলির নেতৃত্বে। মাওলানা মাকবুলুর রাহমান ছিলেন সীমান্তপ্রদেশের অধিবাসী। শিক্ষালাভ করেন দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে। শিক্ষা সমাপনের সঙ্গে সঙ্গেই শায়খুল হিন্দ রাহ.-এর এ বিপ্লবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ইংরেজি জানতেন না বিধায় মাওলানা শওকত আলিকে তাঁর সহকর্মী হিসেবে পাঠানো হয়। মাওলানা শওকত আলি ছিলেন বাংলার অধিবাসী। ইংরেজিতে বি.এ. ডিগ্রিধারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনা ভাষায়ও ছিলেন অভিজ্ঞ। ছিলেন একজন চরিত্রবান যুবক। তাঁর পরিবার

ছিল বাংলার অভিজাত পরিবারগুলোর অন্যতম। মাতৃভূমির স্বাধীনতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিপ্লবের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আমি[১১১] মাওলানার সাক্ষাৎলাভে ধন্য হই। এই সাক্ষাতে তাঁদের মিশনের কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হচ্ছিল, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি যা বলেন, এখানে হুবহু তা পত্রস্থ করা হচ্ছে,

> মাওলানা বলেন, আমাদের দলের সংখ্যা ছিল আটজন। চীনে পৌঁছে আমরা ধর্মীয় প্রচারণার মাধ্যমে কাজের মনস্থ করি। আমাদের দলের হিন্দু সদস্যরা প্রথমদিকে এর বিরোধিতা করছিলেন; কিন্তু কিছুদিন কাজের পর যখন সাফল্য দেখা দিতে শুরু করে, তখন তারাও এ ব্যাপারে ঐকমত্যে চলে আসেন। শুরুতেই আমরা 'সিরাত কমিটি' নামে একটা সংস্থা গঠন করে এর একটা অফিসের ব্যবস্থা করি। পরে একটা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে দেশব্যাপী এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিই। এভাবে প্রথমে সেখানকার মুসলিমদের মধ্যে এবং পরে ধীরে ধীরে স্থানীয় লোকদের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতার আবেগের সঙ্গে পরিচিতকরণ ও এর সমর্থক হিসেবে গঠনের প্রয়াস পাই। আমাদের মিশন যথেষ্ট সফলতা অর্জন করে চলছিল। সেখানে আমরা *আল-ইয়াকিন* নামে একটা মাসিক পত্রিকা বের করি। পত্রিকাটি উর্দু ও চীনা ভাষায় প্রকাশ পেত।
>
> চীনে আমরা ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করে যাই। পরে বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে বার্মা চলে আসি। বার্মায় আমরা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত কাজ অব্যাহত রাখি। যেহেতু চীনারা ছিল ব্রিটেনের প্রভাবমুক্ত আর বার্মিজরা ছিল ওদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাই এখানে চীনের মতো সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়নি। তথাপি আন্দোলনের সহায়ক ভূমিকা পালনে যেটুকু সফলতার প্রয়োজন ছিল, তা অর্জনে ব্যর্থ হইনি। বার্মায় এসে আমরা মিশনের কৌশল বদলে নিই। এখানে ধর্মীয় প্রচারণার তুলনায় জনসেবার দিককে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে থাকি।
>
> কৌশল পরিবর্তনের কারণটা ছিল—এখানে সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়া ছিল খুবই প্রকট। কারণ, এখানেও ব্রিটিশ সরকার 'যুদ্ধ বাধাও আর শাসন চালিয়ে যাও' কৌশল অবলম্বন করছিল। যদিও চীনে একনায়কতন্ত্র ছিল; এরপরও সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছিল না।
>
> বার্মায় আমরা চীনের কৌশল নিয়ে কাজ করতে থাকলে অবশ্যই আমরা সফল

[১১১] মাওলানা আবদুর রাহমান রাহ.।

হতে পারতাম না। অমুসলিমদের সহায়তা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠত না। মুসলিমরাও শতধাবিভক্ত থাকায় তাদের কোনো এক পক্ষ আমাদের প্রচারণায় সাড়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে ওদের প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে আমরা অন্যরকম হয়ে যেতাম। তারা আমাদের নিজেদের প্রতিপক্ষ ভাবত। সময়ে-সুযোগে আঘাত হানতে দ্বিধা করত না। এ জন্য এখানে আমরা 'মানবিক ভ্রাতৃত্ব' নামে একটা সংগঠন গড়ে তুলে মানবতার কল্যাণে কাজ চালিয়ে যেতে থাকি।

এ কথাটা নিতান্তই ভুল যে, আমরা সেখান থেকে *আল-ইনসান* নামে একটা পত্রিকা বের করেছিলাম। আসল কথা হলো, সেখানে আমরা কোনো পত্রিকা প্রকাশ করিনি; বরং আমি *আল-ইনসান* নামে একখানা গ্রন্থ লিখেছিলাম এবং মাওলানা শওকত আলি তা বার্মিজ ও ইংলিশ ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। মোটকথা, সেখানেও আমরা উদ্দেশ্যে সফল হই।

চীনে আমরা আটজন গিয়েছিলাম। সেখানে দৈনন্দিন খরচের টাকা জোগাড়ের জন্য একটা ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করি। তাতে আমি ইউনানি আর শওকত আলি এলোপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতাম। আমাদের আয় মোটামুটি ভালোই ছিল। খরচের জন্য কখনো টানাটানি করতে হয়নি। চীন থেকে চলে আসার সময় আমরা ক্লিনিকটি বিক্রি করে আসি। বিক্রয়লব্ধ এই টাকা দিয়েই আমাদের বার্মা সফরের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের মিশনের যে তিনজন সদস্য চীনে থেকে গিয়েছিলেন, তাদের হাতেও আমরা কিছু টাকাপয়সা দিয়ে আসি।

বার্মায় আমরা ছিলাম চারজন। তিনজনকে চীনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য রেখে এসেছিলাম আর একজন দেশে ফিরে যান। বার্মায় এসে খরচ চালাতে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করি। এতে খুব শান্তিতেই আমাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন আমাদের কাছে বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ পৌঁছায়, তখন শওকত আলি অন্যান্য সাথিকে নিয়ে দেশে চলে আসেন। পরে কদিন আত্মগোপন করে তিনি বার্লিন আর আমি রেঙ্গুনে চলে যাই। রেঙ্গুনে একটা দাতব্যালয় খুলে এর আয়ের ওপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকি। পরে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে হজ সেরে দেশে ফিরে আসি।

চীনা ও বর্মি মিশন সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা খোদ মাওলানা মাকবুলুর রাহমানের মুখ থেকে শোনা। *তালিমে হিন্দ* গ্রন্থে মাদানি রাহ. এ ব্যাপারে যে ইঙ্গিত করেছেন, তা একেবারেই সংক্ষিপ্ত।

তিন. জাপানি মিশন

মরহুম প্রফেসর বরকত উল্লাহর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটা দল জাপানে পাঠানো হয়। প্রফেসর সাহেব ছিলেন ভূপালের এক অফিসারের ছেলে। ইংরেজিতে এম.এ. ছাড়াও জাপানি, তুর্কি, জার্মানি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। আরবি জানতেন, তবে আরবির ওপর তেমন একটা দক্ষতা ছিল না। আমরা তাঁকে 'প্রফেসর সাহেব' সম্বোধনেই ডাকতাম। রুল্ট কমিটি তাঁকে 'মাওলানা' অভিধায় উল্লেখ করেছে; কিন্তু এটা ঠিক নয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মুক্ত বিহঙ্গের মতো মুক্তমনের অধিকারী। শিক্ষা সমাপনের পরপরই পিতা তাঁকে চাকরি নিতে চাপ দেন; কিন্তু তাঁর স্বাধীনচেতা মেজাজ চাকরি করাকে মানতে পারছিল না। তবে পিতার চাপে কিছুদিন ভূপালে টিউশনি করে জীবিকা অর্জন করেন। ওই সময় যখন তাঁর কানে বিপ্লবের আওয়াজ পৌঁছায়, তখনই তিনি সবকিছু পেছনে ফেলে চলে আসেন। এ সময় এক কৃষ্ণবর্মনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে তিনি বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত হয়ে ওঠেন। এরপর কেন্দ্রের নির্দেশে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে জাপান মিশনে যান। জাপানে গিয়ে টোকিওতে একটি কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব নেন এবং 'ইসলামিক ফ্রন্ট' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া একই নামে একটি পত্রিকাও বের করেন। পত্রিকাটি একইসঙ্গে জাপানি আর ইংরেজি ভাষায় বেরোচ্ছিল।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে কাজের পর কেন্দ্র তাঁকে ফরাসি মিশনের লোকদের সাহায্যে পাঠিয়ে দেয়। কারণ, কেন্দ্রের হাতে তাঁর মতো বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী কোনো লোক ছিল না। অথচ সেখানে তাঁর মতো একজন যোগ্য লোকের প্রয়োজন ছিল খুবই তীব্র। অতএব, কেন্দ্রের নির্দেশে প্রফেসর পদ থেকে ইস্তফা নিয়ে কাগজ বন্ধ করে সঙ্গীদের হাতে কাজের দায়ভার সমঝে দিয়ে ফ্রান্সে চলে যান।

রুল্ট কমিটি লেখে, যেহেতু মাওলানা বরকত উল্লাহ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক তীব্র মন্তব্য করতেন, তাই জাপান সরকার তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। অনুরূপ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাও বন্ধ করে দিয়ে তাঁকে দেশ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এ জন্যই তিনি জাপান থেকে ফ্রান্সে চলে যান।

কিন্তু রুল্ট কমিটির এ মন্তব্যটা ছিল আসমস্ত মিথ্যায় ভরপুর। আমি নিজে এ ব্যাপারে ফরাসি মিশনের প্রধান মাওলানা বরকত উল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এই রিপোর্টকে মিথ্যা আখ্যা দিয়েছেন। সত্য এটাই যা মাদানি রাহ. বলেছেন—যা এইমাত্র আমরা

বলে এলাম। রুল্ট কমিটির রিপোর্ট কোনোক্রমেই সত্য হতে পারে না। কেননা, জাপান সরকার ছিল ব্রিটিশের ঘোরতর শত্রু। এ জন্যই তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুযোগ পাওয়ামাত্র জাপান ব্রিটিশ স্বার্থে আঘাত হানতে একটুও দেরি করেনি।

অতএব, ব্রিটিশের বিদ্রোহী হওয়ার অভিযোগে জাপান সরকার তাঁকে তাড়াতে যাবে কেন? এটা রুল্ট কমিটির বানোয়াট রিপোর্ট ছাড়া কিছুই নয়।

চার. ফরাসি মিশন

এই মিশন পাঠানো হয়েছিল চৌধুরী রহমত উল্লাহর নেতৃত্বে। তাঁর সহযোগিতায় ছিলেন রামচন্দ্র নামের ইংরেজি শিক্ষিত এক যুবক। চৌধুরী সাহেব নিজেও ছিলেন বি.এ. ডিগ্রিধারী; কিন্তু এরপরও তাদের প্রফেসর বরকত উল্লাহর সাহায্য নিতে হয়। প্রফেসর বরকত উল্লাহ এখানে আসার পর বিদ্রোহী পার্টির পক্ষ থেকে *ইনকিলাব* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। দুই বছরে এখানকার কাজ পূর্ণতায় পৌঁছায়। এ মিশনে সদস্যসংখ্যা ছিলেন মাত্র তিনজন। প্রফেসর বরকত উল্লাহ ও তাঁর আরেক সাথি এসে পৌঁছালে তাঁদের সংখ্যা হয় পাঁচ।

পাঁচ. আমেরিকান মিশন

হরদয়াল বাবুর নেতৃত্বে আমেরিকায় ছয় সদস্যের একটি মিশন পাঠানো হয়। তাঁরাও খুব সুচারুরূপে কাজ চালিয়ে যান। কিছুদিন পর ফ্রান্স থেকে চৌধুরী রহমত উল্লাহ ও প্রফেসর বরকত উল্লাহও সেখানে চলে এলে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আট। চৌধুরী রহমত উল্লাহ ইতিপূর্বেও ফ্রান্স থেকে আমেরিকায় আসা-যাওয়া করতেন। তবে এতদিন তিনি প্যারিসেই স্থায়ী ছিলেন। এবারও তিনি আসা-যাওয়া অব্যাহত রাখেন। তবে এবার তাঁর স্থায়ী ঠিকানা হয় ওয়াশিংটন। আমেরিকান মিশনও এখানে 'বিদ্রোহী পার্টি' নামে একটা সংগঠন গড়ে তোলে। প্রফেসর বরকত উল্লাহ এখানে আসার পর এই নামে এখান থেকে একটি পত্রিকাও বের করা হয়। দৈনিক এ পত্রিকাটির মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান।

একবার পাঞ্জাবের এক গ্রামে আমাকে এক দীনি কাজে যেতে হয়। সেখানে বর্ষীয়ান এক বুজুর্গের পাশে আমাকে আরাম করতে দেওয়া হয়। আমি তাঁর কথাবার্তা, আচার-আচরণ আর ওঠা-বসায় দারুণভাবে প্রভাবিত হই। তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যেই আমাদের বুজুর্গদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলাম। যেমন : খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, তাহাজ্জুদ পড়া, চালচলনে গম্ভীরতা ইত্যাদি। গ্রামের প্রতিটি মানুষ এমনকি জমিদারও

তাঁকে খুব সমীহ করত। তিনি সকালে উঠেই ফজরের নামাজ পড়তেন, পরে চা পান করে মাওলানা স্বাধীনের মতো অনেকক্ষণ ধরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একপর্যায়ে আমি তাঁকে বলি, হুজুরের পরিচয়?

তিনি বিনীতভাবে বলেন, লোকেরা আমাকে রহমত উল্লাহ নামে ডেকে থাকে।

বলি, বায়আত হয়েছেন কার কাছে?

বলেন, নাম নিতে লজ্জা হচ্ছে। আমি তাঁর মুরিদ হওয়ার যোগ্য কোথায়? হ্যাঁ, তাঁর বদনামকারী বটে!

পুনরায় জিজ্ঞেস করলে বলেন, আমি মাহমুদ হাসানের বদনাম রটনাকারীদের একজন!

কথাটা শুনেই আমি চমকে ওঠি। আমার মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় জমাতে থাকে। তা হলে আমি কি সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তির কাছে বসে আছি, যাঁর নাম আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে?

এরপর আমার একের পর এক অস্থির প্রশ্নের জবাবে তিনি অবশেষে বলেন, 'হ্যাঁ, আমিই সেই হতভাগা রহমত উল্লাহ।' আমার বিদায়ের সময়টাও তখন একেবারে ঘনিয়ে এসেছিল। আমার অজ্ঞতার কারণে মূলবান অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল ভেবে আফসোসের অন্ত ছিল না। এরপরও আমি তাঁর কাছে আন্দোলনের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে চাই। তিনিও আমাকে নিরাশ না করে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবেই অজানা অনেক কাহিনি শোনান।

চৌধুরী সাহেব আমাকে বেশ কয়েকটা নতুন তথ্য দেন। এগুলো ইতিপূর্বে আমাদের কারও জানা ছিল না। এখানে তাঁর ভাষায়ই কথাগুলো তুলে ধরছি,

> ফ্রান্সে আমরা যে সংগঠন করেছিলাম, তার নাম অবশ্য 'বিদ্রোহী পার্টি' ছিল; কিন্তু ফ্রান্স থেকে আমরা যে পত্রিকা বের করেছিলাম, তার নাম ছিল ভিন্ন। রুল্ট কমিটিই মূলত এ নাম উল্লেখ করেছে। এবং *উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজির* লেখকও এ নাম উল্লেখ করেছেন। খুবসম্ভব লেখক তথ্যটা রুল্ট কমিটির রিপোর্ট থেকেই নিয়ে থাকবেন। আসলে *বিদ্রোহী* নামের পত্রিকাটি আমেরিকা থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল। ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম ছিল *ইনকিলাব*। আর এটাও সত্য যে, *ইনকিলাব* ও *গাদার* (বিদ্রোহী) উভয়টির সম্পাদক ছিলেন বরকত উল্লাহ।
>
> এরপর বলেন, আমরা দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য রঙের ব্যবসা করতাম। হিন্দুস্থানের বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই আমাদের কাছ থেকে রং

কিনতেন। তারা এখানকার ছোট ছোট রংব্যবসায়ীদের কাছেও তা সরবরাহ করতেন। যেমন : পেশোয়ারের দুজন মুসলিম একজন হিন্দু, লাহোরের দুজন মুসলিম পাঁচজন হিন্দু, দিল্লির চারজন মুসলিম তিনজন হিন্দু, বোম্বাইয়ের একজন মুসলিম চারজন হিন্দু, কলকাতার চারজন হিন্দু দুজন মুসলিম, করাচির একজন হিন্দু, ঢাকার একজন মুসলিম দুজন হিন্দু ছিলেন আমাদের নিয়মিত গ্রাহক। এদের মাধ্যমেই আমরা সময় সময় দিল্লি থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পেতাম। নতুবা ডাক মারফত তো এ কাজ মোটেও সম্ভব ছিল না।

চৌধুরী সাহেব বলেন, আমি নিজে জমিজমা বিক্রি করে যে টাকা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা দিয়ে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে হোটেলব্যবসা করছিলাম। এ হোটেলেরই একটা কামরায় ছিল আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস। অপর একটি কক্ষে ছিল পত্রিকার প্রকাশনা-দপ্তর। এ হোটেলই ছিল আমাদের বিদ্রোহী কার্যক্রম পরিচালনার মূল কেন্দ্র। ব্যবসা থেকেই আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতাম। আমার আসার আগে এটা হরদয়াল বাবু দেখাশোনা করতেন। প্যারিস থেকে চলে আসার পর তিনি এর দেখাশোনার ভার আমার ওপরই ন্যস্ত করেন।

এরপর যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তখন আমরা নিরাপত্তার অভাবে তা বিক্রি করে দিই এবং পত্রিকার প্রকাশনাও বন্ধ করি। পরে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে সফরের পাথেয় সংগ্রহ করে প্রথমে প্যারিস আসি। এরপর জেনেভা হয়ে বার্লিন এবং সেখান থেকে আফগানিস্তানে আমাদের সাথিদের কাছে এসে মিলিত হই। বিপ্লবের ব্যর্থতার ফলে হৃদয়ে যে আঘাত লেগেছিল, সাথিদের সংস্পর্শে এসে তা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই।

ছয়. যুদ্ধের মানচিত্র তৈরি, গুপ্তচরবৃত্তি, শত্রুর সেনাছাউনিতে সমর্থক সৃষ্টি

যেহেতু একটা সফল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য উপর্যুক্ত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন ছিল অপরিহার্য, এ জন্য 'ইনকিলাব'র রূপকারেরা প্রতিটি বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক লোক নিয়োগ করেন। প্রথমটির অপরিহার্যতা এ জন্য ছিল যে, বহির্শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে যুদ্ধের সঠিক মানচিত্র ছাড়া তাদের সে আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো উপায় থাকে না। যুদ্ধ শুরুর আগেই ডিফেন্স এবং আক্রমণভাগের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। সেনাদের কাছে রসদ সরবরাহ এবং সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য গোপন অথচ নির্ধারিত রুট থাকতে হয়। সেনাদের স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ রক্ষার পথও নির্ধারণ করে রাখতে হয়। আর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা, সেটা হলো আক্রমণকারী বাহিনী আর তাদের সাহায্যে সেনা ও অস্ত্র পাঠানোর পথটা নিরাপদ কি না, তা-ও পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। তা ছাড়া যুদ্ধরত সেনারা যাতে কখনো কেন্দ্রের কমান্ডের আওতার বাইরে ছিটকে না পড়ে, সে ব্যাপারটাও নিশ্চিত করতে হয়। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো যেখানে বিবেচিত ও পরিকল্পিত থাকবে, তাকেই যুদ্ধের পরিপূর্ণ মানচিত্র বলা যাবে। নতুবা ভৌগোলিক মানচিত্র যুদ্ধের জন্য সহায়ক কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।

বিপ্লবের নেতা এ ব্যাপারে মোটেও গাফিল ছিলেন না। এ কাজের জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিকেই চয়ন করেন। কাজটির জন্য তো তিনিই উপযুক্ত হতে পারেন, যিনি হবেন স্বভাবজাত লড়াকু ও বিপ্লবী মানসিকতার অধিকারী। এ জন্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকেই চয়ন করেন তিনি। তাঁকে সাহায্যের জন্য নিয়োগ করেন মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিমকে। শায়খ ছিলেন বোম্বাইর অধিবাসী উত্তম চরিত্রের এক যুবক। ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ.-এর পাশাপাশি অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রিধারী ছিলেন; কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ থাকায় এবং লড়াকু মেজাজের অধিকারী না হওয়ায় তিনি সফল হতে পারেননি। তবে মাওলানা সিন্ধি রাহ. লাগাতার সাত বছর কাজ চালিয়ে একাই কাজটিকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেন। তিনি বার বার সীমান্তপ্রদেশে আসা-যাওয়া করে সেখানকার রাস্তাঘাটগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যুদ্ধের পুরোপুরি একটা চিত্র এঁকে নেন। মাওলানা সিন্ধি নিজেই বলেন,

> আমি যখন বারকয়েক কাবুলে যাই, তখন আমার কাছে যে বিষয়টা প্রকট হয়ে দেখা দেয় সেটা হলো, আমাদের কাবুল প্রতিনিধিরা তুর্কি আর জার্মানি মিশনকে যুদ্ধের চিত্রটির ব্যাপারে আশ্বস্ত করাতে পারছেন না। এমনকি খোদ মহেন্দ্র প্রতাপ আর মাওলানা ইবরাহিমও তাদের আস্থায় নিয়ে আসতে ব্যর্থ হচ্ছেন। আমি প্রথম সাক্ষাতেই বুঝতে পারি আসলে আমাদের নকশার ওপর তারা আশ্বস্ত নন। ফলে আমাদের ওপর থেকে ক্রমশ তাদের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু এরপর মাত্র তিনটি সাক্ষাতে আমরা তাদের পুরোপুরি আস্থায় নিয়ে আসি। তারাও তখন অনেকটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।
>
> আমাদের কিন্তু আস্থা-বিশ্বাসে কোনো ঘাটতি ছিল না। আমাদের হাতে ছিল রণক্ষেত্রের পুরোপুরি সফল একটা চিত্র। যেহেতু কাবুলস্থ আমাদের প্রতিনিধিদলের কেউই সীমান্তপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন না, সীমান্তপ্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর রাস্তাঘাট সম্পর্কে তাদের তেমন কোনো ধারণাও ছিল না। তাই তাদের পক্ষে নকশাটির ব্যাখ্যা বুঝিয়ে তাদের আস্থায় আনা সম্ভব

হচ্ছিল না। কিন্তু আমরা বার বার আসা-যাওয়ার মাধ্যমে সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম; বিধায় আমাদের ব্যাখ্যা সমস্ত জটিলতাকে পরিষ্কার করে দেয়। আমরা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি রাস্তার সুযোগ-সুবিধা, যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিরক্ষা এবং আক্রমণব্যবস্থার পাশাপাশি ফৌজ ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করা, একে অন্যকে মদদ দান, রসদ পাঠানো, তথ্য-উপাত্ত আদানপ্রদান প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ই নকশায় চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করেছিলাম। ফলে আমাদের ব্যাখ্যার পর তারা সন্তুষ্ট না হয়ে পারেননি। আমাদের নকশা সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাঁচা হাতের কাজ ছিল না। কেননা, আমরা প্রাচীন সামরিক বিজ্ঞানসহ আধুনিক যুদ্ধরীতি সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম না। 'পিরুর উলুম' লাইব্রেরিতে অধ্যয়নকালে আমরা প্রাচীন যুদ্ধনীতি ও সমরশাস্ত্র সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাদি খুব অভিনিবেশে অধ্যয়ন করি। আর দিল্লি থাকাকালে শায়খুল হিন্দের নির্দেশে ইংরেজি, আরবি, তুর্কি, জার্মানি ও ফরাসি ভাষায় রচিত আধুনিক সমরশাস্ত্রের গ্রন্থাদি পাঠ করে এ ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করি। যদিও নতুন ও পুরাতন সমরশাস্ত্রে মৌলিক কোনো তফাত নেই, তথাপি যতক্ষণ-না প্রাচীন রীতিনীতিগুলোকে নতুন নিয়মাবলির সঙ্গে তুলনামূলক যাচাই করা হবে, ততক্ষণ পুরানো নিয়মনীতি কোনোই কাজে আসবে না।

আমাদের অধ্যয়নের সময় এ পার্থক্যটা প্রকট হয়ে দেখা দেয় যে, প্রাচীন গ্রিসের যুদ্ধনীতি আর আরবদের যুদ্ধনীতিতে রয়েছে বিস্তর তফাত। পক্ষান্তরে অন্যান্য অনারবির যুদ্ধনীতির সঙ্গে তাদের যুদ্ধনীতির তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কালদানি,[১১২] রোমান আর গ্রিকদের যুদ্ধনীতিও প্রায় কাছাকাছি। অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এ উপলব্ধিতে এসে পৌঁছাই যে, রোমান, কালদানি আর গ্রিকদের যুদ্ধনীতিকে আরবরা আধুনিক সমরশাস্ত্রের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। সোজাকথায়, প্রাচীন ও আধুনিক সমরশাস্ত্রের মধ্যে আরব সমরশাস্ত্র একটা যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছে। বাস্তব কথা হলো, আমরা আরব সমরশাস্ত্রের ধারণা না রাখলে আধুনিক সমরজ্ঞান আমাদের কোনোই কাজে আসত না। আরবি সমরজ্ঞান আমাদের আধুনিক সমরশাস্ত্র বুঝে উঠতে খুবই সহায়তা করেছে।

[১১২] **কালদানি** শব্দটি এসেছে প্রাচীন সভ্যতা কালদু থেকে। ইরাকের সাড়ে ৫ হাজার বছর আগের কালদু সভ্যতা এখনো ক্যালডিয়ান পূর্বদেশীয় ক্যাথলিক গির্জার মাধ্যমে টিকে আছে। যদিও অধিকাংশই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে।—*সম্পাদক*।

জার্মান ও তুর্কি অফিসাররা ছিলেন আরব যুদ্ধনীতি সম্পর্কে একেবারে অন্ধকারে; তারা কেবল আধুনিক সমরনীতি সম্পর্কেই জানতেন। ফলে আমাদের কাছ থেকে তারা আরব সমরজ্ঞানের তত্ত্ব পেয়ে চমৎকৃত হন এবং আমরা অনেক কিছু তাদের শেখাতেও সক্ষম হই। এভাবে দুয়েকটা সাক্ষাতের পর তারা উপযাচক হয়েই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ইত্যবসরে আমানুল্লাহ খানের শাসনামলে ব্রিটিশ ও আফগানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে আমরা নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে তাদের সাহায্যে যথাসাধ্য ভূমিকা রাখি। এতে আফগান সরকার আমাদের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এসব ব্যাপারেও আমি শায়খুল হিন্দের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ। আর এ কারণেই যখন আমাদের চোখের সামনে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রকাশ পায় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক নীতিমালা ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অভিযানসমূহ প্রদর্শিত হয়, তখন আমরা এতে কোনো নতুনত্ব খুঁজে পাইনি। একই কারণে আমির আমানুল্লাহ যুদ্ধ পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের পরামর্শগ্রহণকে অপরিহার্য মনে করতেন। আমরা আমাদের যুবক সাথিদেরও এই নীতিমালার প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখি। গুরুত্বপূর্ণ অনেক রণফ্রন্টে আমাদের যুবক সাথিরা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আফগান সরকারের ধন্যবাদ কুড়াতে সক্ষম হয়। আমাদের সাথি জুফর হাসান টিলার যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি নাদির শাহের সাহায্যার্থে কাজ করছিলেন। তিনি সেনাপতির বাহবা কুড়িয়েছিলেন। আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ আলি ছিল কান্দাহারযুদ্ধে ইতিমাদুদ্দৌলাহর সাহায্যকারী। এই যুদ্ধে সে এমন বীরত্ব দেখায়, যার ফলে ইতিমাদুদ্দৌলাহ আনন্দাপ্লুত হয়ে তাকে নিজ খিলাত[১১৩] দিয়ে ভূষিত করেন। দুটি যুদ্ধে আমাকেও আমানুল্লাহ খানের সাহায্যে যেতে হয়। এসব যুদ্ধে আমাদের নীতি অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করলে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই বিরাট বিজয় অর্জিত হয়।

অপর কাজটি ছিল শত্রুশিবিরে সিআইডি পাঠিয়ে তাদের পলিসি-পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এরা বাহ্যত সরকারি চাকরিজীবী হলেও আমাদের কাছে তাদের অভ্যন্তরীণ খবরাখবর সরবরাহ করবে। সুতরাং বিপ্লবের সংগঠকদের পরামর্শে বেশ কজন মুসলিম ও হিন্দু যুবককে আমরা সেনাবাহিনীর চাকরিতে ঢুকিয়ে দিই। এরাই পরে নিয়মিত আমাদের কাছে ওদের পরিকল্পনার খবরাখবর জানাত।

আফসোস! মাদানি রাহ. এখানেও খুব সংক্ষিপ্তভাবেই কথাটা বলে গেছেন। তিনি

[১১৩] ১০৫ রাজা কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানসূচক পরিচ্ছদ।

শুধু এটুকুই বলেছেন যে, 'ডক্টর আনসারির সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ অনেক খবর শায়খ রাহ.-এর কাছে এসে পৌঁছাত।' মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যায় না গিয়ে শুধু এটুকু বলেই আলোচনার ইতি টেনেছেন যে, 'যে-সকল যুবক আমাদের সঙ্গে ভালোবাসা রাখার তাগিদে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।' কিন্তু দেশমাতৃকার প্রিয় সেই জানবাজ লোকগুলো কারা ছিলেন, কেউই স্পষ্ট করে তাঁদের নাম উল্লেখ করেননি। কিংবা এটুকুও বলেননি যে, তাঁদের থেকে জালিম ইংরেজরা কাদের পাকড়াও করেছিল আর কাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। কারণ, বোধহয় এটাই হবে, ইংরেজদের শাসনামলে তাঁদের নাম উল্লেখের পরিবেশ ছিল না। অথবা যারা জানতেন স্বাধীনতা-উত্তর ডামাডোলে পরিস্থিতির কারণে তারা এটা বলার মতো সময় ও সুযোগ পাননি। কিংবা কালপরিক্রমায় অনেকে তা ভুলেও যান।

মোটকথা, বিপ্লবের আরও অনেক রহস্যাবলির সঙ্গে এটাও একটা রহস্য হয়েই থেকে গেছে। এভাবে একসময় বিপ্লবীদের সঙ্গে এ তথ্য-উপাত্তগুলোও দাফন হয়ে গেছে। তবে এটা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, এ কাজের নেতৃত্বে ছিলেন মরহুম ডক্টর আনসারি। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কাজটি সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছিল।

তৃতীয় কাজটি ছিল, বিপ্লবের কর্মীরা শত্রুশিবিরে যাবেন এবং বিপ্লবের নেতাদের কাছে সেখানকার খবরাখবর সরবরাহের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর লোকগুলোকে নিজেদের মানসিকতায় গড়ে তোলার প্রয়াস পাবেন। এ উদ্দেশ্যে বিপ্লবের পুরোধারা অধিকতর চৌকস কতিপয় যুবককে মনোনীত করেন। তাঁরা শত্রুর সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়ে ঢুকে পড়েন। বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁদের কেউ কেউ ধরা পড়েন। কেউ কেউ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে চাকরি থেকে অবসরে চলে আসেন। আবার কেউ কেউ নিজেদের মানসিকতাকে আড়াল করে সেখানেই থেকে যান। তাঁরা ঢিমেতালে কাজ করে যান। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাঁরাই অন্যদের নিজেদের দলে টেনে আনতে সক্ষম হন। পরে দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তাঁরাই আজাদ হিন্দের সেনাবাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করেন। এখানে এ বিষয়টা বিস্তারিতভাবে আলোচনার সুযোগ নেই বিধায় আমরা আর এগোচ্ছি না।

এখানেও মাওলানা মাদানি উবায়দুল্লাহ সিন্ধির মতো সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন। কেউই তাঁদের কাজের ব্যাখ্যা করতে যাননি।

একবার গম্ভীর প্রকৃতির প্রবীণ বিপ্লবী এক বুজুর্গের সঙ্গে অধীন লেখকের সাক্ষাৎ হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি এখনো জীবিত আছেন। এখনো তাঁর আবেগ-অনুভূতি আগের

মতো একেবারে তরতাজা। তিনি মাওলানা সিন্ধির মুরিদ। ইংরেজ সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন একটি কোম্পানিপ্রধান। বিপ্লবের ব্যাপারে তাঁর অগাধ জানাশোনা থাকলেও কেন জানি তিনি এগুলো প্রকাশ করতে উৎসাহী নন। তবে আমার পীড়াপীড়িতে যেটুকু বলেছেন তা হলো, আমার নেতৃত্বে পাঞ্জাবের ১৯ জন যুবকের একটা দল সেনাবাহিনীর চাকরিতে ভর্তি হয়। আমরা সিন্ধির নির্দেশেই ভর্তি হয়েছিলাম। সেনাবাহিনীর ভেতরে খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব আদায় করে যাচ্ছিলাম। এ সময় আমাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ, সেনাবাহিনীতে যুক্ত হওয়ার আগেই এ ব্যাপারে আমাদের ৮০ জনের একটা দলকে লাগাতার তিন মাস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিন মাস পর পরীক্ষা নিলে আমাদের ৮০ জনের মাত্র ১৯ জন পরীক্ষায় কৃতকার্য হই; বাকিরা ফেল করায় এ কাজে তাঁদের না পাঠিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

কোর্স সমাপ্তির পর দেওবন্দে শায়খুল হিন্দের কাছে গিয়েছিলাম। আমরা আলাদা কোনো অভিপ্রায় নিয়ে তাঁর কাছে যাইনি। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং দুআ নেওয়া। দুদিন তাঁর এখানে ছিলাম। আমাদের দলে ছয়জন ছিলাম মুসলমান, তিনজন শিখ আর বাদবাকিরা ছিলেন হিন্দু। আমাদের খাদ্য একই পাত্রে পাক হতো। আমরা শূকর আর বলিদানকৃত গোশত খেতাম না; তবে আমাদের হিন্দু সাথিরা গরুর গোশত খেতেন। এ উদারপ্রাণ হিন্দু ভাইয়েরা ছিলেন জাতপাতের অনেক ঊর্ধ্বে। তাদের ও আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক।

দেওবন্দে দুজন বাবুর্চি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করত। আমরা শায়খুল হিন্দের বাসার পাশে 'মেহমানে দারুল উলুম' ফলকযুক্ত মেহমানখানায় উঠি। তখন সেখানে আরও কজন মেহমান ছিলেন। আমরা খেতে বসলে শায়খ আমাদের পাশে ঘোরাফেরা করে খানার তদারকি করতেন।

এটা নিতান্তই ভুল ধারণা যে, মাওলানা মুহাম্মাদ আলি ও মাওলানা সিন্ধি দেওবন্দে আমাদের পরীক্ষা নেন। বাস্তবতা হচ্ছে, সিন্ধি, পণ্ডিত লুই আর মথুরা সিং প্রমুখ পাঞ্জাবে আমাদের পরীক্ষা নেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই আমরা দেওবন্দে এসেছিলাম। এ কথাও ভুল যে, শায়খ আমাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। পরামর্শ যা দেওয়ার, তা আমাদের পূর্বোক্ত পরীক্ষকরাই দেন।

দেওবন্দ থেকে আমরা দিল্লি চলে আসি। এখানে গান্ধিজি, পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ আলি জওহর, ডক্টর আনসারি প্রমুখের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। দিল্লিতে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী রামকৃষ্ণ নামের

এক তাজাপ্রাণ যুবকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। আলাপ-আলোচনায় জানতে পারি, সে-ও চিটাগাং থেকে অনুরূপ একটা কোর্স সমাপ্ত করে এসেছে। এরপর যখন আমরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হই, তখন একবার বার্মায় তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। এ সময় তার ব্যাটালিয়ন বার্মা থেকে করাচি ফিরে আসছিল। ইতিপূর্বেই আমাদের বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়। সাক্ষাতে সেই স্মৃতি আমাদের অন্তরে কাঁটার মতো খোঁচা দিচ্ছিল। আমরা নীরবে অশ্রু মুছে একে অপরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাই। এরপর তার সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি।

মোটকথা, দিল্লি থেকে ফিরে এসে আমরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাই। আমাদের সাফল্য ছিল—আমরা ফৌজের এক বিরাটসংখ্যক যুবকের অন্তরে দেশপ্রেমের আগুন জাগিয়ে দিতে পারি। তা ছাড়া হাজি তুরঙ্গজাই সীমান্তপ্রদেশে ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে আমরা ইংরেজদের গোপন অনেক অভিসন্ধি তাদের জানিয়ে দিতে সক্ষম হই। এতে তারা বিরাট লাভবান হন; কিন্তু কিছুদিন পর সেখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে এলে তারা তথ্যের অভাবে অনেক বিপর্যয়ের শিকার হন। যুদ্ধ শেষে আমরা অনেক কষ্ট করেই সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসি।'

সারসংক্ষেপ হলো, উপরোক্ত পরিকল্পনাত্রয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের বাস্তবতা ও সফলতার খোঁজখবর নেওয়া। আমাদের আকাবিররা সবকটি পরিকল্পনাই অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে আনজাম দেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপ্লব ছড়ানো ও বাস্তবায়নের চেষ্টা-সংগ্রাম

এক. বিকল্প সরকারের সংক্ষিপ্ত চিত্র

আমাদের পঞ্চম অভিপ্রায় ছিল বিকল্প সরকারের সংক্ষিপ্ত নকশা তৈরি করা। অর্থাৎ, বিকল্প সরকারের পদবণ্টন। যেকোনো বিপ্লবের জন্য আগে থেকেই এমন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রাখা অপরিহার্য। নতুবা প্রতিটি বিপ্লবীর অন্তরে তাকে অবমূল্যায়নের আশঙ্কা থেকে যাবে। মনে করবে সাথি তার আত্মত্যাগকে আত্মসাৎ করছে। এতে কাজে ত্রুটি আসা এবং মাঝপথে বিপ্লবের শক্তি নেতিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে প্রবল। এমনকি এর অভাবে প্রতিবিপ্লবও দেখা দিতে পারে। বিপ্লবীরা মূল প্রতিপক্ষকে ছেড়ে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবুর চেষ্টায় লেগে যেতে পারে। এভাবে একসময় সারাটা পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ শত্রুপক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুনিয়া থেকে নিজ সাথিদের মিটিয়ে ফেলার ধান্দায় লেগে যাচ্ছে। যদি এমন পরিস্থিতি না-ও দাঁড়ায়, তথাপি বিপ্লবের সফলতার প্রশ্নে ভিন্নমত সৃষ্টি হয়ে যায়। বিপ্লবের পরমুহূর্তেই এমনটি ঘটলে ক্ষমতাগ্রহণের আগেই বিপ্লবীদের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তরীটা সফলতার ঘাটে পৌঁছেও শেষপর্যন্ত ডুবে যায়। হিন্দুস্থানের অন্যান্য বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এমনটি পরিলক্ষিত হয়েছে। দেখা গেছে, বিপ্লব সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়ার পরও বিপ্লবীদের মতপার্থক্যকে পুঁজি করে শত্রুরা তা ভন্ডুল করে দিতে সমর্থ হয়েছে।

আলোচিত বিপ্লবের নেতাদের অনুভূতিতে ইতিপূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা পুরোপুরিভাবেই ছিল। এ জন্যই তাঁরা এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করছিলেন। এ সময় এ ধরনের পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রাখার প্রয়োজনও ছিল অপরিসীম। কেননা, ইতিপূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় এ সময় হিন্দু-মুসলিম বিরোধটা ছিল তুঙ্গে। এমতাবস্থায় এমন ব্যবস্থা না নিলে খুবসম্ভব শুরুতেই আন্দোলনটা মার খেয়ে যেত। ক্ষয়ক্ষতিও হতো কয়েকগুণ বেশি।

আপনারা হয়তো উবায়দুল্লাহ সিন্ধির ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে মহেন্দ্র প্রতাপ প্রমুখের ভিন্ন মানসিকতার কথা জেনে থাকবেন। এত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হওয়ার পরও যদি এমনটি হতে পারে, তখন আগে থেকেই ব্যবস্থা না নিলে কী যে অবস্থা হতো, তা সহজেই অনুমেয়। আজ যদিও বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, তথাপি কেউ অন্তত এ কথাটা বলে বিপ্লবীদের লজ্জা দিতে পারবে না যে, তোমাদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কারণেই বিপ্লবটা সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও ব্যর্থতার খাদে পড়ে গড়াগড়ি খেল। সে যা-ই হোক। বিপ্লবোত্তর সরকারের নকশাটা ছিল নিম্নরূপ,

> সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হবে। এতে একজন থাকবেন মুসলমান, দুজন থাকবেন হিন্দু। মুসলিম সদস্যের নাম ছিল শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি; কিন্তু হিন্দু সদস্যদের নাম জানা যায়নি। সিআইডির নথিপত্র ঘেঁটে শুধু গান্ধিজির নাম পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে একজন থাকবেন রাষ্ট্রপ্রধান (মহেন্দ্র প্রতাপ), একজন হবেন প্রধানমন্ত্রী (মাওলানা বরকত উল্লাহ); আর একজন থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি)। বাকি পুরো ক্যাবিনেট থাকবে এ তিনজনের অধীনে।

এ ছাড়া সামরিক বিভাগের পদবণ্টন ছিল নিম্নরূপ,

> একজন থাকবেন সর্বাধিনায়ক (মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি)। তাঁর অধীনে থাকবেন ১২ জন জেনারেল। এ ছাড়া অন্যান্য মেজর জেনারেল ও কর্নেলের পদবিন্যাসের দায়দায়িত্ব থাকবে তাঁদের হাতে। এগুলোর পুরো বিবরণ সিআইডির গোপন নথিপত্র এবং রুল্ট কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

দুই. দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের ঘাঁটি স্থাপন

ষষ্ঠ অভিপ্রায় ছিল দেশের সর্বত্রে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ইংরেজদের বিচলিত করে তোলা। তাদের দৃষ্টি সীমান্তপ্রদেশ থেকে সরিয়ে দেশের অভ্যন্তরে আটকে রাখা। এ অভিপ্রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় :

১. স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ।

২. জনসাধারণের মনে বিপ্লবের আবেগ সৃষ্টি।

৩. বিবেকমান মানুষগুলোকে অবস্থা সামাল দিতে প্রস্তুত করে রাখা।

এ উদ্দেশ্যে দিল্লিতে একটি হেডকোয়ার্টার এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ হলো,

হেডকোয়ার্টার ছিল দিল্লিতে। সেখানে শায়খুল হিন্দ, মাওলানা মুহাম্মাদ আলি, মাওলানা শওকত আলি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা সিন্ধি, গান্ধি, ডক্টর আনসারি, পন্ডিত মোতিলাল, লালা রাজপুত রায়, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ কাজ করতেন। তাঁদেরই ইঙ্গিত-ইশারায় দেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি বিদ্রোহ হতো। আর ব্রাঞ্চগুলো ছিল :

১. **রান্দ্রি :** এটা ছিল বোম্বাই, গুজরাট এবং সুরাটের বিদ্রোহকেন্দ্র। এখানে মাওলানা ইবরাহিম কে.বি. আহমাদ ও প্রণব প্যাটেল প্রমুখ কাজ করতেন।

২. **পানিপথ :** এখানে মাওলানা আহমাদ উল্লাহর কমান্ডে উত্তর-প্রদেশের প্রতিটি জেলায় কাজ হচ্ছিল। মাওলানাই ছিলেন এখানকার আমির। বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি ইংরেজদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে মুক্তি পান।

৩. **লাহোর :** এটি ছিল পাঞ্জাব এলাকার কেন্দ্র। এখানে মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ চাকওয়ালি এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আলিরা কাজ করছিলেন। শেষোক্তজন ছিলেন এখানকার আমির। তিনিও শেষপর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পান।

৪. **দীনপুর :** এটা ছিল ভাওয়ালপুরের কেন্দ্র। এখানকার আমির ছিলেন মাওলানা আবু সিরাজ গোলাম মুহাম্মাদ সাজাদানশিন। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেননি; ফলে তিন মাস কারাবরণের পর মুক্ত হন।

৫. **আমরুট :** এটা ছিল সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে বিদ্রোহের ঘাঁটি। এখানকার আমির ছিলেন মাওলানা তাজ মাহমুদ সাজাদানশিন। ক্ষমাপ্রার্থনা না করায় তাঁকে চার বছর জেলের ঘানি টানতে হয়।

৬. **করাচি :** এটি ছিল করাচি শহর, কিলাত ও ল্যাসবেলি এলাকাসমূহের মূল ঘাঁটি। মাওলানা মুহাম্মাদ সাদিক ছিলেন এখানকার আমির। তিনি ল্যাসবেলিতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ইংরেজদের প্রচুর ক্ষতি করেন। পরবর্তীকালে গ্রেপ্তার হলে এক বছর কারাভোগ এবং তিন বছর নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেন; কিন্তু এরপরও তিনি ইংরেজদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেননি।

৭. **আতমানজায়ি :** এ ছিল উত্তর সীমান্তে বিদ্রোহের কেন্দ্রভূমি। আমির ছিলেন আবদুর গফফার খান। তিনিও প্রচুর কাজ করেন। এরপর গ্রেপ্তার হয়ে কয়েক বছর জেল খাটেন।

৮. **তুরঙ্গজায়ি :** এটা ছিল স্বাধীন গোত্রগুলোর কেন্দ্র। প্রখ্যাত পির মাওলানা ফাজলে ওয়াহিদ ছিলেন এখানকার আমির। সুদীর্ঘ চার বছর তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। শেষাবধিও তিনি অনমনীয় ছিলেন।

মাদানি রাহ. শুধু এই আটটি কেন্দ্রের কথাই বলেছেন; কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তিনি বাংলা কিংবা আসামে অনুরূপ কোনো কেন্দ্র ছিল কি না, সে ব্যাপারে উল্লেখ করেননি। অথচ সেখানে শায়খুল হিন্দের অসংখ্য ছাত্র ছিলেন এবং আন্দোলনের কাজে তাঁরাই ছিলেন সবার অগ্রগামী। শুধু তা-ই নয়; বাংলার নেতারা তাঁদের ওখানে কাজের পাশাপাশি বাইরে গিয়েও অন্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তা ছাড়া তাঁদের ওখান থেকে হেডকোয়ার্টারে বড় রকমের আর্থিক অনুদান আসত। কিন্তু এরপরও মাদানির এ ব্যাপারে কিছু না বলার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা কারণ এটা হতে পারে—সেখানকার কেন্দ্রের কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে তাঁর জানা ছিল না।

অনুরূপ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশেরও কোনো উল্লেখ করেননি। অথচ বিপ্লবে তাঁরাও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। বাংলার কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে জানতে আমি নিজেও অনেক চেষ্টা করেছি; কিন্তু শত চেষ্টার পরও বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি। আমি সুরাটের ডাবেল মাদরাসায় অধ্যাপনাকালে ঢাকার এক ছাত্র আমার কাছে *জালালাইন* কিতাবের শেষাংশ পড়ত। তার মেধা ছিল বিস্ময়কর প্রখর। যুবক বয়সে তার চেহারায় তাকওয়া ও পরহেজগারির যে দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছিল, তার ওপর যেকোনো বুজুর্গ ঈর্ষা করতে পারেন। বছরের শেষদিকে সে আমার সঙ্গে দেওবন্দ আসছিল। রাস্তায় কথাবার্তার একপর্যায়ে সে জানায়; দেওবন্দ পৌঁছাতে পারলে আমার আর কোনো অসুবিধা থাকবে না। কেননা, মাওলানা মাদানি আমার আব্বার বন্ধু। আমার আব্বা দুনিয়াতে নেই। তাঁর কথা বললে নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারবেন। আব্বা ছিলেন শায়খুল হিন্দের মুরিদ ও খলিফা। তা ছাড়া তিনি ছিলেন 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' ঢাকা শাখার আমির।

আমি তখনই তার থেকে অনেক কিছু জানতে চাই; কিন্তু সে যা বলে যায় এর মধ্যে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য ছিল না। কারণ, আন্দোলন চলাকালে তার জন্মই হয়নি। আর পিতার মুখ থেকে যা-ও জানতে পেরেছে, তা-ও একেবারে ছোট বয়সে শোনা কথা। কথাগুলোও ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত, যা কোনোভাবেই ইতিহাসের তথ্য হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে না। আমি তাকে বললাম, দেওবন্দে ভর্তি হওয়ার পর তুমি যখন বাড়ি যাবে, তখন তোমার আব্বার রেখে যাওয়া নোট কিংবা চিঠিপত্র-জাতীয় কিছু পেলে নিয়ে আসবে। আমার এসবের খুবই প্রয়োজন।

বেশ কদিন পর সে আমার কাছে ছয়টি চিঠি এনে দেয়। তবে এগুলো ছিল তার আব্বার হাতে লেখা ব্যক্তিগত চিঠি—বিপ্লবের কোনো উপাত্ত ছিল না। তাই সেগুলো আমার কোনো কাজে আসেনি। তবে এটুকু জানতে পারি যে, ওই বিপ্লবীর নাম ছিল মাওলানা রিয়াজ আহমাদ। তিনি ছিলেন শায়খুল হিন্দের মুরিদ ও খলিফা। শায়খ তাঁকে অত্যন্ত

শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং তাঁর ওপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেন। এগুলো যথাযথভাবে আদায়ের ওপর তাগিদও ছিল। তবে ওই ছাত্র কাজের যে জিনিসটি আমার কাছে পৌঁছে দেয় সেটা হচ্ছে, হজরতের ব্যক্তিগত একটা নোট, যা *হুজ্জাতুল্লাহ কিতাবের* পাতায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লেখা ছিল। সেই নোটগুলো পাঠে জানতে পারি বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি জেলে নীত হন। জেলজীবনে বইখানা তার কাছেই ছিল। একজায়গায় জেলে যাওয়ার এবং জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার তারিখটাও দেখতে পাই। আরেক জায়গায় পরিষ্কার আরবি ভাষায় নিচের কথাও পাই,

> ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ তারিখটা স্মরণ রাখবেন। এই তারিখে আমি নিখোঁজ অথবা অন্য কিছু ঘটে গেলে আমার জীবনের আশা ছেড়ে দেবেন। তখন আমার স্ত্রীর জন্য অন্যত্র বিয়ে করার অধিকার থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার সম্পদের এক-অষ্টমাংশ বিক্রি করে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবেন। আমার মেয়েকে সম্পদের অর্ধেক অংশ দেবেন। আম্মাকে দেবেন এক-ষষ্ঠাংশ। মোট সম্পদের ছয়ের এক আমার আম্মার প্রাপ্য। এ ছাড়া বাকি সম্পদের অধিকারী হবেন আমার চাচাজান। আমার মালিকানায় একটা পাকা বাড়ি, কৃষি-উপযোগী ৮০ একর জমি, ১৫ তোলা ওজনের স্বর্ণালংকার, মেয়েলি পোশাক ছাড়া জামা-কাপড় ও গার্হস্থ প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে। এই ১৫ তোলা সোনা ছাড়া যে ৫ তোলা সোনা রয়েছে, তা আমার স্ত্রীর মোহরের অংশ। এগুলোর মালিকানা তার নিজের। আমি জীবিত ফিরে এলেও মনে করবে, আমার এ লেখার ভিত্তিতে তালাকে মুআল্লাকের[১১৪] হুকুম বর্তাবে। অন্যথায় তিনি বিধবা হিসেবেই গণ্য হবেন। জনসাধারণের প্রতি আমার কথা হলো, এ তারিখে আমিরের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবেন। কোনো নির্দেশ না পেয়ে নিজেদের ফ্যাসাদ-হাঙ্গামায় জড়াবেন না। কেননা, আল্লাহ তাআলা ফ্যাসাদ পছন্দ করেন না। আমিরের নির্দেশ পাওয়ার পর সর্বোচ্চ ত্যাগ প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হবেন না।

উপর্যুক্ত নোট পাঠে এ সিদ্ধান্তে নিশ্চিতভাবেই পৌঁছা যায় যে, তিনি ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রের আমির এবং এটা ছিল তাঁর অসিয়তনামা। নোটে উল্লিখিত তারিখটা ছিল 'রেশমি রুমাল আন্দোলন'র তারিখ। তিনি মূল কেন্দ্র থেকেই ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে শুরুর দিকে এ তারিখটা জানতে পেরেছিলেন। যেমন খানিক পর আপনারা জানতে পারবেন যে, রেশমি রুমাল আন্দোলন এবং বহিরাক্রমণের প্রথম তারিখটা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি। এই নোট এ কথারও সাক্ষ্য দেয় যে, তারিখটা নির্ধারিত হয়েছিল দিল্লির মূল কেন্দ্র থেকে এবং সেটা হয়েছিল শায়খুল হিন্দের হজের সফরের আগে তাঁরই

[১১৪] ঝুলন্ত তালাক।

উপস্থিতিতে। এরপর সঙ্গে সঙ্গেই তারিখটা প্রতিটি কেন্দ্রে জানিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করতেও বলা হয়।

এটা ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তাঁরা সব কাজ গুটিয়ে এনে পুনরায় সব ব্রাঞ্চকে জানিয়ে একযোগে আক্রমণ পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া এ জন্যও যে, কেন্দ্র হয়তো প্রস্তুতির অভাবে তারিখটা পিছিয়ে দিয়েছে; আর এদিকে কোনো ব্রাঞ্চ আক্রমণ করে সফল হওয়ার পরিবর্তে দীর্ঘদিনের সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভন্ডুল করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় এমন সতর্কতার প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। কেননা, আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায়, সত্যিই কেন্দ্রকে আক্রমণের তারিখটা আরও কদিন পিছিয়ে দিতে হয়। এ সতর্কতা অবলম্বন করা না হলে মাওলানা রিয়াজ আহমাদের কথামতো সত্যিই এক মহা ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। আল্লাহু আকবার! কী সুন্দর পরিকল্পনা।

উত্তরের পাহাড়ি গোত্রগুলোও বিপ্লবে অংশ নেয়। তাঁদের কেন্দ্র ছিল হাজারা জেলার উগি নামক স্থানে। মূল আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেলে তারা নিজেদের থেকেই জিহাদ শুরু করে। তাঁদের সেই মারমুখো আক্রমণে ইংরেজবাহিনীকে প্রচুর ক্ষতির শিকার হতে হয়। আমাদের হাজারা জেলার অনেক যুবকও এ যুদ্ধে অংশ নেয়। তাঁদের অনেকে এখনো জীবিত আছে। আমি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই সাক্ষাতের চেষ্টা করেছি। তাঁরা অনেকে আমাকে অজানা অনেক তথ্যও দিয়েছে। তবে আমার এক আলিম বন্ধুর কাছ থেকে আমি এই যুদ্ধের বিস্তারিত জানতে পেরেছি। যদিও তাঁর ও আমার বয়সের মধ্যে ছিল প্রচুর তফাত; তথাপি তিনি ছিলেন আমার সহপাঠী। তিনি অনেক বড় হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। ক্লাসে ছিলেন আমার বেশ নিচে। সময় সময় তিনি আমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য নিতেন। তাই তাঁর ও আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এক প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তিনি নিজেও ছিলেন নন্দহার এলাকার বাসিন্দা। তিনি জানান,

> তাঁদের বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল আগরুরে। এই কেন্দ্রের অধীনে সিয়াকুহ, নন্দহার, কুহিস্তানে সগির-কবিরসহ দেশাঁই গোত্রসমূহ যুদ্ধে অংশ নেয়। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা যে, এই কেন্দ্রের আমির ছিলেন মাওলানা মুহম্মাদ ইসহাক জানহারবি রাহ.। আসলে তিনি দিল্লির কেন্দ্র থেকে নির্দেশনালাভের মাধ্যম ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব কেবল এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবতা হলো, এই কেন্দ্রের নেতৃত্ব ছিল তিন সদস্যের এক আলিম কমিটির ওপর। মাওলানাও ছিলেন এই তিনজনের একজন। তাঁরা শুরুতে দিল্লির কেন্দ্রের নির্দেশনার অপেক্ষায় ছিলেন; কিন্তু যথাসময় কেন্দ্র থেকে কোনো সংবাদ এসে না পৌঁছালে এবং কেন্দ্রের নেতারা গ্রেপ্তার হচ্ছেন মর্মে সংবাদ জানতে পারলে নিজেদের উদ্যোগেই তাঁরা

যুদ্ধের ডাক দিয়ে দেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, মাওলানা ইসহাক বাহ্যত জিহাদে অংশ নেবেন না, তবে তিনি ব্রিটিশশাসিত এলাকাসমূহ থেকে অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবী পাঠাবেন। সরাসরি আক্রমণে আসবে আজাদ গোত্রগুলো। এভাবেই তাঁদের জিহাদ এগোতে থাকে। দেখা যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুবকরা এসে জিহাদে অংশ নিচ্ছে এবং অর্থসাহায্যও এসে পৌঁছাচ্ছে।

এ যুদ্ধে অস্ত্র জোগান দেওয়ার দিক দিয়ে মাহমুদ শাহ দুগির ভূমিকা কোনোক্রমেই ভুলে যাওয়ার নয়। তিনি দুগির দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল দিয়ে অগ্রসরমান শত্রুর কনভয়ে অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করে অস্ত্রপাতি লুটে নিতেন। এরপর এগুলো জিহাদরত মুজাহিদবাহিনীর কাছে পৌঁছাতেন। এ অপরাধের কারণেই ইংরেজ গোঁড়া ফৌজ দ্বারা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে শহিদ করা হয়। সে সময় আমি ছিলাম একজন শিক্ষার্থীমাত্র। যখন শুনলাম দেশকে স্বাধীনের লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লব ঘটানো হচ্ছে এবং স্বেচ্ছাসেবী যুবকদের দিয়ে একটি মুজাহিদবাহিনী গঠন করা হচ্ছে, তখন লেখাপড়া বাদ দিয়ে মুজাহিদবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাই। জিহাদ চলাকালে সাধারণত রাতের অন্ধকারেই আমরা কমান্ডো স্টাইলে আক্রমণ পরিচালনা করতাম। এতে ইংরেজবাহিনী বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতো। কাহবাল এলাকায় একবার আক্রমণ করতে গিয়ে আমি সামান্য আহত হয়ে পড়ি। সাথিরা আমাকে ধরাধরি করে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দেন।

আমরা প্রায় তিন-চার দিনের রসদ নিয়ে ফ্রন্টে যেতাম; আবার রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সহযোগী আরেকটি বাহিনী এসে যেত। আমরা তখন চলে যেতাম এবং দু-চার দিন পর পুনরায় ফিরে আসতাম। এভাবেই আজাদ গোত্রগুলো দীর্ঘ দু-বছর ইংরেজবাহিনীকে নাকানিচুবানি খাইয়ে চলছিল।

বিপ্লবের আরেক নেতা মাওলানা ইসহাকের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনিও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁকে ইংরেজরা ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে তিন বছরের জন্য বন্দি করে। পরে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ১১ বছরের জন্য জেলা থেকে বিতাড়িত করে দেয়। এই ১১ বছরের প্রথম দু-বছর তিনি রাওয়ালপিন্ডির[১১৫] একটা কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। পরে তাঁকে নজরবন্দি করে রাখা হয়। বর্তমানে তিনি জীবনসায়াহ্নে উপস্থিত। রাওয়ালপিন্ডির একটি ঘরে ইবাদতে মশগুল। সেখান থেকে খুব একটা বেরও হন না।

উপরের আলোচনায় বোঝা যায়, বিপ্লবকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে দেশে একটি কেন্দ্র ও ১০টি ব্রাঞ্চ গঠন হয়। আল্লাহই সম্যক অবগত।

---

[১১৫] রাওয়ালপিন্ডি বর্তমান পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তর। ১৯৬০-এর দশকে যখন রাজধানী হিসেবে ইসলামাবাদের গোড়াপত্তনের কাজ চলছিল, তখন রাওয়ালপিন্ডি ছিল পাকিস্তানের রাজধানী।

তিন. বহির্বিশ্বে সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

বিপ্লবের সপ্তম অভিপ্রায়স্বরূপ বহির্বিশ্বে বেশ কিছু সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানেও অস্ত্র সংগ্রহের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকদের ভর্তি করিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হতো। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা যে, বহির্বিশ্বের মূল কেন্দ্রটি ছিল মদিনায়। রুল্ট কমিটি ভুল তথ্যের ভিত্তিতেই এটা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। আসলে মূল কেন্দ্র ছিল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। এই কেন্দ্রের প্রথমে পরিচালক ছিলেন শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ, পরে মাওলানা সিন্ধি রাহ. ও মহেন্দ্র প্রতাপ যৌথভাবে।

কাবুল কেন্দ্রের ব্রাঞ্চ ছিল পাঁচটি : ১. মদিনা—সেখানে প্রথমে মাওলানা হাসান আহমাদ, পরে মাওলানা খলিল আহমাদ কাজ করেন। ২. ইসতাম্বুল। ৩. কনস্টান্টিনোপল। ৪. আকাবা। ৫. বার্লিন।

এসব ব্রাঞ্চ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজন পরিচালনা করছিলেন। তবে বার্লিনে হরদয়াল বাবুর কাজ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কূটনৈতিক প্রয়াসেই জার্মান-তুর্কি ঐক্য গড়ে ওঠে এবং জার্মানবাসী বিপ্লবীদের সহায়তায় ভারতবর্ষে আক্রমণ পরিচালনা করে আজাদ ভারতবর্ষকে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

এদিকে বিপ্লব সংঘটনে কাবুল কেন্দ্র যে পরিমাণ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তা ভাবতেও অবাক লাগে। আফগান আমির হাবিবুল্লাহ খান যখন বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের ডেকে সিদ্ধান্ত নিতে বসেন, তখন দেখা যায় একমাত্র আমির ও তাঁর এক ছেলে ইনায়েতুল্লাহ ছাড়া পুরো পঞ্চায়েতের রায় হলো—'আমরা বিপ্লবীদের সাহায্যে জিহাদ করব।' খোদ আমিরের অপর ছেলেদ্বয় আমানুল্লাহ আর নাসরুল্লাহ খানের সিদ্ধান্তও ছিল জিহাদের পক্ষে। হাবিবুল্লাহ খান ভেবেছিলেন, গোত্রপতিরা ভয়ে জিহাদবিরোধী সিদ্ধান্তই নেবেন; কিন্তু তাঁদের এই বিস্ময়কর ঐক্য দেখে তিনি একেবারে হতবাক হয়ে পড়েন। এরপর ভীরু হাবিবুল্লাহ খান তাঁর বিশেষ অধিকার বলে জনসমাবেশকে একটা মধ্যপন্থার সিদ্ধান্তগ্রহণে বাধ্য করেন।

তাঁরা কেন এভাবে একমত হয়েছিলেন? নিশ্চয় হেডকোয়ার্টারে নিয়োজিত বিপ্লবীদের প্রচারণার ফলেই তাঁদের অন্তরে এভাবে জিহাদের আগুন জ্বলে ওঠে। তাই তো দেখা যায়, মাওলানা সিন্ধি যখন প্রথম দফা আফগানিস্তানে যান, তখন কান্দাহারে আফগান সেনাপতি নাদির খান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পাগলের মতো ছুটে আসেন। তাঁকে দেখে নিজেকে ধন্য ও আনন্দিত বলতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি।

মাওলানা সিন্ধি কাবুলে এসে জানতে পারেন, এখানকার জনগণ নিজেদের হৃদয়ের আসনে তাঁকে স্থান দিয়েছে। তাঁকে একনজর দেখতে লোকেরা উন্মুখ এমনকি অনেক

সেনাপতি পর্যন্ত এই মহান বিপ্লবীকে একটিবার দেখতে অপেক্ষার প্রহর গুণছেন।

হ্যাঁ, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডই মূলত জিহাদি মনোভাবাপন্ন আফগান জনতাকে এভাবে জাগিয়ে তোলে। তাই তো 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' ব্যর্থ হওয়ার পর এই সেনা-অফিসাররা মনে করেন ভীরু হাবিবুল্লাহ খান আন্দোলনটি ব্যর্থকরণে ভূমিকা রেখেছেন। তিনিই ছিলেন চক্রান্তের শিরোমণি। তিনিই বিপ্লবীদের গোপন তথ্য ইংরেজদের কাছে পাচার করছিলেন। তাঁর গাদ্দারির ফলেই তাঁদের সোনালি বিপ্লবের এই করুণ পরিণতি। যে কারণে বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের ধরপাকড় ও নজরবন্দি করে রেখেছেন। এ ধারণা থেকেই তাঁরা নজরবন্দি থাকাবস্থায়ই প্রতিবিপ্লবের ডাক দেন এবং হাবিবুল্লাহ নামক পথের কাঁটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে আমানুল্লাহকে ক্ষমতায় নিয়ে আসেন। এরপর দেখা যায় আমানুল্লাহ ক্ষমতায় আসামাত্রই তাঁরা মুক্তি পান এবং তাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। পরে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট তাঁদের পরামর্শেই ব্রিটিশবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁরা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এসব ঘটনা এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বিপ্লবীদের তৎপরতা ও প্রভাব আফগানিস্তানের সর্বত্রে ছড়িয়ে পড়ে।

চার. বহির্বিশ্বকে তুর্কির সাহায্যকারী বানানোর প্রয়াস

বিপ্লবের অষ্টম অভিপ্রায় ছিল তুর্কির পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান। কমপক্ষে তুর্কির বিরোধিতা থেকে সরিয়ে রাখা। এ কাজে হাত দেওয়ার আগে দিল্লিতে একটা জরুরি সভা ডাকা হয়। করাচি মামলা চলাকালে মাওলানা মুহাম্মাদ আলি আমাকে জানান, 'সভায় আমার প্রস্তাব ছিল আমেরিকাকে এ ব্যাপারে উৎসাহী করা হোক। আমার বিশ্বাস, আমেরিকা এ ব্যাপারে আমাদের সহায়তা দেবে। কেননা, তারাও অনেকদিন ধরে ব্রিটিশের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং আজাদির প্রয়াসী লোকগুলোকে তারা নৈতিক সাহায্য দেবে—এমন আশা তাদের থেকে করাই যায়।' কিন্তু শায়খুল হিন্দের কথা ছিল আমেরিকার কাছ থেকে অনুরূপ আশা করা যায় না। তাঁর কথা ছিল, 'ওরা আমাদের সাহায্য করবে দূরে থাক, নিরপেক্ষ ভূমিকাও রাখবে না; বরং ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করতেও কুণ্ঠিত হবে না।' সভায় বেশির ভাগ সদস্যই তাঁর কথার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় ওরা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে।' কিন্তু এরপর যখন মহাযুদ্ধ শুরু হয়, তখন দেখা যায় আমেরিকা তাদের পুরানো প্রভুর সহায়তায় মাঠে নেমে পড়েছে। আমি এটা জানতে পেরে হজরতের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ওপর দারুণ বিস্মিত হয়েছিলাম।

যদিও আমেরিকা ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে তুর্কি সরকারকে সাহায্যের আশা ছিল না, তবু দেশ দুটিতে মিশন পাঠিয়ে চেষ্টা চালানোর ত্রুটি করা হয়নি। আর সে চেষ্টা যে একবারে বিফলে গিয়েছিল, তা-ও বলা যাবে না। কেননা, সরকারপর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করা না গেলেও পাবলিক পর্যায়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করা যায়। এ জন্যই মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সেখানকার বিবেকমান জনসাধারণ ন্যায়ের খাতিরে তাদের সরকারকে চাপে রেখেছিল এবং তাদের এ প্রয়াস তুর্কিদের যথেষ্ট সহায়তাও করে। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানি আর রাশিয়াকে তুর্কির পক্ষে টেনে আনা।

মহেন্দ্র প্রতাপ পুরো তিন বছর জার্মানিতে কাজ চালিয়ে যান। এরপর জাপান থেকে যখন মাওলানা বরকত উল্লাহ হরদয়াল বাবুকে সঙ্গে নিয়ে আসেন, তখন তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় কাজটা সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই জার্মান-তুর্কি মৈত্রী গড়ে ওঠে। তাঁরা সেখানকার রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ক্যাটপিন্ট হ্যান্সকে হাত করেন। তার সহযোগিতায় হিন্দুস্থানি মিশন নিজেদের অনেক জটিল কাজ সহজে সমাধান করতে পেরেছিল। তিনি বিপ্লবীদের ওপর এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, শেষপর্যন্ত নিজেই ভারতে আক্রমণ পরিচালনার জন্য আসেন এবং এখানকার হেডকোয়ার্টারের কর্মীদের সঙ্গে মিলে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন।

জার্মানি মিশনের কর্মকর্তারা সফল হওয়ার পর তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, এবার আপনারা রাশিয়ার দিকে মনোযোগ দিন। এ নির্দেশ পেয়ে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ বার্লিন থেকে কাবুল চলে আসেন এবং সেখানেই কাজ শুরু করেন। এ সময় বিপ্লবের অন্যতম সংগঠক মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধিও কাবুল গিয়ে পৌঁছান। তিনি ও মহেন্দ্র প্রতাপ মিলে ডক্টর মির্জা মুহাম্মাদ আলি ও মথুরা সিংয়ের নেতৃত্বে একটি মিশন রাশিয়ায় পাঠান। বিপ্লবীরা রাশিয়ায় পৌঁছে জারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান; কিন্তু একটি দুষ্ট প্রচারণার শিকার হয়ে রুশ জার তাঁদের ওপর প্রচণ্ড খেপে যান এবং তাঁদের সাক্ষাৎ না দিয়েই গ্রেপ্তারের নির্দেশ জারি করেন। অবশ্য এর আগেই বিপ্লবীরা তাশখন্দের গভর্নরকে নিজেদের পক্ষে টানতে সমর্থ হন। ফলে তার হস্তক্ষেপে গ্রেপ্তারি এড়ানো সক্ষম হয়। তারই সহযোগিতায় তাঁরা উদ্দেশ্য-সাধনে সক্ষম হন।

মাওলানা সিন্ধি বলেন, 'এ মিশনটি ব্যর্থ হয়েছিল বলা যায় না। কেননা, তাঁদের প্রয়াস ও প্রচারণা রুশ-ব্রিটিশ মিত্রতার ক্ষেত্রে প্রবল একটা বাধা হয়ে ওঠে, যে বাধা দূর করতে লর্ড কিচেনারকে সব কাজ পেছনে ফেলে রাশিয়ায় ছুটে আসতে হয়। দীর্ঘদিন এখানে থেকে পরিবেশকে তাদের অনুকূলে নিতে হয়। রাশিয়ার দায়িত্বে বিপ্লবীরা সেখানে একটি লিফলেট প্রকাশ করেন, এর নাম ছিল 'স্বর্ণফলক'। একটি সোনার ফলকে খোদাই করে বিপ্লবীদের মিশনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য লিখে দেওয়া হয়। এই ফলকে এ

কথাটাও লিখে জানানো হয় যে, হিন্দুস্থানের বিপ্লবী পার্টি তাশখন্দের গভর্নরের কাছে হাতেলেখা একটি চিঠি পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যেটি পড়ে তিনি খুবই প্রভাবিত হয়েছেন।'

পূর্বোক্ত মিশন ছাড়া আরেকটি মিশন জারের কাছে পাঠানো হয়। এই মিশনেও জার বরাবরে স্বর্ণফলকে খোদাই করা একটি চিঠি ছিল। পরবর্তীকালে যখন ব্রিটিশ ও রাশিয়ার মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে, তখন রাশিয়া চিঠিখানা ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেয় এবং রুল্ট কমিটি এটাকেই তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করে।

এটা নিতান্তই ভুল ধারণা যে, রাশিয়ায় পাঠানো মিশনের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রকৃত সত্য তথ্য হলো, জার যাঁদের গ্রেপ্তার করেন, তাঁরা ছিলেন জাপান মিশনের সদস্য। তাঁরা রাশিয়া হয়ে জাপান যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল কাদির বি.এ. ও মথুরা সিং। ব্রিটিশ সরকার মথুরা সিংকে ফাঁসি দেয় আর আবদুল কাদিরকে জেলখানায় বন্দি করে রাখে। মোটকথা, রাশিয়া ব্রিটিশের প্রভাবে প্রভাবিত হয়; কিন্তু জার্মানি তুর্কির মিত্রতে পরিণত হয়।

পাঁচ. আক্রমণের রাস্তা নিরূপণ ও এর নিরাপত্তা মজবুতকরণ

এই অভিপ্রায়ের অধীনে আক্রমণের আগপিছ বিবেচনা ও এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তুর্কিবাহিনী মূল আক্রমণে যাওয়ার কথা ছিল। তাদের আগমন-রাস্তায় ছিল ইরান ও আফগানিস্তান। যেহেতু ইরান ছিল ব্রিটিশের অধীন ও তাদের দক্ষিণ বাহু; সর্বোপরি তারা ছিল তুর্কিদের ঘোরতর শত্রু। তাই ইরান হয়ে তুর্কিরা আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এ কারণেই বিপ্লবের কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ করেননি। কেননা, এমতাবস্থায় শুরুতেই তাদের উদ্দেশ্য ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে আত্মমর্যাদাশীল আফগানরা ছিল ব্রিটিশের প্রাণের শত্রু। যদিও আফগানিস্তানে তাদের প্রভাব ছিল এবং আফগানিস্তানকেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই বিবেচনা করা হতো; তথাপি সেখানকার অধিকাংশ জনগণ ছিল ব্রিটিশবিরোধী। অন্তর দিয়ে তারা তাদের পছন্দ করত না। তাই এ দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করা একদিকে যেমন ছিল নিরাপদ, তেমনি বিজয়ের আশাও ছিল প্রচুর।

আমির হাবিবুল্লাহ খান ছিলেন ভীরু প্রকৃতির। তিনি চাননি যে, তাঁর দেশটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হোক। তিনি বিপ্লবীদের বলেন, 'আমি আগে জনগণের মতামত জিজ্ঞেস করে দেখি।' সে লক্ষ্যে সেনা-অফিসার. বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং পাহাড়ি গোত্রগুলোর গোত্রপ্রধানদের ডেকে জানতে চান, তারা বিপ্লবীদের সহযোগিতায় জিহাদ চালাতে প্রস্তুত আছেন কি না! তাঁর আশা ছিল তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যাবে না, ফলে

বিপ্লবীদের একটা অজুহাত দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে পারবেন; কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে লক্ষ করেন, তাঁর দুই ছেলে আমানুল্লাহ আর নাসরুল্লাহসহ প্রায় পুরো দেশবাসী বিপ্লবের জন্য একপায়ে খাড়া। তাঁরা জানায়, 'হ্যাঁ, আমরা তুর্কি ভাইদের সঙ্গে মিলে ভারতসহ আমাদের মাতৃভূমিকে ইংরেজদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে চাই।' কেবল তিনি নিজে আর তাঁর এক ছেলে ইনায়েতুল্লাহই এ ব্যাপারে দ্বিমত ছিলেন। পরে তাঁর ওপর জাতির চাপ বাড়তে থাকলে একটা মধ্যপন্থা বের করেন। বলেন, 'তুর্কিরা পাহাড়ি গোত্রগুলোর রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবে।' তিনি সেই দুর্গম রাস্তাগুলোও চিহ্নিত করে দেন। এর সঙ্গে বলেন, 'ব্রিটিশ সরকার এর জন্য আমাদের দোষারোপ বা রাস্তা বন্ধ করতে চাইলে আমরা বলব—'পাহাড়ি গোত্রগুলো বিদ্রোহী হয়ে গেছে। আমরা তাদের রুখতে অপারগ। বাকি আমাদের সরকারি বাহিনী যুদ্ধে জড়াবে না। তবে জনগণ স্বেচ্ছাভিত্তিতে এতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে বা অর্থসাহায্য দিতে চাইলে আমাদের তরফ থেকে কোনো বাধা থাকবে না।'

হাবিবুল্লাহর ইচ্ছা ছিল আগে তুর্কিরা হামলা করুক; এরপর অবস্থা দেখে ব্যবস্থা নেবেন। ব্রিটিশবাহিনী এগিয়ে রয়েছে দেখা গেলে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুর্কিদের হটিয়ে দেবেন। আর তুর্কিরা এগিয়ে রয়েছে দেখা গেলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দেবেন!

বিপ্লবের নেতারা হাবিবুল্লাহর এমন দুর্বলতায় কিছুটা ঝিম খেয়ে গেলে তাঁর ছেলেদ্বয় তাঁদের সাহস দিয়ে বলেন, 'আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। ক্ষমতা আমাদের হাতে আছে। সেনাবাহিনীর অবস্থানও নিশ্চয়ই আপনারা টের পেয়েছেন। অতএব, এতটুকু সমর্থনকেই এখন পুরো সমর্থন মনে করে কাজ চালিয়ে যান। তুর্কি ভাইয়েরা আসুক। তারা এলে পরে আমরা চাপের মুখে ফেলে তাঁকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য করে ছাড়ব। অন্যথায় রাস্তার এ জঞ্জালকে সাফ করেই আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাব!'

আমানুল্লাহ ও নাসরুল্লাহ ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষ থেকে উৎসাহ পেয়ে বিপ্লবীরা উদ্দীপ্ত হন। এরপর সিদ্ধান্ত হয়, তুর্কিবাহিনী কাবুলের রাস্তা ধরে পাহাড়ি গোত্রগুলোকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে চারটি ফ্রন্টে আক্রমণ করবে :

১. কিলাত ও মাকরানের গোত্রগুলো তুর্কিবাহিনীর নেতৃত্বে করাচির ওপর চড়াও হবে।

২. গজনি ও কান্দাহারের গোত্রগুলো তুর্কি নেতৃত্বে কোয়েটায় আক্রমণ চালাবে।

৩. পেশোয়ার ফ্রন্টে তুর্কি নেতৃত্বে খায়বার গিরিপথ থেকে আক্রমণ চালাবে মাহমন্দি ও মাসউদি গোত্রগুলো।

৪. পাহাড়ি গোত্রগুলোকে সঙ্গে নিয়ে উগির রণফ্রন্টে নামবে সেই তুর্কি ভাইয়েরা।

এদিকে প্রতিটি ফ্রন্টে একেকজন নেতা আগে থেকেই কাজ করছিলেন। কিলাতের ফ্রন্টে ছিলেন করাচির মাওলানা সাদিক। কোয়েটায় হাফিজ তাজ মাহমুদ সিন্ধি। খায়বার গিরিপথে হাজি তুরঙ্গজাই। উগিতে মাওলানা ইসহাক। পরিকল্পনা ছিল, রাশিয়া সহায়তা করলে নেপালের দিক দিয়ে তাদের আক্রমণ করতে বলা হতো। এ উদ্দেশ্যে পণ্ডিত লুই আগে থেকেই সেখানে বসে কাজ চালিয়ে যান।

ছয়. দেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি ফ্রন্টে বিদ্রোহ করা

দশম অভিপ্রায় ছিল, যে মুহূর্তে তুর্কিরা আক্রমণ চালাবে, ঠিক তখন দেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কতিপয় জায়গায় বিদ্রোহ ঘটানো হবে এবং তা হবে ঠিক একই সঙ্গে। একটুও এদিক-সেদিক হবে না, যাতে বহির্দেশীয় ও দেশীয় বিপ্লবীদের একযোগে আক্রমণের শিকার হয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে; কোনোদিকেই পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে না পেরে দুর্বল হয়ে পড়ে। আক্রমণটা যাতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মতো আগ-পিছ না হয়, এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার এটি ছিল অন্যতম কারণ। এ উদ্দেশ্যেই শায়খুল হিন্দ হিন্দুস্থানি বিপ্লবীদের উদ্দেশ করে আনোয়ার পাশাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন,

> *আফগান সরকারের সহায়তার অঙ্গীকার ছাড়া সব অঙ্গীকার ইনকিলাবের নেতা মাহমুদ আফিন্দির কাছ থেকে জানতে পেরেছি। এখন আফগান হুকুমত আমাদের তাদের ভূমি ব্যবহারের সুযোগ দিলে আপনারা সুনির্দিষ্ট একটি তারিখ ঠিক করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যেন আমরা এই তারিখের আগেই আক্রমণের যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে নিতে পারি। আমরা আক্রমণের মাত্র ১০ দিন আগে কাবুলে প্রবেশ করব।*

আনোয়ার পাশার এ চিঠির জবাবেই হেডকোয়ার্টারের নেতা একটা রেশমি রুমালে হাবিবুল্লাহ খানের সই নিয়ে একটি চিঠি পাঠান। এটিতে হামলার তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়। কথা ছিল, এই রুমাল-চিঠি মদিনায় শায়খুল হিন্দের কাছে পৌঁছবে এবং তিনিই এটা আনোয়ার পাশার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। চিঠিতে লেখা ছিল,

> *চিঠিপ্রাপ্তির পর আনোয়ার পাশার সঙ্গে সব কথাবার্তা একেবারে ঠিকঠাক করে নেবেন এবং সে কথা পুনরায় এক বছর আগে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি কাবুলস্থ হেডকোয়ার্টারকে জানানো হবে। এরপর তারা দিল্লির*

হেডকোয়ার্টারকে জানাবেন; আর দিল্লির হেডকোয়ার্টার বিষয়টা ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫-এর আগে আগে দেশের অভ্যন্তরের সকল কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবে।

আরও লেখা ছিল,

তুর্কিবাহিনী ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলে প্রবেশ করবে। পরে তাদের সঙ্গে সবাই মিলে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি একযোগে আক্রমণ পরিচালনা করবেন।

এ উদ্দেশ্যেই শায়খুল হিন্দ মদিনায় থেকে গিয়েছিলেন, যাতে রেশমি রুমাল চিঠিখানা মদিনায় পৌঁছার পর তিনি আরেক দফা আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্ধারিত তারিখে আক্রমণের ওয়াদা নিয়ে কাবুলে চলে আসতে পারেন; কিন্তু অনেক অপেক্ষার পরও যখন তাঁর কাছে রুমাল-চিঠিটা গিয়ে পৌঁছায়নি, তখন তিনি বুঝতে পারেন নিশ্চয়ই এদিকে বড় কোনো ঘটনা ঘটে গেছে। অতএব, তাড়াতাড়ি কাবুলে চলে আসার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন; কিন্তু সময় ততক্ষণে অনেক দূর চলে যায়। শায়খুল হিন্দের তখন কাবুলে আসার আর কোনোই উপায় থাকেনি। রেশমি রুমাল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশরা কাবুলের সবকটি পথ বন্ধ করে দেয়। তিনি বাধ্য হয়েই সেখানে থেকে যান এবং শেষপর্যন্ত সেখানেই গ্রেপ্তার হন। আর এভাবেই তাকদির তদবিরের ওপর বিজয়ী হয়ে যায়।

রেশমি রুমাল ধরা পড়ার পরপরই ব্রিটিশরা ব্যাপকহারে ধরপাকড় শুরু করে। আফগান আমির হাবিবুল্লাহ খানের ওপর চাপ প্রয়োগ করে সেখানকার হেডকোয়ার্টারের নেতাদের ১৯ ফেব্রুয়ারির আগেই বন্দি করিয়ে নেয়। এ ছাড়া ১৯ ফেব্রুয়ারির আগেই হিন্দুস্থান ও আফগানিস্তানের সীমান্তসহ পূর্বনির্ধারিত স্থানসমূহে বিপুল সেনাসমাবেশ ঘটায়; কিন্তু তখন এসবের কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। রেশমি রুমাল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব ঘটানোর সব সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। তখনকার ধরপাকড়ের বিস্তারিত কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। রুল্ট কমিটির রিপোর্ট এ ব্যাপার যা বলে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। রিপোর্ট বলছে, 'সরকার সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশের কোথাও বড়ধরনের কোনো হাঙ্গামা দেখা দেয়নি।'

এতক্ষণ আমরা যে বর্ণনা দিলাম তা মূলত রুল্ট কমিটির রিপোর্ট এবং সিআইডির গোপন কাগজপত্র থেকে সন্নিবেশিত। কিছু কিছু তথ্য মিসরের আদালতে শায়খুল হিন্দকে যে এজাহার পড়ে শোনানো হয়েছিল, তা থেকেও সংগৃহীত। ১০টি অভিপ্রায়ের বর্ণনা শেষে এবার আমরা মূল ঘটনার দিকে এগোচ্ছি।

তৃতীয় অধ্যায়

রেশমি রুমালের ইতিহাস, ব্যর্থতার কারণ ও মাওলানা সিন্ধির ডায়েরির ওপর পর্যালোচনা

- রেশমি রুমালের কেন্দ্রীয় ঘটনা
- রেশমি রুমালের পরিণতি ও তার কারণ
- মাওলানা সিন্ধির ব্যক্তিগত ডায়েরির ওপর পর্যালোচনা

পরিচ্ছেদ

রেশমি রুমালের কেন্দ্রীয় ঘটনা

এক. কেন্দ্রীয় ঘটনা

এখন আমরা সেই কেন্দ্রীয় ঘটনার ওপর আলোকপাত করতে যাচ্ছি, যা 'রেশমি রুমাল' নামে খ্যাত; যার প্রেক্ষাপট বোঝানোর জন্য আমাদের এতক্ষণের কলম চালনা। এই ঘটনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে উল্লিখিত ১০টি অভিপ্রায়ের কথা স্মরণ রাখতে হবে। এগুলোর সারসংক্ষেপ—বিপ্লবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্থানকে ব্রিটিশের রাহুমুক্ত করা। এর জন্য কার্যকারী একটি কমিটি গঠন হয়। এই পরিষদের নেতা ছিলেন শায়খুল হিন্দ। পরিষদের প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল উপমহাদেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ। পরবর্তীকালে কেন্দ্রটি দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'সামারাতুত তাইয়িবা।' পরবর্তীকালে এ নাম পালটে রাখা হয় 'জমিয়তুল আনসার।' এই পরিষদ দেশে সশস্ত্র একটি বিপ্লব ঘটানোর ইচ্ছা পোষণ করে। সেটা এভাবে যে, দেশের ভেতরে বিদ্রোহ সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে বাইরের শক্তিশালী কোনো সেনাবাহিনী দ্বারা ব্রিটিশের ওপর আক্রমণ চালানো হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মুসলিমবিশ্বের শক্তিকেন্দ্র তুর্কি সরকারের সঙ্গে চুক্তি করা হয়। তুর্কিরা যেহেতু আফগান হয়ে আসার কথা ছিল, সেহেতু আফগান সরকারকে তুর্কিদের জন্য যাতায়াতের সুযোগ দানের ব্যাপারে সম্মত করার প্রয়োজন ছিল।

এখানে স্মর্তব্য যে, তখনকার আফগান আর তুর্কি সীমান্ত ছিল পরস্পর লাগোয়া। তখনকার মানচিত্র আর বর্তমান মানচিত্রে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাত। আজ বিশাল তুর্কি খিলাফত সামান্য একটুকরো জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আজ তুর্করা আফগানিস্তান থেকে হাজার মাইলের দূরে। যেহেতু কেন্দ্রীয় এ ঘটনাটি হৃদয়ঙ্গম করতে উল্লিখিত অভিপ্রায়গুলো বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তাই আমরা এখানে পুনরায় সেগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করছি।

১. দেশের ভেতরে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপন করা এবং তাদের একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসা।

২. পুরানো শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে সুশিক্ষিত আলিমসমাজ এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক গ্রাজুয়েটদের একত্রিত করা। তাদের চিন্তাধারাকে সমন্বিত করার প্রয়াস চালানো।

৩. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যথা : জাপান, আমেরিকা, চীন, বার্মা, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া ও জার্মানির নৈতিক সমর্থন আদায় করা।

৪. শত্রুর ওপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য একটি নকশা তৈরি করা এবং সে সঙ্গে শত্রুশিবিরে গোয়েন্দা-তৎপরতা চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

৫. বিপ্লবোত্তর সরকারের খসড়া তৈরি করা। এতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে সমঅধিকার দেওয়া।

৬. দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের ঘাঁটি তৈরি করা এবং যুবকদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ভর্তি করিয়ে শক্তি সংহত করার ব্যবস্থা নেওয়া।

৭. বহির্বিশ্বেও স্বেচ্ছাসেবকদের ভর্তি করানোর জন্য আঙ্কারা, কাবুল, ইসতাম্বুল, বার্লিন এবং কনস্টান্টিনোপলে কেন্দ্র গঠন করা।

৮. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জার্মানিকে তুর্কির সহকারী ও মিত্র বানানো। রাশিয়াকেও মিত্র বানানোর প্রয়াস চালানো।

৯. কিলাত, কোয়েটা, খায়বার গিরিপথ ও উগি নামক স্থানগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করা এবং আফগান সরকারের কাছ থেকে তাদের রাস্তা ব্যবহারের অনুমতি আদায় করা।

১০. শায়খুল হিন্দ কর্তৃক আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার সমর্থন আদায় করা এবং তাঁদের কাছ থেকে আক্রমণের সুনির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে আসা।

দুই. দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত

১৯০৫ থেকে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ নয় বছর উপরোক্ত অভিপ্রায়গুলো সামনে রেখে বিপ্লবের পূর্বপ্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যখন তা পূর্ণতায় নেওয়া হয়, তখন হঠাৎ করেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিপ্লবীদের সামনে ছিল সেটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। তাঁরা দারুল উলুম দেওবন্দে এক পরামর্শসভায় বসে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, সত্বরই বিপ্লব ঘটানো হোক; আর সেটি হোক ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এরপর সেখানে বসেই যে খসড়া তারিখ নির্ধারণ করা হয় সেটা ছিল, আক্রমণ শুরু হবে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের

১৫ ফেব্রুয়ারি। যেহেতু তারিখটি তুর্কি সরকারকে জানিয়ে তাদের অনুমোদন আদায়ের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম, তাই সাব্যস্ত হয় তারিখ আপাতত এটাই নির্ধারিত থাকুক। তুর্কি সরকার এ তারিখের ব্যাপারে মঞ্জুরি দিলে এটাই চূড়ান্ত থাকবে। সে হিসেবে তারিখটি দেশের সকল কেন্দ্রে জানিয়ে বলে দেওয়া হয়—'এ তারিখটা সামনে রেখে নিজেদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করুন। তবে স্মরণ রাখবেন, এটা চূড়ান্ত কোনো তারিখ নয়; ফাইনাল তারিখ পরে জানানো হবে। খবরদার, সেটা না জেনে কেউ মূল কাজে হাত দিতে যাবেন না।'

সিদ্ধান্তটা শায়খুল হিন্দের ঘরে বসেই নেওয়া হয়। এ পর্যায়ে যে কাজটি বাকি ছিল সেটি ছিল, তুর্কি সরকার আর বিপ্লবের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে সরাসরি আলাপ-আলোচনা। কেননা, এতদিন যা করা হয়েছিল এবং যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তা ছিল উভয় পক্ষের প্রতিনিধি পর্যায়ে। তুর্কি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কোনো বৈঠক হয়নি। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় বিপ্লবের কেন্দ্রীয় একজন নেতা আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ মর্মে চুক্তিতে স্বাক্ষর আদায় করবেন যে, তুর্কি সরকার হিন্দুস্থানের আজাদির জন্য অমুক তারিখে আক্রমণ করবে। আমাদের বিপ্লবীরা তাদের সাহায্য করবে। বিজয়ের পর তুর্কিরা বিপ্লবীদের হাতে ক্ষমতা হস্থান্তর করে সেনা প্রত্যাহার করে চলে যাবে, বিনিময়ে বিপ্লবী সরকার তুর্কি সরকারকে প্রতিটি রণফ্রন্টে ব্রিটিশের মোকাবিলায় সেনা ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা দিয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখে বিপ্লবের কেন্দ্রীয় নেতাদের স্বাক্ষর নেওয়া হয় এবং শায়খুল হিন্দের কাছে সে অঙ্গীকারনামাটি দিয়ে বলা হয়, 'আপনি আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর মঞ্জুরি নিয়ে আসবেন।'

সিদ্ধান্ত পাশ হওয়ার পর শায়খুল হিন্দ শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নিজ সম্পদ উত্তরাধিকারীদের বণ্টন করে হজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। হজের সফরের উদ্দেশ্য ছিল এ জন্য যে, তখন হিজাজ ছিল তুর্কি খিলাফতের অধীন, বিধায় হজ ছাড়া সেখানে গেলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সন্দেহ করতে পারে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে গিয়ে হিজাজের গভর্নরের সহায়তায় তুর্কি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন। এরপর তাঁর সম্মতি নিয়ে কাবুল এসে বাকি কাজগুলো সমাধা করবেন। শায়খুল হিন্দকে এ জন্যও যেতে হয়েছিল যে, তখনো তুর্কি-আফগান সরকার পর্যায়ের চুক্তি অপূর্ণ রয়ে যায়। তিনি চেয়েছিলেন আনোয়ার পাশার তরফ থেকে সাহায্যের অঙ্গীকারপত্র নিয়ে কাবুল সরকারকে দেখাবেন। পরে আফগান সরকার কর্তৃক এর অনুমোদন নিয়ে আবার এটা তুর্কি সরকারকে দেবেন, যাতে কারও ব্যাপারে অন্যের কোনো প্রকার দুর্বলতা না থাকে। মোটকথা, তিনি তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিলেন :

১. বিপ্লবী সরকার এবং তুর্কি সরকারের মধ্যে অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া।

২. তুর্কি সরকার ও আফগান সরকারের মধ্যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া।

৩. হামলার সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা।

ব্রিটিশ সরকার অসমর্থিত সূত্রে বিপ্লবের কথা জেনে ফেলেছিল। তারা সাবধানতামূলক দিল্লিতেই শায়খুল হিন্দকে গ্রেপ্তারের ইচ্ছা করে; কিন্তু দিল্লিতে বিপ্লবীদের ব্যাপক প্রভাব আঁচ করে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে বোম্বাই বন্দরে আটকের ফন্দি আঁটে। তবে তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। কেননা, সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগের সঙ্গে ডক্টর আনসারির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকায় গভর্নর জেনারেল কর্তৃক বোম্বাই গভর্নরের উদ্দেশে শায়খুল হিন্দকে গ্রেপ্তার-সংবলিত তারবার্তাটি তিনি হোম সেক্রেটারির অফিসে অনেকক্ষণ আটকে রাখতে সক্ষম হন। ফলে তারবার্তাটি যতক্ষণে বোম্বাই গভর্নরের কাছে পৌঁছায়, ততক্ষণে তিনি তাদের হাত ফসকে বেরিয়ে গেছেন। ততক্ষণে জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যায়। এরপর তারা তাঁকে এডেন বন্দরে আটকানোর ইচ্ছা করে; কিন্তু এ বেলায়ও ব্যর্থ হয়। কেননা, এখানেও সংবাদটি পৌঁছতে দেরি হয়। ফলে শায়খুল হিন্দকে বহনকারী জাহাজটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যায়। এডেন বন্দরে খবরটি কেন দেরিতে পৌঁছেছিল, তা আজ জানার আর কোনো উপায় নেই। যদিও বাহ্যত এটাই মনে হয় যে, দেরিটা ভাগ্যচক্রেই হয়। এরপরও এর পেছনে যে বিপ্লবের নিবেদিত কোনো কর্মীর হাত ছিল না, তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মক্কায় পৌঁছেই তিনি প্রথমে সেখানকার গভর্নর গালিব পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গালিব আগে থেকেই বিপ্লবের কথা জানতেন। শায়খ নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'আমি আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। দয়া করে আপনি এর একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

গালিব বলেন, 'আপনি যে উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন, এর জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো প্রয়োজন নেই। আমিই তাঁর পক্ষ থেকে মঞ্জুরি দিয়ে দিতে পারি। আমি তুর্কি সরকারের সামরিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কমিটির সেক্রেটারি।' কিন্তু শায়খ তাঁকে আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে গালিব পাশা মদিনার গভর্নরকে লিখে পাঠান, 'আপনার কাছে হিন্দুস্থানের বিপ্লবের নেতা মাওলানা মাহমুদ হাসান আফিন্দি আসছেন। আমি তাঁর পরিচয় যাচাই করেছি; আপনি দামেশক অথবা কনস্টান্টিনোপলের কোথাও তাঁর সঙ্গে আনোয়ার পাশার সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।'

এ কাজটা সমাধার পর শায়খুল হিন্দ মক্কায় থাকাবস্থায়ই আরেকটি কাজ করেন।

সেটা হলো, গালিবের মাধ্যমে জিহাদের ফজিলত সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ লিখিয়ে নেন। উদ্দেশ্য ছিল, এটি কপি করে আফগানিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জায়গায় বিলি করাবেন। এটি এ জন্য করেছিলেন যে, একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব আর বিশেষ করে মক্কার গভর্নর যখন এমন বক্তব্য দেবেন, তখন স্বভাবতই মানুষের মনে জিহাদের আগ্রহ জন্মাবে। এ ছাড়া তিনি গালিবের মাধ্যমে আফগান সরকারের নামে এ মর্মে একটা চিঠি লিখিয়ে নেন যে, অতীতের অঙ্গীকারগুলোকে আমরা মঞ্জুরি দিচ্ছি। শীঘ্রই মাহমুদ আফিন্দি আপনাদের কাছে আসছেন। তিনি যা বলবেন মনে করবেন এগুলো তুর্কি সরকারের কথা।

কিন্তু হায়! এ অঙ্গীকারনামাটির বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। যথাসম্ভব এ অঙ্গীকারনামায়ও পুরানো সে কথাগুলোই পুনরুল্লেখ থাকবে যে, 'আফগানিস্তানের অখণ্ডতাবিরোধী কোনো কাজ করা হবে না। আমাদের কারণে যদি আফগান সরকার আক্রান্ত হয়, তা হলে আমরা অর্থ ও সেনা দিয়ে এর প্রতিবিধানে যা যা করার প্রয়োজন, করে যাব।'

এই যে ওয়াদা, তা ইতিপূর্বেও মহেন্দ্র প্রতাপের মাধ্যমে আফগান সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়। সম্ভবত এটিই এবার গালিবের মাধ্যমে লিখিত আকারে জানানো হয়। আর এই ওয়াদাই আনোয়ার পাশাকে দিয়েও আফগান সরকারের উদ্দেশে পাঠানো হয়। ইংরেজ গোয়েন্দারাও গালিবের চুক্তিনামাটি উদ্ধারে সক্ষম হয়নি। তারা কেবল গালিবের প্রবন্ধটাই উদ্ধার করতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে যখন গালিব পাশা বন্দি হয়ে ব্রিটিশের কারাগারে নীত হন, তখনো তিনি এই চুক্তিনামা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তিনি আদালতে কেবল প্রবন্ধের কথাটাই স্বীকার করেছিলেন; চুক্তিপত্র সম্পর্কে আদৌ জিজ্ঞাসিতই হননি।

তিন. গালিবনামা

কাসিম নানুতুবি রাহ.-এর পৌত্র মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া আনসারি এ চিঠিখানা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি হজ শেষে হিন্দুস্থান ফিরছিলেন। দেশে ফেরার পর চিঠি নিয়ে আফগানিস্তানে যান। সেই যে গিয়েছিলেন, জীবনে আর তিনি ভারতে ফেরেননি। সেখানেই স্থায়ী হয়ে যান। পরবর্তীকালে আফগান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। অবশেষে সেখানেই ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন বিরাট যোগ্যতার অধিকারী। বিশ্বরাজনীতি আর বিভিন্ন জাতির অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর জানাশোনা ছিল বিস্ময়কররকম গভীর। ইসলামি রাজনীতি এবং প্রশাসনিক জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। এতৎসংক্রান্ত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থও আছে। এ যোগ্যতার বলেই তিনি আফগান

সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রদূতের আসনে আসীন হন। আল্লাহ তাঁর ওপর অসংখ্য রহমত নাজিল করুন।

মোটকথা, তিনি গালিবনামার বাহক হয়ে হিন্দুস্থান এসেছিলেন। ব্রিটিশের গোয়েন্দারা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লে তিনি মুহাম্মাদ মানসুর নাম ধারণ করে মুখোশ পরে আজাদ গোত্রসমূহের এলাকা ইয়াগিস্তান[১১৬] গিয়ে পৌঁছান। হিন্দুস্থানে গালিবনামার তেমন প্রচারণা হয়নি। তবে আজাদ গোত্রগুলোর ঘরে ঘরে সেটা গিয়ে পৌঁছেছিল। রুল্ট কমিটি সিআইডির সহায়তায় আজাদ গোত্র থেকে এর কয়েকটা অনুলিপি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। পরে তিনি এটি নিয়ে আফগানিস্তান যান এবং সেখানে তা প্রচার করেন; কিন্তু রেশমি রুমাল ধরা পড়ায় গালিবনামার প্রচারণা কোনো কাজে আসেনি। গালিবনামা নামক চিঠিটি একটি কাঠের লাটির ভেতরে ছিল।

চার. গালিবের সঙ্গে চুক্তিপত্র

যদিও এই চুক্তিপত্রে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি, এরপরও সিআইডির গোপন দলিলাদি থেকে যেটুকু জানা যায় তা হলো, চুক্তিপত্রটি আফগান সরকারের হাতে অনেক পরে এসে পৌঁছায়। ইত্যবসরে রেশমি রুমালের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে পড়ে। তবে এটা একেবারে বিফলে যায়নি। কেননা, এই চুক্তিপত্র আফগানিস্তানের বিপ্লববাদী মানসিকতাকে অধিকতর শাণিত করে। এর ফলেই বিপ্লবী আমানুল্লাহ বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হন। তিনি হাবিবুল্লাহকে হত্যা করে ক্ষমতা নেন। পরে বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন। আসলে এই চুক্তিপত্রে এমন কোনো পরিকল্পনা ছিল, যা বিপ্লবকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী ছিল।

পাঁচ. আনোয়ারনামা

গালিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান মদিনায় চলে যান। মদিনার গভর্নর তাঁকে সিরিয়া পাঠানোর ওয়াদা করেন; কিন্তু কদিন পরই তিনি তাঁকে জানান, 'আপনার দামেশকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। খবর এসেছে অল্প কদিনের মধ্যেই নবিজি ﷺ-এর রওজা জিয়ারতের উদ্দেশে আনোয়ার ও জামাল পাশা উভয়েই মদিনায় আসছেন। অতএব, সাক্ষাৎটা এখানেই হয়ে যাবে।'

নির্ধারিত দিন তাঁরা এখানে এসে পৌঁছালে প্রথমে সাধারণ সাক্ষাৎ হয়। এরপর একান্তে বৈঠক হয়। যেহেতু তখন আনোয়ার পাশার ফিরে যাওয়ার তাড়া ছিল খুব বেশি, তাই

[১১৬] ইয়াগিস্তান হলো আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চল। সেখানে ডুরান্ড লাইনের দুপাশে পশতুন উপজাতিদের বসবাস।—*উইকিপিডিয়া* সূত্রে *সম্পাদক*।

পরদিনই তিনি চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি সঙ্গে করে উল্লিখিত চুক্তিপত্র দুটিও নিয়ে যান। তিনি শায়খুল হিন্দকে বলে যান, 'আমি রাজধানীতে গিয়ে চুক্তিপত্রে সই করে পাঠিয়ে দেবো।'

আনোয়ার পাশা চলে যান; আর শায়খুল হিন্দ মদিনায়ই থাকেন। দীর্ঘ এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মদিনার গভর্নর তাঁকে তলব করে আনোয়ার পাশার স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্র দুটি হস্থান্তর করেন। চুক্তি দুটির প্রথমটি ছিল তুর্কি ও হিন্দুস্থানের বিপ্লবী সরকারের মধ্যে। অপরটি ছিল তুর্কি ও আফগান সরকারের মধ্যে। শেষোক্ত চুক্তিনামায় আক্রমণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। আর সে তারিখটা ছিল ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫। উপরোক্ত চুক্তিপত্র দুটি পৃথক পৃথক খামে ছিল। 'আনোয়ারনামা' বলতে এ দুটিকেই বোঝায়।

বিপ্লবী সরকার আর তুর্কি সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রটি শায়খুল হিন্দ নিজের কাছেই রেখে দেন। কেননা, তিনিই ছিলেন বিপ্লবী সরকারের প্রধান। তা ছাড়া এটা পাঠানোর কোনো প্রয়োজনও ছিল না। পরবর্তীকালে রেশমি রুমাল ধরা পড়ে গেলে তিনি একে অকাজের মনে করে অথবা এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবের অনেক গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবে ভেবে নষ্ট করে দেন। অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি এটা হিজাজের বিশ্বস্ত কোনো লোকের হাতে রেখে দেন। পরে ওই ব্যক্তি অকাজের মনে করে তা নষ্ট করে। এ ছাড়া এ সম্ভাবনাও আছে, মাল্টা থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি এটা হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেন। তবে এ সবই মূলত অনুমান। শায়খুল হিন্দ কখনো এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার ফলে আমরাও তাঁকে এ ব্যাপারে কিছু বলার সাহস পাইনি।

আফগান-তুর্কি সরকারের মধ্যকার চূড়ান্ত পর্যায়ের চুক্তিনামাটি তিনি মাওলানা হাদি হাসান খান জাহানপুরিকে দিয়ে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেন। তাঁকে বলে দেন, 'এটা অমুক অমুকের মাধ্যমে যেন আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

কাজের যেটুকু বাকি ছিল তা হচ্ছে, বিপ্লবীরা এ চুক্তিপত্রে আফগান সরকারের মঞ্জুরি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য মদিনায় শায়খুল হিন্দের কাছে পাঠাবেন এবং তিনি এটা তুর্কি সরকারকে দেখিয়ে কথা পাকাপাকি করে আফগানিস্তানে চলে আসবেন। মাওলানা হাদি হাসানের সঙ্গে তিনি বিপ্লবের নেতাদের কাছে এ পয়গামও পাঠান,

> *কোনো কাজেই তাড়াহুড়োর আশ্রয় নেবেন না। খেয়াল রাখবেন, নিজেদের অবহেলার কারণে যাতে অহেতুক খুনখারাবি না ঘটে। আপনারা ব্রাঞ্চগুলোকে জানিয়ে দেবেন, আফগান সরকারের মঞ্জুরির খবর তুর্কি সরকার বরাবরে পৌঁছে যাওয়ার পরই আমি সেটা কাবুল ও দিল্লির*

হেডকোয়ার্টারকে জানিয়ে দেবো। আমার পরবর্তী বার্তা পাওয়ার পর তারা আপনাদের চূড়ান্ত খবর জানাবেন। ওই সংবাদটা পাওয়ার পরই মনে করবেন কাজ পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে। সংবাদটা পেলে পরেই আপনারা আক্রমণে যাবেন; আগে নয়। আর আমার তরফ থেকে আপনাদের কাছে কোনো খবর না পৌঁছালে মনে করতে হবে এদিকে নিশ্চয় বড় কোনো ঘটনা ঘটে গেছে। এমতাবস্থায় কেউ আগ বেড়ে বিদ্রোহ ঘটাতে যাবেন না; বরং পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবেন।

শায়খুল হিন্দের দূরদর্শিতা আর চমৎকার এ ব্যবস্থাপনার ফলেই রেশমি রুমাল ধরা পড়ার পর অহেতুক খুনখারাবি এড়ানো সম্ভব হয়।

মাওলানা হাদি হাসান চুক্তিপত্রটি নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে রওনা হয়ে যান। চিঠিটি একটি কাঠের বাক্সে করে পাঠানো হয়। সেটা এমনভাবে যে, দু-টুকরো হালকা সেগুন কাঠকে একত্রে জুড়ে একটা পাট তৈরি করা হয়। চিঠিটি ছিল এ পাট দুটির ভেতরে। বাইরে থেকে এটা যে দুটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ঘটিত, তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। মাওলানা হাদি হাসান এই বাক্সে কিছু ফালতু কাপড় ভরে রওনা হন।

যেহেতু গোপনীয়তা রক্ষার পরও সিআইডি কর্তৃক বিষয়টা জেনে ফেলার আশঙ্কা ছিল, সেহেতু শায়খুল হিন্দ আগেই এর ব্যবস্থা করে রাখেন। আগেই বোম্বাইর নিবেদিতপ্রাণ এক বিপ্লবীকে তিনি বলে পাঠান, 'মাওলানা হাদি হাসান একটা বাক্সে করে জরুরি একটা জিনিস নিয়ে আসছেন। বোম্বাই বন্দরে তার শক্ত তল্লাশি হতে পারে। তুমি খোঁজ রাখবে—যে দিন জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়বে, ওই দিনই তুমি সবার অগোচরে জাহাজে উঠে যেমন করেই হোক বাক্সটি তার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এরপর সামনে কোথাও সাক্ষাৎ করে সেটা তাঁর হাতে বুঝিয়ে দেবে।'

মাওলানা হাদি হাসানকেও বলে দেন, 'অমুক যখন জাহাজে উঠবে, তখন তুমি তার কাছে বাক্সটি উঠিয়ে দিয়ে নির্ধারিত কোনো জায়গার কথা বলে দেবে, যেখানে সে ওটা পুনরায় তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারে। তাকে আরও বলে দেবে, বাক্সটি নিয়ে গিয়ে সে যেন এটা নিজের কাছে না রাখে। কারণ, গোয়েন্দারা সন্দেহ করতে পারে—কেন লোকটি জাহাজে উঠে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল! মনে রাখবে, শত্রু তোমাদের পিছে ছায়ার মতো লেগে আছে। অতএব, সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'

এদিকে শায়খ আগত লোকটিকে পরিচয়ের যাবতীয় তথ্য মাওলানা হাদি হাসানকে বলে দেন। জাহাজ বোম্বাইর ঘাটে এসে পৌঁছালে লোকটি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মাওলানা তাকে বলেন, 'এটা তুমি সত্বর মুজাফ্ফরনগরে মাওলানা নবি হুসাইনের

কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।' ইতিপূর্বে আরেক সংবাদবাহকের মাধ্যমে শায়খুল হিন্দ নবি হুসাইনকে জানিয়েছিলেন, 'তোমার কাছে একটা বাক্স আসছে, এই বাক্সের ভেতরে একটা চুক্তিপত্র পাবে। যেমন করেই হোক এটা অমুক জায়গায় পৌঁছে দেবে।'

জাহাজে ওঠা লোকটি অন্যান্য যাত্রীর মাল-সামানার মতো এ বাক্সটাও কুলির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসেন। পরে মানুষের সন্দেহের বাইরে একজায়গায় গিয়ে কুলির মাথা থেকে এটা উঠিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মাওলানা নবি হুসাইনের ঠিকানায় পার্সেল করে দেন।

এদিকে জিদ্দা বন্দরের ব্রিটিশ গোয়েন্দা সদস্যরা শায়খুল হিন্দকে সেখানে দেখতে পেয়ে বোম্বাইয়ে তাদের এজেন্টদের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠায়, 'এই জাহাজে করে মাহমুদ হাসান ভারত যাচ্ছেন।' আসলে তারা ভুল তথ্য দেয়। তাঁকে সেখানে দেখে তারা ভেবেছিল তিনি বোধহয় ভারতে ফিরে যাচ্ছেন। এ জন্যই যখন জাহাজ বোম্বাই বন্দরে এসে নোঙর ফেলে, তখনই এখানকার গোয়েন্দারা অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে; কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন তাঁর না আসার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন জাহাজে করে আগত তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের টার্গেট করে নীরবে তাদের অনুসরণ করতে থাকে। মাওলানা হাদি হাসানও তাদের টার্গেটে পরিণত হন। গোয়েন্দারা তাঁকে খুব করে তল্লাশি চালিয়েছিল; কিন্তু আসল জিনিসটা তো ততক্ষণে অনেক দূর চলে যায়। কিছুই যখন পাওয়া যায়নি, তখন সিআডিরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিনিতাল নিয়ে যায়। সেখানে প্রচুর জেরা করা হয়; কিন্তু মাওলানা ঘুণাক্ষরেও তাদের কোনো ইঙ্গিত দেননি।

এদিকে মাওলানা নবি হুসাইন চিঠি বের করে হাজি নুরুল হাসানের কাছে দিয়ে দেন; আর তিনি দেন মির্জা আহমাদের হাতে। মির্জা সাহেব তা কপি করে বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে দেন; কিন্তু কেন্দ্রগুলো এটা দ্বারা তেমন একটা লাভবান হতে পারেনি। কেননা, এর মাত্র কদিন পরই রেশমি রুমাল ধরা পড়ায় সবকিছু ভন্ডুল হয়ে যায়। ফলে বিপদ এড়াতে কপিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

উল্লিখিত সবার ঘরেই গোয়েন্দা-পুলিশ হানা দিয়েছিল; কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি।

হাজি মুহাম্মাদ নবি হুসাইনের ওখানে যখন পুলিশ হানা দেয়, তখন তিনি চিঠিখানা একটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে বারান্দায় লটকিয়ে রাখেন। এত গুরুত্বপূর্ণ একখানা চিঠি যে এমন সাধারণ জায়গায় রাখা হবে, তা গোয়েন্দাদের কল্পনাতেও আসেনি। ফলে এটা তাদের তল্লাশির আওতায় পড়েনি। এরপর পুলিশ হাজি নুরুল হাসানের বাসায় হানা দেয়; কিন্তু তখনো তাঁর ওখানে চিঠিটা পৌঁছায়নি। একইভাবে মির্জা আহমাদ ফটোগ্রাফারের ওখানেও তল্লাশি নেওয়া হয়। তাঁর ওখানে দু-বার হানা দেওয়া হয়।

প্রথম দফা তাঁর কাছে চিঠি গিয়ে পৌঁছায়নি। দ্বিতীয় দফা পৌঁছেছিল, তবে তিনি সেটি চেয়ারের নিচে একটা ফেলনা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে রেখেছিলেন।

স্মর্তব্য, আনোয়ারনামায় মোট তিনটি কাগজ ছিল। একটি শায়খুল হিন্দ নিজের কাছেই রেখে দেন। বাকি দুটির একটিতে আনোয়ার পাশা হিন্দুস্থানের জনসাধারণকে উদ্দেশ করে শায়খুল হিন্দ ও তাঁর বিপ্লবকে সাহায্যের আহ্বান জানান। এ চিঠিখানাই মির্জা আহমাদ ফটোকপি করে বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠান। আর তৃতীয়টি ছিল তুর্কি ও আফগান সরকারের মধ্যকার চুক্তি-সংক্রান্ত। এটি হাজি নবি হুসাইনের কাছেই ছিল। মাওলানা হাদি হাসান মুক্তি পাওয়ার পর বেশ বদল করে নিজেকে জুফর আহমাদ নামে পরিচিত করে দীর্ঘ দু-মাস দুর্গম রাস্তা পাড়ি দিয়ে এটা আফগানিস্তানে নিয়ে যান।

এটা একটা ভুল ধারণা যে, খুশ মুহাম্মাদ নামের এক যুবক এসে হাদি হাসানের কাছ থেকে চিঠিখানা নিয়ে যায়। আফগান-তুর্কি সরকারের মধ্যকার চুক্তিপত্রের ভাষা ছিল আরবি, তুর্কি ও ফরাসি। শায়খুল হিন্দের কাছে যেটি ছিল তা ছিল শুধু উর্দু ভাষায়। কাবুলে চিঠিখানা এসে পৌঁছানোর পর বিপ্লবের নেতারা এটি আফগান সরকারের কাছে পেশ করেন এবং জানান, 'তাঁরা এর জবাব শায়খুল হিন্দের কাছে পৌঁছাবেন।' এটি পেয়েই হাবিবুল্লাহ দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ডেকে সবার মতামত তলব করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ব্রিটিশের ভয়ে কেউ জিহাদের কথা মুখেই আনবে না। সুতরাং আমরা জিহাদ চাই না—এটাই তিনি বিপ্লবীদের জানিয়ে দেবেন। কিন্তু দেখা যায়, কেবল তিনি আর তাঁর ছেলে ইনায়েতুল্লাহ ছাড়া শাহজাদা আমানুল্লাহ, নাসরুল্লাহসহ সমগ্র দেশবাসী জিহাদের জন্য একপায়ে খাড়া। তখনই তিনি পূর্বোল্লিখিত মধ্যবর্তী সিদ্ধান্তে পৌঁছান। বিপ্লবীরা তাঁর এই নিমরাজিভাবকেও মোক্ষম সুযোগ মনে করে কাজ চালিয়ে যান। এরপর বাদশাহর নায়িব নাসরুল্লাহ খান নিজের হাতে লিখে সিন্ধির পরামর্শ অনুযায়ী মদিনায় শায়খুল হিন্দের কাছে পাঠানোর দায়িত্ব নেন। মাওলানা সিন্ধি ব্যাপারটি অধিকতর পাকাপোক্ত করার তাগিদে ওয়াদানামা আর মঞ্জুরিপত্রের সঙ্গে সঙ্গে হামলার নির্ধারিত তারিখও লিখে দিতে বলেছিলেন। সে তারিখ ছিল ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

চিঠিখানা একটি রেশমি রুমালের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। এটিই সে রেশমি রুমাল, যার নামে পুরো আন্দোলনটিকে নামকরণ করা হয়েছে। আমাদের গ্রন্থের নামকরণের প্রেক্ষাপটও এটিই। এরই ভূমিকাস্বরূপ আমরা এতগুলো পৃষ্ঠা রচনা করতে বাধ্য হই। মূল ঘটনা কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত; তবে এর আবেদন খুবই অতলস্পর্শী; যার পরবর্তী অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ; যে ঘটনাটি আজও আপন বিভায় উজ্জ্বল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রেশমি রুমালের পরিণতি ও তার কারণ

এক. যেভাবে ধরা পড়ে রেশমি রুমাল

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি ও শাহজাদা নাসরুল্লাহ খান এক অভিজ্ঞ কারিগরকে দিয়ে একটি রেশমি সুতোর রুমাল বানান। রুমালটি এমন প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয় যে, এর বয়নকর্মেই আরবি ভাষায় চুক্তির বিবরণ, হামলার তারিখ, আফগান সরকারের মঞ্জুরিদানের ভাষ্য এবং আফগান আমিরসহ তাঁর তিন ছেলে যথাক্রমে আমানুল্লাহ, নাসরুল্লাহ ও ইনায়েতুল্লাহর স্বাক্ষর পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যদিও স্বাক্ষর একদফা বয়নকর্মেই এসে গিয়েছিল, এরপরও হলদে কালি দিয়ে পুনরায় তাদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, রুমালটিও ছিল হলদে রঙের। আর এটা লম্বা ও প্রস্থে ছিল এক গজ পরিমাণের। চিঠিটি বিপ্লবের খবরাদি আদানপ্রদানকারী এক কাপড়-ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি আফগান থেকে হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থান থেকে আফগান প্রায়ই যাওয়া-আসা করতেন। নওমুসলিম এ যুবক ব্যবসায়ী ছিলেন অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিমান। বেনারসের এক হিন্দু পরিবারে জন্ম নেওয়া ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রিধারী এ যুবক ছিলেন শায়খুল হিন্দের হাতে বায়আত গ্রহণকারীদের অন্যতম। ইসলামের খাতিরে তিনি বড় বড় অনেক ত্যাগ আর কুরবানি দেন। নির্দেশ অনুযায়ী রুমালখানা নিয়ে পেশোয়ার যান। সতর্কতাহেতু রুমালটি তাঁর ব্যবসায়ী পণ্যের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। এ ছাড়া অধিকতর সাবধানতাহেতু অনুরূপ আকারের আরও পাঁচ ডজন রুমাল খরিদ করেন। এ জন্যই সীমান্তে গোয়েন্দারা প্রচুর তল্লাশি চালানোর পরও কাঙ্ক্ষিত রুমালটি বের করতে পারেনি। তাঁকে বলে দেওয়া হয়, সম্ভব হলে তিনি নিজেই যেন রুমালটি হায়দারাবাদে শায়খ আবদুর রাহিমের হাতে পৌঁছে দেন। শায়খ আবদুর রাহিমকে মাওলানা হাদি হাসান আগেই বলে রেখেছিলেন—'রুমালটি তাঁর কাছে যেতেই যেন তিনি হজের উদ্দেশ্যে মক্কা চলে যান।' নওমুসলিম শায়খ আবদুল হককে বলা হয়, 'এটা শায়খ আবদুর রাহিমের কাছে নিয়ে যেতে না পারলে আমাদের পেশোয়ারস্থ

বিপ্লবের কর্মী খান বাহাদুর হক নাওয়াজের ওখানে পৌঁছিয়ে বাকি নির্দেশাবলি তাঁকে বলে শোনাবেন।'

শায়খ আবদুল হক প্রথমে নিজেই হায়দারাবাদ নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন; কিন্তু পেশোয়ার সীমান্তে তল্লাশির অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যান। ফলে ইচ্ছাটি বাতিল করে রুমালটি খান বাহাদুর হক নাওয়াজের হাতে বুঝিয়ে দেন। হক নাওয়াজের কাছে রুমালখানা রাত ৯টার দিকে এসে পৌঁছেছিল। তিনি দেরি না করে সাহরির সময় অর্থাৎ, রাত ৪টার দিকে একজন বিশ্বস্ত লোককে দিয়ে রুমালটি দীনপুরের সাজাদানশিন পির খাজা গোলাম মুহাম্মাদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

এদিকে ফজরের নামাজের খানিক আগেই পুলিশ এসে খাজা হক নাওয়াজের বাসায় হানা দেয়; কিন্তু ততক্ষণে জিনিসটি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। পুলিশ তাঁকে বন্দি করে নিয়ে প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। এদিকে পরদিন ১০টার দিকে দিনপুরে সেটা এসে পৌঁছায়। তখন চারিদিকে ডামাডোলে পরিস্থিতি থাকায় খাজা গোলাম মুহাম্মাদ সেটা দুপুর ১২টার সময়ই বিশ্বস্ত একজনকে দিয়ে সিন্ধুতে পাঠিয়ে দেন। ওই দিন বিকেলেই পুলিশের লোকেরা তাঁর ওখানে এসে তল্লাশি চালায়। চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাত ১০টা পর্যন্ত বাড়িতে চিরুনি অভিযান চালিয়েও যখন কিছু উদ্ধার করতে পারেনি, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ভাওয়ালপুর এবং পরে ফিরোজপুর নিয়ে প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি কিছুই স্বীকার না করলে অবশেষে সরকারি পুলিশ তাঁকে বন্দি করে। চার মাস বন্দি থাকার পর মুক্তি পান।

এভাবে রুমালখানা পরদিন দুপুরে তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে অর্থাৎ, শায়খ আবদুর রাহিমের ওখানে এসে পৌঁছায়। ইশার সময় হলে তিনি তা বের করে একটি কাপড়ে জড়িয়ে বেশ বদলে আত্মগোপনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। ততক্ষণে তিনি বেশ বদলে ফেলেছেন, বাকি কেবল রুমালটিকে কাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া। সে উদ্দেশ্য নিয়ে সুঁই-সুতো নিয়ে সেলাই করছেন। এরই মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশের দল তাঁর এখানে এসে হানা দেয়। তারা দেয়াল টপকে ঘরের ভেতর ঢুকেই জাপটা মেরে রুমালটি ছিনিয়ে নেয়। এর মধ্যে তিনিও দেয়াল ডিঙিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সেই যে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর।

তিনি ছিলেন কার পোলানির সহোদর। মাওলানা সিন্ধির হাতে মুসলমান হয়ে তাঁরই হাতে বায়আত হন। তাঁর ইসলামি নাম রাখা হয়েছিল শায়খ আবদুর রাহিম।

সম্ভবত তিনি এ জন্যই আত্মগোপন করেছিলেন যে, তাঁকে হাতে পেলে গোয়েন্দারা অনেক তথ্য জানতে চাইবে। এতে তাঁর মুরব্বিদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙে

পড়বে। বলা হয় তিনি আত্মগোপন করে রাশিয়ায় চলে যান। আবার অনেকে বলেন হিন্দুস্থানেরই কোনো অজ্ঞাত স্থানে দরবেশি জিন্দেগি পালন করে জীবনটা কাটিয়ে দেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়, তিনি বুজুর্গদের কল্যাণ-কামনায় নিজেকে চিরদিনের মতো এ পরিচিত বিশ্বের বাইরে ঠেলে দেন। তাঁর জন্য বুজুর্গরা কষ্ট পাবেন—এটা তিনি ভাবতেও পারছিলেন না। একেই বলে সত্যিকারের মুহাব্বাত।

মোটকথা, শত গোপনীয়তা অবলম্বন করেও শেষ রক্ষা হয়নি। অবশেষে তাকদিরই যাবতীয় চেষ্টা-তদবিরের ওপর বিজয়ী হয়। যদিও সরকারের কাছে ইতিপূর্বে মৌখিকভাবে অনেক তথ্যই এসে পৌঁছেছিল; কিন্তু স্পষ্ট কোনো প্রমাণ না থাকায় তারা নিশ্চিত হতে পারছিল না। রেশমি রুমাল ধরা পড়ে গেলে আগে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর ব্যাপারে তাদের আর কোনোরকম সন্দেহ থাকেনি। ফলে তারা খুব তাড়াহুড়ো করেই ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে।

এখানে সর্বাধিক বড় প্রশ্ন হলো, তাহলে কোন গাদ্দার ব্রিটিশকে এই তথ্য জানাল? কীভাবে তারা এত নিখুঁতভাবে যথাযথ জায়গায় হানা দিতে পারল? মাওলানা সিন্ধিকে এ ব্যাপারে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে যে, তথ্যটা হক নাওয়াজই ব্রিটিশের হাতে তুলে দেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি জেলে যাওয়ার পরেই এ তথ্য দেন; কিন্তু দাবিগুলো সর্বৈব মিথ্যা। এ ব্যাপারে কোনোই মতভেদ নেই যে, রুমালখানা সিন্ধুতেই ধরা পড়ে। তিনি যদি পুলিশকে বলবেনই, তাহলে পরে বলবেন কেন? তাঁর হাতে থাকাকালেই তো বলতে পারতেন? পুলিশ তো তাঁর হাত থেকেই এটা উদ্ধার করতে পারত? তা ছাড়া এটি তাঁর ঘরে এসে পৌঁছানো আর ভোরেই পুলিশ এসে তাঁর ওখানে হানা দেওয়া; একইভাবে নিখুঁত নিশানায় অন্যদের ওখানেও হানা দেওয়া—এগুলো কি প্রমাণ করে না যে, ব্রিটিশরা অন্য কোনো মাধ্যম থেকে সংবাদটা পেয়েছিল?

আমাদের কথার পেছনে আরও যুক্তি হলো, তাঁর ঘরে পরে হানা দেয় কেন? আর কোন সূত্রের ভিত্তিতেই-বা একজন ব্যবসায়ী শায়খ আবদুল হককে এভাবে তল্লাশি করা হয়?

হ্যাঁ, এ খবরটা গাদ্দার হাবিবুল্লাহ ও তাঁর গাদ্দার ছেলে ইনায়েতুল্লাহই বেতারের মাধ্যমে ইংরেজদেরকে জানিয়ে দেন। এ জন্যই বিপ্লবী আমানুল্লাহর সাথিরা তাঁকে হত্যা করেন। তাঁরা স্রেফ জেদের বশবর্তী হয়েই হাবিবুল্লাহকে হত্যা করে ইনায়েতুল্লাহর স্বপ্নসাধ মিটিয়ে দেননি; নিশ্চয় তাঁদের হাতে বিপ্লবের সঙ্গে গাদ্দারির সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ ছিল।

দুই. রেশমি রুমালের পর

যখন গোয়েন্দারা তাদের অতীত সংগৃহীত তথ্যের সত্যায়ন পেয়ে যায় অর্থাৎ, রেশমি রুমালের মাধ্যমে বিপ্লবী সরকার ও তুর্কি সরকারের মধ্যকার গোপন ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হয়, তখনই দ্রুত সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়! কাগজ-পত্রে প্রমাণিত থাকলেও হাবিবুল্লাহ খান এ যাত্রায় মুক্তি পেয়ে যান। শুধু মুক্তিই নয়; বরং পুরস্কৃতও হন। তাঁর মাধ্যমে কাবুলে থাকা বিপ্লবীদের বন্দি করিয়ে জেলে পুরা হয়। অবশ্য তাঁকে প্রাণ দিয়ে এর মাশুল গুনতে হয়।

আমানুল্লাহর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ামাত্রই বিপ্লবীরা মুক্তি পেয়ে যান। এদিকে হিন্দুস্থানেও ধরপাকড় শুরু হয়। সন্দেহভাজন প্রত্যেককেই বন্দি করা হয়। সাধারণ অনেক লোককেও নজরবন্দি রাখা হয়। তা ছাড়া যেসব জায়গায় সংঘাতের আশঙ্কা ছিল, সেসব জায়গায় তারা দ্রুত সেনা মোতায়েন করে। সীমান্তপ্রদেশের পুরো এলাকা সেনাবাহিনী দিয়ে ঘেরাও করা হয়। এসব ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি তুর্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রতিটি ফ্রন্টে আক্রমণ জোরদার করা হয়। এদিকে ইরানে সেনা পাঠিয়ে তুর্কি ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী করিডরটিও বন্ধ করে দেয়। সব শেষে আরববিশ্বকে তুর্কির বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। এ উদ্দেশ্যে তারা মক্কার গভর্নর (শরিফ) হুসাইন ইবনু আলিকে শিখণ্ডি হিসেবে ব্যবহার করে।

শরিফ ব্রিটিশের প্ররোচনায় পড়ে মক্কায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। আরব জাতীয়তাবাদের প্রতারণাময় স্লোগান তুলে তুর্কিকে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। সেদিন তথাকথিত ওই আরব জাতীয়তাবাদীরা তুর্কি ভাইদের ওপর অত্যাচারের যে পাহাড় চাপিয়েছিল, তা ভাবতেও শরীরের লোমকুপগুলো কাঁটা দিয়ে ওঠে। ষড়যন্ত্রকারী ব্রিটিশ এটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আরব আর হিন্দুস্থানের রুটিপাগল একশ্রেণির আলিমদের দিয়ে তুর্কির বিরুদ্ধে কুফরির ফাতওয়া প্রকাশ করিয়ে বিশ্বব্যাপী এই ঘৃণ্য প্রচারণা চালায় যে, (নাউজুবিল্লাহ) 'তুর্কিরা নাকি মুসলিম নন। তাদের খিলাফতব্যবস্থাও ইসলামি নয়; তারা স্রেফ সাম্রাজ্যবাদী। তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদ চালিয়ে যাওয়া ফরজ।' শরিফ-মতাবলম্বী আলিমরা এতে স্বাক্ষর করেন।

ব্রিটিশরা এ ফাতওয়াকে পুঁজি করে ভারতের হাক্কানি আলিমদেরও অত্যাচারের নিশানা বানায়। অর্থাৎ, যাঁরা ষড়যন্ত্রমূলক এই ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন, তাঁদের হয়তো জেলে বন্দি করে, নতুবা নিজের ঘরে বন্দি করে রাখে। শায়খুল হিন্দকেও এ অজুহাত দেখিয়েই গ্রেপ্তার করা হয়। তবে এটা যে নিছক একটা অজুহাত ছিল, তা মিসরের আদালতে শায়খের বিচার-কার্যক্রম থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন প্রকাশ

হয়ে পড়েছিল ফাতওয়ায় স্বাক্ষর না করার ব্যাপারটা ছিল একটা বাহানামাত্র। তাঁকে 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' পরিচালনার দায়েই গ্রেপ্তার করা হয়। তবে ব্রিটিশ সরকার এই অভিযোগ বরাবরই চেপে যায়। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হলে পুরো হিন্দুস্থান অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠার আশঙ্কা ছিল প্রবল।

এদিকে বিপ্লবীদের যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই কারাগারে নীত হন। যারা দেশের ভিতরে ছিলেন, তাঁদের পক্ষে করার কিছুই ছিল না। বাধ্য হয়েই তাঁরা নীরব হয়ে যান। যাঁরা ছিলেন সীমান্তপ্রদেশের বাসিন্দা, তাঁদের হাত-পা বন্দি ছিল না। তাঁদের কিছু একটা করার সুযোগ ছিল। তাই তাঁরা নীরব বসে থাকেননি। উগির বিভিন্ন ফ্রন্টে লাগাতার তিন বছর ব্রিটিশবাহিনীকে নাজেহাল করে চলছিলেন। হাজি তুরঙ্গাজাইও কাবায়েলি গোত্রগুলোকে সংঘবদ্ধ করে লাগাতার তিনটি বছর জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। একইভাবে কিলাত আর ল্যাসবেলির বাসিন্দারাও দুই বছর ব্রিটিশবাহিনীকে প্রচুর ভুগিয়েছিলেন।

এ ছাড়া যাঁরা আফগানিস্তানে ছিলেন, তাঁদের হাত-পা-ও হিন্দুস্থানিদের মতো বন্ধ ছিল না। তাঁরাও প্রতিশোধ নিতে এতটুকু কসুর করেননি। তাঁরা সেখানে একটি আন্দোলনের ডাক দেন এবং স্বাধীনতা পিপাসীদের আমানুল্লাহর সঙ্গে মিলেমিশে কাজের নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়ামাত্রই উজ্জীবিত বিপ্লবীরা দলে দলে আমানুল্লাহর সঙ্গে মিলিত হন। হাবিবুল্লাহকে হত্যা করে আমানুল্লাহর হাতে ক্ষমতা তুলে দেন।

সংঘবদ্ধ আক্রমণের মাধ্যমে ব্রিটিশের হাত থেকে হিন্দুস্থানের একের পর এক এলাকা ছিনিয়ে আনা শুরু করেন; কিন্তু ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। ফলে ব্রিটিশরা তাদের পুরো শক্তি আমানুল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। তাই কোহাট পর্যন্ত জয়ের পর আমানুল্লাহর পক্ষে আর এগোনো সম্ভব হয়নি। তবে ব্রিটিশরা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলে তাঁরা দখলকৃত এলাকাগুলো ব্রিটিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন।

ব্রিটিশ আর আফগান সরকারের মধ্যে এ চুক্তিটা হয়েছিল সাবেক সীমান্তকে স্বীকৃতি দিয়ে। এর ফলে বাহ্যত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ বিপ্লব কেবল আফগানিস্তানের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পেরেছিল। হ্যাঁ, এটুকুর ওপরই বিপ্লবীরা সবর করে নেন। কেননা, তখনকার পরিস্থিতিতে এটাও কম বড় পাওয়া ছিল না।

এদিকে শায়খুল হিন্দকে বন্দি করে মিসরের সামরিক আদালতে নেওয়া হয়; কিন্তু আদালত বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা প্রমাণ করতে না পেরে যুদ্ধবন্দি হিসেবে মাল্টায় নির্বাসনদণ্ড দেয়। বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি সেখানেই বন্দিজীবন অতিবাহিত করেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে তিনি হিন্দুস্থানে চলে আসেন এবং খিলাফত আন্দোলনে কিছুদিন কাজের পর ইনতিকাল করেন।

মোটকথা, আন্দোলনকারীদের এক বিরাট অংশ বন্দি হন। কেউ কেউ নিজেদের বাড়ি-ঘরে নিশ্চুপ বসে থাকেন। কেউ কেউ আফগানিস্তানে চলে যান। অনেকে ভিন দেশে চলে যান। কেউ মুক্তিও লাভ করেন। আবার কেউ কেউ দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে লড়াই অব্যাহত রাখেন। কেউ বিদেশের মাটিতে থাকার পরও বন্দি হন। যেমন শায়খুল হিন্দ ও মাদানি রাহ.। তবে কেউ কেউ এমন দুর্বলতাও দেখান যে, প্রাণভয়ে ইংরেজদের কাছে সবকিছু খুলে বলেন। সারকথা, তাঁরা উপরোল্লিখিত সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এবার আমরা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির ব্যক্তিগত ডায়েরির সূত্রে নির্বাচিত কিছু অংশ তাঁরই ভাষায় তুলে ধরার প্রয়াস পাব। এতে অবস্থার ইন্দ্রজাল, ঘটনার গোপনীয়তা, তখনকার আফগান সরকারের কাজকর্ম আর তাদের নীতির কথা উঠে আসবে।

প্রশ্ন হতে পারে, বিপ্লবের এই গোপনীয়তা ফাঁস হলো কী করে? তখন তো এসবের প্রোপাগান্ডা চালানোর মতো পরিবেশ ছিল না! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, রাজা সাহেবের ইজ্জত রক্ষার জন্যই কেবল লালা রাজপুত রায় আমাদের সঙ্গে একাত্ম হন। এরপর প্রতিটি কথাই আমাদের নাম ভাঙিয়ে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। লালাজি আমাদের সঙ্গ দ্বারা আরও বেশি উপকৃত হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু হায়! তার সেই অতি লোভই শেষপর্যন্ত তার জন্য বিপদ ডেকে এনেছিল।

তিন. ভারতীয় মিশনের পরাজয় ও তথ্যের অভাব

বার বার সাক্ষাতের ফলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, এই মিশনের ভারত ও জার্মান সদস্যরা পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি কাজে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি। অথচ এ রকম আন্দোলনের জন্য এমনটা না হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় সদস্যরা সব দায়ভার জার্মান মিশনারিদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা পার পেতে চান। পক্ষান্তরে জার্মান মিশন সদস্যদের কথা হলো, 'বার্লিন ও ইসতাম্বুলে সবুজ বাগানের যে স্বপ্ন আমাদের দেখানো হয়েছিল, তার এক-দশমাংশও সঠিক ছিল না।'

এই মিশনের যে মহা-উদ্দেশ্য ছিল, সত্যি বলতে মিশনারিরা সে অনুপাতে প্রস্তুতিই নেননি। রাজা মহেন্দ্রকে যখন আমি মিশনের কতিপয় দুর্বল দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তখন তিনি আমাকে আমতা আমতা করে বলেন, 'হ্যাঁ, জার্মান চ্যান্সেলরও আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রস্তাব দেন; কিন্তু হায়! আমি তখন বিষয়টিকে আত্মমর্যাদার প্রশ্ন মনে করে সেই সহৃদয় প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলাম!'

চার. মুসলিমদের হীনম্মন্যতা এবং হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব

আমি যেটুক বুঝেছি তা হলো, জার্মান ও তুর্কিবাহিনী সম্মিলিতভাবে আফগানিস্তানে প্রবেশ করলে মালুজি (রাজা) এতে অবগত হবেন। যতটুকু সম্ভব ভারত সীমান্ত থেকে এই আপদ দূরে রাখার প্রয়াস পাবেন। এ ব্যাপারে আফগান সরকার যে ব্যবস্থা নেবে সেটা হলো, তিনি নেপালের রাজাকেও সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করবেন। ইন্ডিয়ান সোসাইটি হিন্দুত্ববাদী দএই আন্দোলনকে বাহ্যিকভাবে হিন্দুস্থানি আন্দোলনে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে নামকাওয়াস্তে মুসলিম প্রতিনিধি অর্থাৎ, মাওলানা বরকত উল্লাহকে অংশীদার করে। মাওলানার অংশগ্রহণকে আমরা যে পরিমাণ অর্থহীন দেখাচ্ছি, আসলে এটা তাঁর কোনো ত্রুটি কিংবা ব্যক্তিগত দুর্বলতার ফলে নয়; বরং এটা আমাদের মুসলিম সোসাইটির সেই আলসেমি আর আত্মঘাতী সিদ্ধান্তেরই প্রতিফল যে, আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করে সংখ্যাগরিষ্ঠের করুণার ওপর জীবন পরিচালনাকে নিয়তি বানিয়ে নিই। অন্যকথায় উত্তম মনে করেছিলাম। যখন কারও মস্তিষ্কে এ কথাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, তুমি এই পুতুলের অনুমতি ছাড়া কাজ করতে পারবে না, তখন শত যোগ্যতার অধিকারী হলেও সে নিষ্কর্মা না হয়ে পারে না।

আমি এ দাবিটা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে দুটি উদাহরণ পেশ করছি :

১. মাওলানা মুহাম্মাদ আলি ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ যখন নিজেদের স্বাধীনতার থিওরি মহাত্মা গান্ধির হাত তুলে দেন, তখন কি তাঁরা এর দ্বারা কোনো উপকার তুলতে পেরেছিলেন?

২. ডক্টর আনসারিকে যখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, তখন কি তাঁর প্রাণপাত চেষ্টা কোনো সুফল প্রসব করতে পেরেছিল? একইভাবে মাওলানা বরকত উল্লাহ যখন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের বিরোধিতা করে আপন মিশন টিকিয়ে রাখতে পারছিলেন না, তখন রাজা সাহেবের সুরে সুর না মিলিয়ে তাঁর আর কোনো উপায় ছিল?[১১৭]

পাঁচ. আন্দোলনের ব্যবস্থাপনা

এ ছাড়া আন্দোলনের ব্যবস্থাপনায় কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে কাজ চালিয়ে যান। যেমন, ভারতের কতিপয় শিক্ষিত যুবক লাহোর থেকে ইয়াগিস্তান হয়ে কাবুল এসে পৌঁছেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা তুরস্কে গিয়ে তুর্কিবাহিনীতে ভর্তি হয়ে উসমানি খিলাফতের পক্ষে লড়াই করবে। এই যুবকদের কাবুলেই নজরবন্দি

[১১৭] *ব্যক্তিগত ডায়েরি* : ৮-৯৪।

করে ফেলা হয়। অবশ্য পরে তাদের নজরবন্দিমুক্ত করা হয়। আমরা যেখানে থাকতাম, সেখানেই তাদের জায়গা দেওয়া হয়।

আমরা চাচ্ছিলাম তারা যেন তুর্কি যাওয়ার চিন্তাধারা বাদ দিয়ে কাবুলেই থাকে এবং কাবুল সরকার আমাদের যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, তা ভোগ করে সবাই মিলে দেশের জন্য কাজ করি।

তারা যখন লাহোর থেকে বেরিয়েছিল, তখন কিন্তু সুশৃঙ্খল আর সংঘবদ্ধ একটি দল ছিল; কিন্তু কাবুলে তাদের সঙ্গে কতিপয় পেশোয়ারি যুবক এসে মেলার পর থেকেই তাদের মধ্যে বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এরপর বেকারত্বের অভিশাপ তাদের ও পেশোয়ারি যুবকদের মধ্যবর্তী ব্যবধানটা আরও প্রকট করে তোলে। বিষয়টা জানার পর আমিই প্রথম তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রতি মনোযোগ দিই। এ পর্যায়ে আবদুল বারি এম.এ. নামের এক যুবককে তাদের সভাপতি বানিয়ে দিই। যেহেতু আফগানিস্তানের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয়দের একটা শ্রেণি রাজনৈতিক চক্রান্তের অপবাদে বন্দি হয়ে পড়েছিলেন, তাই আমাদের পক্ষেও কাজ চালিয়ে যাওয়া বিপদমুক্ত ছিল না; কিন্তু এ যুবকরা আমাদের কাছে এসে আশ্রয় নেওয়ার পর আমরাও এ ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠি। তাদের ব্যাপারে আমাদের সাবধানতা অবলম্বনের তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা, তারা ছিল সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন আর সুশিক্ষিত। তাদের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ১০ জন এমন ছিল, যারা তিন বছর কলেজে লেখাপড়া করেছে। এ ছাড়া তাদের সঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ আলি কুসুরিও ছিলেন।

ইতিমধ্যে দেওবন্দ থেকেও আমাদের কতিপয় লোক এখানে চলে এসেছিলেন। যাঁদের মধ্যে মাওলানা মানসুর আনসারি (জমিয়তুল আনসারে আমরা একই সঙ্গে কর্মরত ছিলাম) ও মাওলানা সাইফুর রাহমান (যিনি দিল্লি থেকে ইয়াগিস্তানের দুর্গম পথ ধরে কাবুল এসে পৌঁছেছিলেন) উল্লেখযোগ্য। মাওলানা সাইফুর রাহমান মূলত কান্দাহারি বংশোদ্ভূত এক আফগানি। তাঁর বাপ-দাদারা পরবর্তীকালে পেশোয়ারের কাছেই বসতি স্থাপন করেন। তিনি রাশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির কাছে হাদিস পড়েন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ টুংকের এক মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। শেষদিকে দিল্লিস্থ ফতেহপুর মাদরাসার প্রধান শিক্ষকের আসনে আসীন ছিলেন। শায়খুল হিন্দের পরামর্শ অনুযায়ী ইয়াগিস্তান হিজরত করে সেখানে হাজি তুরঙ্গজাইয়ের সঙ্গে মিলে বেশ কিছুদিন জিহাদ চালিয়ে যান। এরপর কাবুলে চলে আসেন। তাঁর উকিল আহলে হাদিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মাওলানা বাশির আহমাদও (যিনি হিজরত করে মুজাহিদিনের জামাআতে অবস্থান করছিলেন, যুবকদের হিজরতের প্রতি উৎসাহী করতে যাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য, তিনিও) নিজ দলের কর্মতৎপরতা চালাতে আফগান ভূখণ্ডকে বেছে নেন। তাঁদের নিয়ে

আমরা একটা জামাআত গড়ে তুলেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম 'জুনদুল্লাহ'। জুনদুল্লাহ ছিল মূলত স্যালভেশন আর্মির ধাঁচের এক সেনাসংগঠন। এই সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আমরা যুবকদের মধ্যে লাহোরি-পেশোয়ারি ইত্যাকার মতানৈক্য দূর করতে এবং তাদের মন-মগজ থেকে অহংকারের বিষাক্ত বীজ বের করতে পেরেছিলাম।

হাজি তুরঙ্গাজাই সীমান্তের কাছাকাছি চলে এলে আফগান মুজাহিদদের একটি দল তৈরি হয়ে যায়। হাজি তুরঙ্গাজাই ছিলেন শায়খুল হিন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। তাঁর সাথিদের বিরাট একটা অংশ ছিল দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাই তাঁর উকিল সাথিরা কাবুল এসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'জুনদুল্লায়' যোগ দেন।

ছয়. মিশনের ব্যর্থতা এবং আফগানশাহির বিশ্বাসঘাতকতা

ভারতীয় মিশন তাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেনি। আফগান বাদশাহ তাঁর দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছিলেন না। ইংরেজদের কাছে তাঁর আশা-ভরসা ছিল অনেক। বিপরীতে মিশনের লোকেরাও তাঁকে সান্ত্বনামূলক কোনো কর্মসূচি দিতে পারছিলেন না। সর্বোপরি মিশনের সদস্য নির্বাচন ছিল মারাত্মক রকমের হতাশাব্যঞ্জক।

আমাদের ধারণা, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের ধ্যানধারণা সম্পর্কে তাঁকে স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি। এ জন্যই আমরা যারা এ ব্যাপারে ইঙ্গিতে-ইশারায় কিছু জানাতে পারছিলাম, তারাই নির্দ্বিধায় তাঁর অফিসে যাতায়াত করতে পারছিলাম। সরকার মিশনের লোকগুলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর আগে আমাদের তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দেন। আমরা এই সাক্ষাতে তাঁর ধ্যানধারণার মোড় ঘোরানোর যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছিলাম। তবে ইতিপূর্বে মিশনের লোকদের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হতো, তা সরাসরি ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ভাইসরয়ের কাছে পাচার হয়ে যেত। বিনিময়ে ইংরেজরা বাদশাহকে প্রচুর অর্থসাহায্য দিত। তবে নায়িবে সুলতান নাসরুল্লাহর সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা হতো, তা পাচার হতো না। তিনি মূলত এসব আলোচনার নির্যাসের মাধ্যমেই আফগানিস্তানের উন্নতির পথ খুঁজতেন। আর এ ধরনেরই কাজের একটা ছিল ভারতের প্রবাসী সরকারব্যবস্থা।

সাত. রাশিয়ান মিশন এবং হিন্দুত্ববাদী মানসিকতার উদাহরণ

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আর মাওলানা বরকত উল্লাহ মিলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটা রূপরেখা তৈরি করেন। এতে কয়েকজন জার্মান আর তুর্কি কর্মকর্তাও ছিলেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাশিয়া সরকারের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে চাইলে নায়িবে সুলতান প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানান। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাঁর কাছে কোনো

ভারতীয় ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল ওই যুবকরা এ কাজ আনজাম দিক; কিন্তু ওরা সরাসরি আমাদের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল না বিধায় কথাবার্তা আমাদের সঙ্গে শুরু হয়। আলোচনার শুরুর দিকে একজন আফগান অফিসারও নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতেন। আমাদের পরস্পর আলোচনা থেকে তিনি এমন কিছু বিষয়ে অবহিত হন, যা ইতিপূর্বে তাদের কাছে তুলে ধরা হয়নি। আমাদের সঙ্গে ওই যুবকরা ছাড়া দুই শিখ যুবকও ছিল। এরা পাসপোর্ট ছাড়াই আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। এদের প্রথমে পুলিশ হিফাজতে নেওয়া হয়। পরে তাদের উদ্দেশ্য জেনে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়। মুক্তির পর তারা আমাদের কাছে বসবাস করতে থাকে।

রাজার মত ছিল, এদের মধ্য থেকে মথুরা সিং নামের যুবককে রুশ মিশনে পাঠানো হোক। মাওলানা বরকত উল্লাহ এটা মেনে নিলে এ ব্যাপারে আর কারও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়নি। আমরা বিষয়টি সিদ্ধান্ত আকারেই অবহিত হই। আমরা যেহেতু মথুরা সিংয়ের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবহিত, তাই এতে সামান্য সংশোধনী এনে বলি—মথুরা সিংয়ের সঙ্গে একজন মুসলিম যুবককেও পাঠানো হোক।

রাজা আমাদের এ প্রস্তাবকে উদারচিত্তে মেনে নিতে পারেননি। ফলে এ নিয়ে তাঁর ও আমাদের বিতর্ক শুরু হয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল, ইতিহাস যেন এ কথা না বলে যে, আমাদের কাজ কেবল চিন্তাভাবনাতেই সীমিত ছিল; বরং এ কথাও যেন বলে যে, আমরাও কার্যক্ষেত্রে ছিলাম। বিপ্লবে মুসলিমদেরও অংশীদারত্ব ছিল; কিন্তু রাজার ব্যক্তিত্ব বিষয়টিকে এমনই জটিল করে তুলে যে, শেষপর্যন্ত বিষয়টি নায়িবে সুলতানের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত গড়ায়। একপর্যায়ে তুর্কি আর জার্মানিরাও এতে জড়িয়ে পড়ে। অবশেষে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে তারা কিন্তু আমাদের পক্ষেই রায় দেন। রাজা সাহেবের সঙ্গে এটাই ছিল আমাদের প্রথম তিক্ত বাদানুবাদ। এরপর অবশ্য এমন কোনো বাদানুবাদের মুখোমুখি হতে হয়নি।

আট. সাংগঠনিক বরকত থেকে মুসলিমদের বঞ্চিতি

আমরা যুবদলের সভাপতির কাছে এ কাজের জন্য চৌকস একজন সদস্য তলব করলে তারা পরামর্শের ভিত্তিতে খুশি মুহাম্মাদ নামের এক যুবককে মনোনীত করেন। যুবকটি ছিল জলন্দরের অধিবাসী। লাহোরের মেডিক্যাল কলেজে সে দুই বছরের অধিক শিক্ষালাভ করে। ধর্মীয় আবেগের দিক থেকেও ছিল উদ্দীপ্ত এবং দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত। সবসময় তার মুখে হাসি লেগেই থাকত। এ ছাড়া সে ছিল যুবকদের হিজরত আন্দোলনের নেতা। মিশনে তার নাম মির্জা মুহাম্মাদ আলি হবে বলে গৃহীত হয়। শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিম যখন কাবুল ছাড়তে বাধ্য হন, তখন থেকে এই মির্জা মুহাম্মাদ আলিকে আমি নিত্যসহচর ও বন্ধু বানিয়ে নিই। আফগানিস্তান ও রাশিয়ায়

আমার যেটুকু সাফল্য রয়েছে বলে স্বীকার করা হয়, এর পেছনে এই মির্জার পরিশ্রম ও সাহসের বিরাট অবদান আছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলে আমাদের দ্বারা এত বড় সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না।

আল্লাহ তাআলা ঐক্যের মধ্যে বিশাল শক্তি রেখেছেন। বিশুদ্ধ ঐক্য এক অনমনীয় শক্তি। প্রবাদ আছে, 'দুটি মন এক হলে পর্বতও গুঁড়িয়ে দিতে পারে।' যদি কোনো আন্দোলনের সকল কর্মকর্তা পরস্পরে এক হয়, তাদের ঐক্যের মূল যদি হয় বিশুদ্ধ, কাজ ও এর উপকারিতা তারা নিজেদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে বণ্টন করলে মাত্র দুইয়ের শক্তিই বিশ্বে ইনকিলাব ঘটাতে পারে। কুরআনুল কারিমে যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা রয়েছে, এর আলোকে কি ছোট্ট একটি জামাআতও তৈরি হতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে; কিন্তু তাদের এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনার সময় কোথায়? বিরুদ্ধবাদীদের প্রোপাগান্ডা আজ তাদের কোনো কাজের উপযোগী রাখেনি।

কাবুল থেকে সফরের মাত্র কয়েক দিন আগে মির্জা মুহাম্মাদ আলি রাশিয়ায় বিপ্লবী অভিযানের সদস্য বনে যান। এরপর তাঁর সঙ্গে আমাদের আর অংশীদারত্ব থাকেনি। তারপর যা ছিল তা শুধু বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা।

নয়. অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্ব

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ মথুরা সিংয়ের ভ্রমণব্যয় নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে দেন। আমরা মনে করেছিলাম তিনি পুরো মিশনের ব্যয়ভার বহন করবেন; আর নাহয় আফগান সরকার এ ব্যয় নির্বাহ করবে; কিন্তু আসলে এর কোনোটিই হয়নি। আমাদের সারাটা জীবন তো এভাবেই কেটে গেছে যে, টাকাপয়সার প্রতি আদৌ কোনো খেয়াল করা হয়নি। প্রয়োজনের সময় যেকোনোভাবেই সেটা সমাধা হয়ে গেছে। এর কারণ, আল্লাহর ওপর ছিল আমাদের সীমাহীন আস্থা ও ভরসা। এই আল্লাহ-ভরসাকেই আমরা আমাদের জীবনের উজ্জ্বলতর দিক হিসেবে বিবেচনা করতাম। কাবুলের সফরটাও এভাবেই হয়।

যখন কান্দাহারে এসে পৌঁছাই, তখন আমাদের হাতে ছিল মাত্র এক পাউন্ড; অথচ সংখ্যায় ছিলাম চারজন। নায়িবে সুলতান আমাদের সফরের ব্যয়ভার বহন করে নিলেও আমরা যে একেবারেই রিক্তহস্ত, সেটা তিনি জানতেন না। কাবুল পৌঁছার এক মাসের মধ্যেই আমাদের হাত সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে পড়ে। ফলে আমরা যে অতিরিক্ত পোশাক ও আরামের বস্তু কিনেছিলাম, সেগুলো বিক্রি করি। তখন হিন্দুস্থান থেকে আমাদের এক বন্ধু কিছু অর্থ পাঠান; কিন্তু সেগুলো হিন্দুস্থান থেকে নতুন আগত লোকদের প্রয়োজন মেটাতেই শেষ হয়ে যায়।

আমি শুরু থেকেই শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিমের সঙ্গে খানায় শরিক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা তাঁর কাছে অন্য কোনোপ্রকার সাহায্য চাইতে পারছিলাম না। কারণ, তিনি মনে করছিলেন আমরা আমাদের মিশন পরিচালনার জন্য হিন্দুস্থান থেকে পর্যাপ্ত টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমি তাঁর সেই সুধারণাটা ভাঙতে চাচ্ছিলাম না; কিন্তু এখন তো মির্জা মুহাম্মাদের যাতায়াতখরচ ও মিশনব্যয় নির্বাহ করতে হয়। তাই অগত্যা শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিমের কাছে টাকা চাইতে বাধ্য হয়ে পড়ি; কিন্তু ওই উদারপ্রাণ ব্যক্তি প্রয়োজনের মুহূর্তে টাকা দিতে অস্বীকার করে বসেন। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর সমুদয় টাকাপয়সা ওই কাজেই ব্যয়িত হয়; কিন্তু বিশেষ এই মুহূর্তে যখন টাকার প্রয়োজন ছিল অপরিসীম, তখন কিন্তু তাঁর থেকে এ ভুলটা হয়ে যায়।

তাঁর আরেক সাথির নাম ছিল মুহাম্মাদ আলি। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আমরা তাঁর পরিচয় করিয়ে দিই। তিনি কিন্তু আমাদের মিশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। বিশেষ কোনো কাজে পরামর্শ করতে হলে শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিমের ওপরই আমাদের আস্থা ছিল। তবে তিনিও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে আমাদের সহযোগী হয়ে থাকতেন। এ মুহূর্তে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের কষ্টের কথা তাঁর কাছে খুলে বললে তিনি খুবই প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং নিজের আগাম দুই মাসের বেতন উসুল করে আমাদের হাতে তুলে দেন। আমরা তখন নীরবে আল্লাহর অপার মহিমা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। আমরা মাওলানা মুহাম্মাদ আলির কাছে নিতান্ত কৃতজ্ঞ। যেভাবে পরবর্তীকালে শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিমের যাবতীয় সম্পদ আমাদের কাজে ব্যয়িত হয়েছিল, অনুরূপ মাওলানা মুহাম্মাদ আলির যাবতীয় উপার্জনও আমাদের কাজেই খরচ হয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদ্বয়কে অপরিসীম বদলা দান করুন।

বলতে চেয়েছিলাম, রাজনৈতিক কাজ শুধু আদর্শিক পুঁজি আর আবেগ দিয়ে হয় না। এর জন্য সদা প্রস্তুত একদল কর্মীবাহিনীর মতো একটা ফান্ড থাকাও অপরিহার্য। একইভাবে দলের কর্মীদের মধ্যে কর্মদক্ষতা থাকাও জরুরি। শুধু আবেগ থাকলেই চলে না। কেননা, আবেগ অনেক সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

যাইহোক, হিন্দুস্থানের মুসলিমরা এই জানবাজ বিপ্লবীদের যতই কৃতজ্ঞতা আদায় করুক না কেন কোনো কৃতজ্ঞতাই তাঁদের কুরবানির জন্য যথেষ্ট হবে না। আমরা যখন একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় তাঁদের কল্যাণকামনায় বিপ্লবসাধনের উদ্দেশ্যে কাবুল এসে কাজ শুরু করেছিলাম, তখন তাঁরা উত্তম কর্মবীরেরই পরিচয়ই দিয়েছেন। অর্থ যা লেগেছিল, তা ছিল মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ আলির। আমাদের ধারণাতে জাতির জন্য এই মহান ব্যক্তিদ্বয়ের নাম স্বর্ণফলকে খোদাই করে রাখা চাই এবং সর্বদা তাঁদের মঙ্গলের জন্য দুআ করা চাই।

দশ. হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার একটি উদাহরণ

মিশন রওনা হওয়ার আগেই আমরা জার্মানির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে দিই। এ ব্যাপারে বন্ধুবর আবদুল বারি এম.এ.-এর সঙ্গ আমাদের প্রচুর কাজে আসে। রাজা মহেন্দ্র চাচ্ছিলেন তাঁরা (জার্মানির সদস্যরা) অন্য কোনো হিন্দুস্থানির সঙ্গে যোগাযোগ না রাখুক। আমাদের যোগাযোগের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে তিনি আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্তির আহ্বান জানান। তিনি মনে করেছিলেন আমরা নিজেদের পরিধি ত্যাগ করে এতে অংশগ্রহণে রাজি হব না। কেননা, এতে অংশগ্রহণের যে পদ্ধতি রাখা হয়েছিল তা ছিল, রাজা মহেন্দ্রের নামে শপথ করতে হবে। আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুধু শপথের বিধানটা পরিবর্তন করে সানন্দে তাতে শামিল হয়ে যাই। এরপর থেকে রাজার পক্ষে হিন্দুস্থানের ব্যাপারে কোনো আলোচনায় আমাদের বাইরে রাখার সুযোগ থাকেনি। শুরুতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্য ছিল মাত্র তিনজন। আমির আমানুল্লাহ খানের যুগে আফগানযুদ্ধের পর সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এতে জামাআতে মুজাহিদিনের উকিল মাওলানা বাশির আহমাদের অন্তর্ভুক্তি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজার ভালোর দিকটা ছিল বেশি; কিন্তু এরপরও ব্যক্তিগত একনায়কসুলভ আচার-ব্যবহার ছিল উৎকটভাবে দৃশ্যমান। ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিলিত হলে তিনি তাদের ভাষায়ই বক্তব্য রাখতেন। তখন গণতন্ত্রের ওপর সারগর্ব লেকচার দিয়ে ফেলতেন; কিন্তু হিন্দুস্থানি কাজকর্মে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া তাঁর খাসলত নগ্নভাবে ধরা পড়ত। আমরা অত্যন্ত সূক্ষ্মচালে তাঁকে বার বার আহত করতে পারি। ভারতীয় জনগণ যাঁদের ওপর দায়িত্ব দেয়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিজেদের ক্ষমতার বাইরে হলেও তাঁদের ওপর চার্জ করে বসত। এ ছাড়া রাজা তাঁর নিজের তৈরি কানুনের মাধ্যমে নিজেকে লাইফ-প্রেসিডেন্ট বানিয়ে নিয়েছিলেন।

এগারো. হিন্দুস্থানি যুবকদের কর্মপরাকাষ্ঠা

রাজা যখন কাবুল ত্যাগ করেন, তখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য তিনটি কেন্দ্র প্রস্তাবিত ছিল। কাবুল, নেপাল ও উত্তরপূর্ব বাংলা। কাবুল কেন্দ্রের কাজ আমাদের ওপর অর্পণ করা হয়। কেন্দ্রটি উদ্‌বোধনের পরই আমরা 'জুনদুল্লাহ'-সহ সকল কর্মীকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে জুড়ে নিই। আমির আমানুল্লাহ খান প্রশাসনের অধিকারী হওয়ার পর আমাদেরকেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মকর্তা-জ্ঞানে সরকারি কাজকর্ম তথা যুদ্ধ-চুক্তি ইত্যাকার সব ব্যাপারে আলোচনা করতেন। যখন যুদ্ধের ফয়সালা হয় সেই বিশেষ সভায় আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। তা ছাড়া

যুদ্ধ চলাকালেও আমার ওপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যুদ্ধ শেষে তিনি আমাদের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। সে সময় আমাদের সাথিরা যে গুরুদায়িত্ব আনজাম দেন, তা সোনালি অক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। যদিও কিছুকাল যাবৎ সে বীরত্বের কথা চেপে যাওয়াই ছিল সময়ের দাবি। যুদ্ধ সমাপ্তির পর রাজা পুনরায় কাবুলে চলে আসেন। তখন আমির আমানুল্লাহ তাঁর সম্মানে রাজকীয় যে অভ্যর্থনা দেন, রাজা মহেন্দ্র জীবনে তা কল্পনাও করেননি। এরপর থেকে তিনি আমাদের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করছিলেন।

যে বছর আমরা কাবুল থেকে বিদায় নিই, ওই বছর আমির সাহেব কাবুলে থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে আমাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এ ব্যাপারে তিনি অনেকখানি বাধ্যও ছিলেন। কারণ, ততদিনে বিশ্বপরিস্থিতি অনেকটা পরিবর্তন হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকেও বিশ্বরাজনীতির নিয়মনীতি মেনে চলতে হচ্ছিল। আমরা তাঁর এই নিষেধ একটা শর্তে মেনে নিই; কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখতে পাই আমাদের এককালীন শুভাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে আমাদের এই শর্ত পালন সম্ভব হবে না, তখন নিজেরাই সেখান থেকে বিদায় হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই। ইচ্ছা করলে আমি আদর্শিক অবস্থানে সামান্য হেরফের ঘটিয়ে সেখানেই সুখে দিনাতিপাত করতে পারতাম; কিন্তু আমার যুবক সাথিদের (যাঁদের ত্যাগ আর কুরবানি আমাদের সম্মান আর শ্রদ্ধালাভের কারণ বনেছিল, তাদের) জীবনটা বরবাদ হয়ে যেত। তাই কাবুল থেকে বিদায় নেওয়াকেই প্রয়োজনীয় মনে করি। তখনকার অবস্থা ছিল, আমরা নিশ্চিন্তে পরস্পর একত্রিত হতে পারছিলাম না। তবে আশা করি কেউ আর এ অপবাদ দিতে পারবে না যে, অমুক তাঁর জীবনের সুখের বিনিময়ে তারই সাথিদের জীবনকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।

বারো. রুশ মিশনের পরিণতি

ডাক্তার মথুরা সিং ও মির্জা মুহাম্মাদ আলিকে রুশ মিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের সঙ্গে দুজন সেবকও ছিল। মুহাম্মাদ আলির সেবক ছিল এক আফগানি আর মথুরা সিংয়ের ছিল কাবুলি এক শিখ। মিশনটি তিরমিজ থেকে তাশখন্দ গিয়ে পৌঁছাতে না-পৌঁছাতেই গভর্নর এই মিশনের সবকিছু ফাঁস করে দেয়। কারণ, গভর্নর তখন অত্যন্ত পেরেশান ছিল। সে এই মিশনের ভেদ প্রকাশের মাধ্যমে ব্রিটিশের কাছ থেকে বেশ কিছু ফায়দা অর্জন করতে চায়।

ব্রিটিশ সরকার এ মিশনকে একটা নকল মিশন হিসেবেই বিবেচনা করে; কিন্তু রুশরা জোর দিয়ে বোঝাতে চাইছিল—এটাই প্রকৃত মিশন। তাদের ভয় ছিল, আফগান সরকার

তাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। ব্রিটিশরা কিন্তু তাদের ভারতীয় গোয়েন্দাদের মাধ্যমে মিশনের লোকগুলোর আসল পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হতে পারছিল না। শেষপর্যন্ত 'রুশ জার' মিশনের লোকদের বন্দির নির্দেশ দেন; কিন্তু বিপ্লবীরা তাশখন্দের গভর্নরের মধ্যস্থতায় এ গ্রেপ্তারি এড়াতে সক্ষম হন।

এতকিছুর পরও মিশনটিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলা যায় না। কারণ, এঁরা রুশ-ব্রিটিশ ঐক্যের মধ্যে অনেকটা ফাটল ধরাতে সক্ষম হন; যে ফাটল জোড়া লাগাতে খোদ লর্ড কিচেনারকে হাতের সকল কাজ ফেলে দিয়ে রাশিয়ায় এসে অনেক দিন কাজ করতে হয়।

রাশিয়ায় পাঠানো বিপ্লবীরা 'সোনার পীড়ি' নামে একটা লিফলেট ছাপিয়েছিল। স্বর্ণনির্মিত একটা ফলকে খোদাই করে এটা তাশখন্দ গভর্নরের নামে লেখা হয়। এর মধ্যে মিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু লেখা ছিল।

মিশন কাবুলে এসে পৌঁছালে নায়িবে সুলতান মথুরা সিং ও মির্জা মুহাম্মাদ আলিকে ডেকে পাঠান। তিনি তাঁদের কাছে সফরের অবস্থা জানতে চান। মুহাম্মাদ আলি এই সফরে যা কিছু ঘটেছিল তা সংক্ষেপে ডায়েরি করে রেখেছিলেন। জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি সেটা বের করে তাঁর হাতে তুলে দেন। এ ছাড়া নিজেও যথাসম্ভব সবকিছু খোলাসা করে বর্ণনা করেন। এরপর থেকে নায়িবে সুলতান আমাদের অধিকতর গুরুত্ব দিতে থাকেন। তিনি তাদের বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে বলেন, 'আমরা মাওলানা উবায়দুল্লাহর কথা না মানলে রাজা মহেন্দ্রের পাঠানো লোকটি একটা শব্দও আমাদের বলত না।'

তেরো. ব্রিটিশের ধোঁকাবাজির নমুনা

আমরা উলামায়ে দেওবন্দের শিক্ষা ও দীক্ষায় জীবন গড়েছিলাম। দেওবন্দিরা মূলত হানাফি ফিকহের অনুসারী; কিন্তু ভ্রান্ত মতবাদের প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন ইসমাইল শহিদ রাহ.-এর পদাঙ্ক অনুসারী। এ ব্যাপারে ছিলেন এতটাই কট্টর যে, ইসমাইল শহিদ ছাড়া কারও অনুসরণকে তাঁরা মেনে নিতেন না। সিন্ধুতে আমি ২০ বছর কাটিয়েছি। সেখানে আমরা বুজুর্গদের সবাইকেই দেওবন্দিদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে দেখেছি। যদিও দেওবন্দি আলিমদের সঙ্গে তাদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমাদের মুরব্বিরা ছাড়া সিন্ধুতেই পির ও মৌলবিদের আরেকটা বিরাট জামাআত ছিল, যাঁদের সিংহভাগের সম্পর্ক ছিল কান্দাহারের পিরদের সঙ্গে। ব্রিটিশ সরকার এদের থেকে কিছু লোককে নির্বাচন করে। এই কান্দাহারি পিরদেরই এক ডাকসাইটে পির একদিন কাবুলে এসে নায়িবে সুলতানকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, 'মাওলানা উবায়দুল্লাহ মূলত ব্রিটিশের চর! তার ইচ্ছা হলো আফগানিস্তানের লোকগুলোকে ধর্মভ্রষ্ট করা এবং আফগান সরকারের যাবতীয় গোপন বিষয় ব্রিটিশের কাছে ফাঁস করে দেওয়া।'

নায়িবে সুলতানের সেক্রেটারি বিষয়টা আমাদের জানালে আমরা বলি 'আপনাদের কজন চৌকস গোয়েন্দাকে আমাদের পেছনে লাগিয়ে দিন; তারা আমাদের অপরাধী বলে রিপোর্ট দিলে আপনারা আমাদের কঠিনতম শাস্তি দেবেন। এমনকি আমার ব্যাপারেও কোনো রিপোর্ট এলে নির্দ্বিধায় আমার বুকে তোপ চালিয়ে দেবেন। অন্যথায় আমি আজ যেখান থেকে কাজের বিরতি টানছি, সেখান থেকেই কাজ শুরু করব। আর এ অন্তর্বর্তীকালীন সময়টুকু ছুটি হিসেবেই গণ্য করব।'

আমার প্রস্তাবটা তাঁর খুবই মনঃপূত হয়। তিনি তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেন। পরে আমরা জানতে পারি গোয়েন্দারা নাকি রিপোর্ট করে, 'এই কান্দাহারি পিরের আমলনামা পরিষ্কার নয়।'

এ ঘটনার পর থেকে আমরা তাঁর দরবারে আরও বিশ্বস্ত প্রমাণিত হই এবং আমাদের কাজের পথের অনেক বাধাও অপসারিত হয়।

চৌদ্দ. জাপানি ও ইসতাম্বুলি মিশন

প্রথম মিশনের সাফল্য প্রত্যক্ষ করে রাজা মহেন্দ্র আরও দুটি মিশন পাঠান। আমাদের ইচ্ছানুযায়ী পাঠানো ইসতাম্বুলি মিশনটি হচ্ছে এ দুটির একটি। এই মিশনের সদস্য ছিলেন আমাদেরই সহকর্মী আবদুল বারি বি.এ. ও ডাক্তার সুজা উল্লাহ। তাঁরা ইরান হয়ে ইসতাম্বুলে প্রবেশের কথা ছিল। অপর মিশন পাঠানো হয়েছিল মাওলানা বরকত উল্লাহর পরামর্শক্রমে। সে মিশনের সদস্য ছিলেন আবদুল কাদির বি.এ. এবং ডাক্তার মথুরা সিং। তাঁরা রাশিয়া হয়ে জাপান যাওয়ার কথা ছিল। জার্মান প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন প্রথম কাবুল ফিরে আসেন। আমির সাহেব তাঁকে পুনরায় সেখানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি যাওয়ার আগে আমার নামে ৩০০ পাউন্ড রেখে যান। রাজা মহেন্দ্র বলেন, 'এগুলো আপনার কাছেই রেখে দিন।' পরে রাজা ও মাওলানা বরকত উল্লাহ এ থেকে ১০০ পাউন্ড নিজেদের পোশাক তৈরির জন্য নিয়ে যান। বাকি ২০০ পাউন্ড মাওলানা শায়খ ইবরাহিমের কাছে আমানত রাখা হয়।

শায়খ ইবরাহিম, মাওলানা মুহাম্মাদ আলি এবং আমার ভাতিজা আজিজ আহমাদ যে ঘরে থাকতেন, ঘটনাচক্রে ওই ঘরে ডাকাতের একটা দল আক্রমণ চালিয়ে ওই ২০০ পাউন্ডসহ তাঁদের জামাকাপড় নিয়ে যায়। আমার মন বলছিল, রাজা মহেন্দ্র হয়তো এই ঘটনাকে আমাদের টাকা হজমের একটা ফন্দি মনে করবেন। তাই যখন মিশন পাঠানোর প্রশ্ন এল, আমি মুহাজিরদের নেতা মাওলানা বাশির আহমাদের কাছ থেকে ১০০ পাউন্ড কর্জ করে প্রতিনিধিদল পাঠাই। বাশির আহমাদের ওই দয়া আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। এটা নামেমাত্র কর্জ ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে মির্জা

মুহাম্মাদ আলি তা পরিশোধ করেন।

অপরদিকে মিশন পাঠানোর আগেই সরকারি তদন্তে ডাকাতির বিষয়টি প্রমাণিত হয়। যদিও আমরা এর কানাকড়িও ফেরত পাইনি। এরপর রাজা সাহেবের পরামর্শে আমরা সর্দার নায়িবে সালতানাতের ওখানে উপস্থিত হই এবং আলোচনার একপর্যায়ে আমাদের পুঁজি চুরি যাওয়ার কথা বলার পাশাপাশি আমাদের ১০০ পাউন্ডের প্রয়োজনের কথাটাও তাঁকে জানিয়ে দিই। সর্দার সাহেব নিজ বদান্যতায় আমাদের এটা প্রদানের আশ্বাস দেন। এরপর বিকেলের দিকে তিনি নিজেই ১০০ পাউন্ড নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এভাবে অপর মিশনটিও পাঠানো হয়।

পনেরো. মিশন দুটির পরিণতি

দ্বিতীয় মিশনটি রাশিয়া হয়ে তাদের লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে গেলে রুশ গোয়েন্দারা তাদের গ্রেপ্তার করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। ইসতাম্বুলি মিশনের সদস্যদেরকে খোদ ইংরেজ পুলিশরাই ইরানে গ্রেপ্তার করে। উভয় মিশনের গ্রেপ্তারকৃত চার সদস্যকেই লাহোরে আনা হয়। ডাক্তার মথুরা সিং যেহেতু আগেই একটা বোমাবাজির মামলায় পলাতক আসামী হিসেবে দোষী ছিলেন, তাই ইংরেজরা তাঁকে ফাঁসি দিয়ে দেয়। বাকি সদস্যত্রয়কে নজরবন্দি করে রাখা হয়। এ তিনজনের মধ্যে আবদুল বারি জওহর—যিনি দীর্ঘদিন আমাদের এখানে ছিলেন এবং যুবক মুজাহিদদের নেতা হিসেবে বরিত ছিলেন, তাঁকে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্যার মুহাম্মাদ শফির মাধ্যমে বলে-কয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার ব্যাপারে রাজি করানো হয়। এর শর্তস্বরূপ তিনি জামাআতে মুজাহিদিন ও জুনদুল্লাহ সম্পর্কে যা জানতেন, সবকিছু সবিস্তারে ব্রিটিশদের লিখে জানিয়ে দেন। বাকি দুই সদস্যও এ ব্যাপারে সত্যায়ন করে নিজেদের মুক্ত করিয়ে নেন।

ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘদিন থেকে রাশিয়ায় পাঠানো মিশনের খবরাদি জানার ব্যাপারে উন্মুখ ছিল; এবার তারা ঘরে বসে শান্তশিষ্টভাবে মিশনের বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যায়।

ষোলো. কাবুলস্থ কেন্দ্রীয় নেতাদের অবস্থা

সংবাদগুলো পাওয়ার পর ইংরেজরা মুজাহিদদের কাবুলে অবস্থানকে কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারেনি। তারা কাবুল সরকারের কাছে এ ব্যাপারে জোর প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এই প্রতিবাদের প্রথম ফল এভাবেই প্রকাশ পায় যে, শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিম ও মৌলবি মুহাম্মাদ আলিকে হাবিবিয়া স্কুলের শিক্ষকতার পদ থেকে পদচ্যুত করা হয়। ওই স্কুলের ছাত্র আমার ভাতিজা আজিজ আহমাদকেও সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয়। আজ আজিজ আহমাদের অনেক সহপাঠী কেউ কাউন্সিলর, পার্লামেন্ট সদস্য,

প্রতিমন্ত্রী, আবার কেউ সেনাবাহিনীর জেনারেল। অথচ আজিজ তাদের চেয়ে মেধা বা যোগ্যতা কোনো দিক দিয়েই পিছিয়ে ছিল না। আজ তারা গাড়ি দৌড়াচ্ছে আর আজিজ খালি পায়ে ঘুরে মরছে। আমরা আমাদের হুকুমতকে নষ্ট করে এভাবেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলোকে মেরে ফেলেছি।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিম ও মৌলবি মুহাম্মাদ আলি সিদ্ধান্ত নেন—তাঁরা ইয়াগিস্তান চলে যাবেন। পদচ্যুত হওয়ার পর তাঁরা প্রথমে মুজাহিদদের তত্ত্বাবধানে থাকেন। পরে শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিম হাজি তুরঙ্গাজাইর ওখানে চলে যান। সেখানে তিনি পশতু ভাষা শিখে লোকদের মধ্যে কুরআনের তালিম প্রচারে ব্রতী হন। পরবর্তীকালে আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করেন। রাস্তায় কোনো এক গ্রামে তিনি ইনতিকাল করেন। ধারণা করা হয়, ইয়াগিস্তানের কোনো এক ডাকাত সহযাত্রীর বেশে তাঁর সঙ্গ ধরেছিল, পরে সুযোগ বুঝে হত্যা করে চলে যায়। তবে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মরহুম তাঁর এক সাথির কাছে একখানা চিঠি রেখে যান। সেটি আমি নিজে পড়েছি। পত্রপাঠে অনুধাবন করতে পেরেছি, শায়খ যেন বলতে চেয়েছেন, 'আমার হত্যাকারী মূলত কোনো ডাকাত নয়; সে ইংরেজদেরই চর!' .

শায়খ ইবরাহিমের এ সফরটা ছিল রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর যুগে। মৌলবি মুহাম্মাদ আলি কুসুরি কিছুদিন বিপ্লবীদের তত্ত্বাবধানে থাকার পর যেকোনোভাবেই হোক, স্যার আবদুল কাইয়ুমের সুপারিশ নিয়ে হিন্দুস্থানে চলে যান। তাঁর স্বীকারোক্তি দ্বারাও ইংরেজরা তথ্য উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট লাভবান হয়।

সতেরো. রেশমি রুমালের সংক্ষিপ্ত পরিণতি

তাঁরা ইয়াগিস্তান যাওয়ার পথে তাঁদের সঙ্গে হিন্দুস্থানেও একটি মিশন পাঠানো হয়। আমরা কাবুল পৌঁছার পর দুই সাথিকে হিন্দুস্থানে পাঠাই। তাঁদের সঙ্গে চিঠিপত্রের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বার্তাও ছিল। তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব আদায় করছিলেন। রাজা মহেন্দ্র তখন ইচ্ছা করলেন, হিন্দুস্থানে অবস্থানরত তাঁর ভাইয়ের কাছে তাঁদের পৌঁছার খবর পৌঁছুক এবং এরপর এঁদেরই মাধ্যমে তিনি তাঁদের ভালোমন্দের খবরাখবর জানুন। তাঁর এই মানসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার ভাতিজাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করি। সে ওখান থেকে শায়খ ইবরাহিমের সঙ্গে ইয়াগিস্তান যায় এবং সেখান থেকে গোপনে উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রাজা সাহেবের চিঠি পৌঁছে দেয়। এরপর সেখানকার সংবাদ নিয়ে দুই মাস পর আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়; কিন্তু তার আগমনের আগেই রাজা মহেন্দ্র কাবুল ছেড়ে চলে যান। তিনি তখন মাজার-ই-শরিফে অবস্থানরত। আমরা সেখানে তাঁর কাছে চিঠিটা পৌঁছে দিই।

আমাদের এ বদান্যতায় তিনি যারপরনাই প্রীত হন। এরপর থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে আপন ভাইয়ের মতো আচরণ করতে থাকেন। নিজের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতেও আমাদের পরামর্শ চাইতেন। এমনকি আমাদের খাতিরে নিজের অনেক সিদ্ধান্ত বদলেও নিতেন। এ মিশনের একটি অংশে সেই নথি-চিঠিগুলোও ছিল, যা আমি ও মাওলানা মানসুর শায়খুল হিন্দের কাছে রিপোর্ট হিসেবে লিখি।

আমরা এ কাজের জন্য যুবকদের মধ্য থেকে এক নওমুসলিম যুবককে নির্বাচন করি। তার পরনের কাপড়ে এই রিপোর্ট লেখা হয়। বলা হয়, সে এটা শায়খ আবদুর রাহিমের কাছে পৌঁছে দেবে। এরপর তিনি এটা নিয়ে হজের সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে মক্কায় গিয়ে শায়খুল হিন্দের হাতে পৌঁছে দেবেন; কিন্তু আল্লাহর এই বান্দা চিঠিটা যথাস্থানে না দিয়ে আল্লাহ নাওয়াজ খানের পিতা খান বাহাদুর হক নাওয়াজ খানের কাছে দিয়ে দেন! আর তিনি তা সরাসরি স্যার মাইকেল এডওয়ার্ডের হাত তুলে দেন।[১১৮]

এরপর কী হয়েছিল তা সবারই জানা। আমরা প্রথমে ব্রিটিশের এবংবিধ আচরণে হতবাক হয়ে পড়ি। পরে জানতে পারি আমাদের শায়খ শায়খুল হিন্দও মক্কায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবে আমরা এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করি যে, চিঠিটা রাজার হলে আর আমরা সেটা পাঠালে কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের জন্য মারাত্মক হয়ে দেখা দিত। আমরা এ জন্য সন্তুষ্ট যে, রাজা সাহেবের কাজ সুচারুরূপেই সমাধা হয়েছে। যদিও আমাদের কাজটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, আমাদের লোকগুলোই জেল-জুলুম খাটছে। তবে আশা রাখি, আমাদের আল্লাহ তাদের মুক্তির ব্যাপারটি সহজ করে দেবেন।

আঠারো. মৌলবি সাইফুর রাহমানের দুর্বলতা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা

ব্রিটিশ সরকারের জোর প্রতিবাদের মুখে মাওলানা মানসুর আনসারি ও সাইফুর রাহমানকে কাবুল থেকে ইয়াগিস্তান পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জালালাবাদ পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গেই ছিলেন; কিন্তু সেখানে পৌঁছার পর তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ব্রিটিশরা মাওলানা সাইফুরকে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। একপর্যায়ে হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক বিষয় থেকে তাঁর পৃথক থাকতে তাঁর থেকে ওয়াদাও নিয়ে নেয়। এরপর থেকে তিনি মুসতাওফাল মামালিকের (রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী) তত্ত্বাবধানে বসবাস করতে থাকেন। আমির হাবিবুল্লাহর শাসনক্ষমতার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মুসতাওফালের ওখানেই ছিলেন। তখন মুসতাওফার ওপর ব্রিটিশ সরকারের যে খিদমতের চাপ আসত, তাতে তিনি তাকে সহযোগিতা করতেন।

---

[১১৮] আমরা আগেই বলে এসেছি যে, এ ব্যাপারে উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। চিঠিটি ব্রিটিশরা হক নাওয়াজের কাছ থেকে পায়নি; বরং তা শায়খ আবদুর রাহিমের বাসায় হানা দিয়েই উদ্ধার করে।

উনিশ. একটি অতি-গোপন চিঠির ব্যাপারে তাঁর গোয়েন্দাগিরি

ব্রিটিশ সরকার গোপন সূত্রে জানতে পারে শায়খুল হিন্দ আনোয়ার পাশাকে দিয়ে একটি চিঠি লিখিয়ে হিন্দুস্থানে পাঠান এবং চিঠিটি দেওবন্দের কোনো এক বড় আলিমের হিফাজতে আছে। বেশ কটি অভিযান পরিচালনা করেও সেটি উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে শেষপর্যায়ে তারা আমির হাবিবুল্লাহর সাহায্য কামনা করে। মুসতাওফাল মামলিক তখন আফগানিস্তানে অবস্থানরত দেওবন্দের এক সাবেক ছাত্রকে খুঁজে বের করেন। ছাত্রটি শায়খুল হিন্দের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক রাখত। তাকে এ কথা বলে পাঠানো হয়, 'আমির সাহেব তোমাদের সাহায্য করতে চান। আর এ জন্য চিঠিটি তাঁর প্রয়োজন।'

এ ব্যাপারে মাওলানা সাইফুরের জানাশোনা সহায়তা না করলে এ প্রস্তাবই উত্থাপিত হতো না। পত্রধারী মাওলানার নামটাও মাওলানা সাইফুরের কাছ থেকেই জানার কথা। তবে চিঠিটি ধরা না পড়ার কারণ, যার হিফাজতে এটি ছিল, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক লোক। তিনি লোকটার কথা শুনেই তাকে সন্দেহ করে বসেন। তাকে চিঠির ব্যাপারে কোনোই তথ্য দেননি। পরে নানা আশঙ্কায় তা তিনি জ্বালিয়ে দেন।

বিশ. হাবিবুল্লাহর হত্যা এবং আমাদের বিপদের সমাপ্তি

মাওলানা মানসুর আনসারি কাবুল থেকে ইয়াগিস্তান চলে গিয়ে দীর্ঘদিন সেখানেই বসবাস করেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর ১৩২৫ হিজরির ১ রমজান আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আমাদের ২০-২৫ জনকে এমন একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়, যেখানে বেশির চেয়ে বেশি ১০ জনের সংকুলান হবে। দেখাশোনার দায়িত্বরত অফিসার ছিলেন নাদির খান। আমরা জায়গার বিষয়টি তার গোচরে আনলে তিনি বসবাসের জন্য সরকারি একটি পার্কে শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ইদুল ফিতরের দিন তিনি নিজে আমাদের শিবিরে এসে উপস্থিত হন। অনেক দিন পর আমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব মুসতাওফাল মামালিকের ওপর অর্পিত হয়। এ পর্যায়ে আমরা মাওলানা সাইফুর রাহমানের বদান্যতায় মুসতাওফালের ঘরেই বসবাসের অনুমতি পেয়ে যাই; কিন্তু আমাদের সাথিরা তখনো কতোয়ালের হিফাজতেই দিন যাপন করত।

রহমত আলি জাকারিয়া নামের আমাদের এক সাথি দল ছেড়ে পালায়। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর সে বোখারায় পৌঁছায়। তার পালানোর কথা আগেই আমাদের অবহিত করলে তাকে বাধা দিইনি। তবে যেহেতু আশঙ্কা ছিল তার পালানোর পূর্ণ দায়ভার আমাদের ওপর বর্তাবে, সেহেতু আমরা মাওলানা সাইফুরের মাধ্যমে খবরটা আগেই তাঁদের জানিয়ে রাখি। মুসতাওফাল মামালিক তখন আমাদের এখান থেকে জালালাবাদ

নিয়ে যায়। আমরা সেখানে থাকতেই আমির হাবিবুল্লাহ খান নিহত হন এবং আমির আমানুল্লাহ খান বাদশাহির আসনে সমাসীন হন।[১১৯]

একুশ. আমানুল্লাহ খানের যুগ ও আমরা

বিপ্লবী আমানুল্লাহর সঙ্গে আমাদের অনেকবারই সাক্ষাৎ হয়। যখনই সাক্ষাৎ হতো, তখনই মনে হতো আমরা যেন আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের কর্ণধারের সঙ্গেই বসছি। জালালাবাদে মুসতাওফালের নজরদারিতে থাকাবস্থায় কোনো এক প্রয়োজনে আমাদের ১ হাজার ২০০ আফগানি মুদ্রার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টি গোপনে তাঁকে জানাই। তিনিও মাত্র দুদিন পর গোপনে ওই পরিমাণ অর্থ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদের মুক্ত করেন। মুক্তির পর কাবুলে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে দেখামাত্রই জড়িয়ে ধরে বলে ওঠেন, 'আমি তো তোমাদেরই একজন ছিলাম; আজও আছি।' আমরাও কিন্তু তাঁর কল্যাণকামিতায় পিছিয়ে থাকিনি। আমাদের যুবক সাথিরা তাঁর পক্ষে বিরাট ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আফগানিস্তানের স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁদের ত্যাগ আর কুরবানির কথা তিনি জীবনেও ভুলতে পারবেন না।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ আমরা আফগানিস্তানেই অবস্থান করি। এরপর বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কাবুল ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিই। এ পর্যায়ে আমরা নভেম্বরে আমুদরিয়া পার হয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করি। দীর্ঘ অবস্থানকালীন আমরা যেমন তাঁর কল্যাণকামিতায় কোনো অবহেলা করিনি, অনুরূপ তিনিও আমাদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদানে কসুর করেননি। আফগানিস্তানে অবস্থানকালে আমাদের অনুভূতি ছিল—আমরা যেন নিজেদের হাতে আজাদ করা স্বাধীন ভূখণ্ডে নিজেদের শাসন পরিচালনা করছি।

আমরা জিহাদি তৎপরতায় আরেকটু পরিবর্তন আনলে সেখানেই চিরদিন থাকতে পারতাম; কিন্তু এমন হলে আমাদের নওজোয়ানদের আদর্শিক জীবন ধ্বংস হয়ে যেত। ব্যাপারটা মাথায় রেখে আমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পেছনে ফেলে হিজরতকে প্রাধান্য দিই। কাবুলকে চিরদিনের মতো আলবিদা জানিয়ে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি![১২০]

[১১৯] *ব্যক্তিগত ডায়েরি* : ১১৩-১২২।

[১২০] প্রাগুক্ত : ১৩২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির ব্যক্তিগত ডায়েরির ওপর পর্যালোচনা

এক. রেশমি রুমাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ

আমরা আমাদের আলোচ্যবিষয়ে কাজে লাগতে পারে এমন ২০টি উদ্ধৃতি তাঁর ডায়েরি থেকে নকল করেছি। এগুলোর বলিষ্ঠ কথামালা বার বার অধ্যয়ন করুন আর বিষয়টির গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আমার বিশ্বাস, এভাবে অভিনিবেশসহকারে পাঠ করলে আপনি নিজেই এমন অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন, যা আমরা পারিনি।

আসল কথা হলো, এ ডায়েরি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি ইংরেজদের শাসনামলেই লিখেছিলেন। তখনকার নাজুক পরিস্থিতিই ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে লিখতে বাধা দিচ্ছিল। আমরা তাঁর ডায়েরির বিস্তারিত সারাংশ লেখার পরও এটাই সমীচীন মনে করছি যে, এর কিছুটা অংশ হুবহু পাঠকদের সামনে তুলে ধরব, যাতে পাঠক নিজেই নিজের জ্ঞানবুদ্ধি খাটিয়ে ঘটনার সারবস্তু উপলব্ধি করতে পারেন। হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা থেকে আরও কিছু পেতে পারেন। তাই কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরির কতগুলো পাতা এখানে উন্মুক্ত করছি, যে পাতাগুলো ঘটনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

এখান থেকে আমরা রেশমি রুমাল আন্দোলন অকৃতকার্য হওয়ার কাহিনি শুরু করছি। স্মরণ রাখা চাই যে, মাদানির গ্রন্থের এখানেই সমাপ্তি। এ পরিচ্ছেদটি আমার নিজের লেখা। তবে বিশেষ কিছু প্রবন্ধের মূল সূত্র মাদানির গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। আর নিবন্ধটি মূলত আমারই। এর জিম্মাদারিটাও আমার নিজের। মাদানির ওপর এর দায় কোনোভাবেই চাপানো যাবে না।[১২১]

---

[১২১] সংকলক।

১. পরস্পরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য বিশ্বাস নামক একটা শক্তি দান করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একে তাদের ভাষায় 'পারস্পরিক আস্থা' নামে অভিহিত করে থাকেন। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রজীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এর রয়েছে এক সুবিশাল ভূমিকা। পারস্পরিক বিশ্বাসের অস্তিত্ব না থাকলে সমাজজীবনের যাবতীয় বিষয় ছত্রখান হয়ে যেত। এ শক্তি মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে শৃঙ্খলার একটা শেকলে আবদ্ধ করে রাখে। তবে মানুষের অন্যান্য গুণের মতো এরও একটা সীমারেখা তথা মধ্যপন্থা রয়েছে—ইতি ও নেতিবাচক একটা দিক আছে। এখানেও সীমালঙ্ঘনকারী আর অতি-উদাররা পদস্খলিত হয়ে থাকেন।

বিশ্বাসের মধ্যপন্থা এটাই যে, যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা হবে, বাস্তবেই তাকে হতে হবে বিশ্বস্ত। বিশ্বস্ত ব্যক্তির ওপর সন্দেহ করলে সেটা হবে সীমালঙ্ঘন—তার প্রতি কুধারণার নামান্তর। আর যারা স্বভাবতই গাদ্দার, তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন হবে অতি-ঢিলেমির পরিচায়ক। এ ধরনের বিশ্বাস স্থাপনকে সংশ্লিষ্ট লোকটির সুধারণা আখ্যা দেওয়া গেলেও বাস্তবে তা বিশ্বাস স্থাপন হতে পারে না। এ ধরনের সুধারণা পোষণকারীদের বাহ্যিক বন্ধুবান্ধব প্রচুর হলেও এরা পদে পদে অকৃতকার্য হতে বাধ্য। তবে বিশ্বাসের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারীর তুলনায় অতি-বিশ্বাসীরাই অকৃতকার্য হয়ে থাকেন বেশি।

মানবজাতির মধ্যে একমাত্র নবি-রাসুল ছাড়া সব মানুষই দিক দুটির যেকোনো একটির শিকার হতে পারেন। এটা এমনই এক নাজুক অবস্থান, যেখানে আম্বিয়ায়ে কিরামের পা-ও পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল; যদি-না খোদায়ি সাহায্য তাদের সহগামী হতো। আর মজার ব্যাপার হলো, অতি-বিশ্বাসের ফলে নেক লোকেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। তার কারণও বোধহয় এটাই যে, এরাই এই রোগে অধিকহারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এরা নিজেদের আলোকিত অন্তরের ছায়ায় অন্যদের অন্তরেও নিজের আকৃতিই দেখতে পান। কারণ, তাদের অন্তরটা এতই পরিচ্ছন্ন যে, অন্যের অন্তরে তাদের নিজের ছবিই প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। ফলে তারা সবাইকে নিজেদের মতো নিষ্ঠাবান ও আমানতদার মনে করে থাকেন। শত্রু-মিত্র যাচাই করতে ধোঁকাপ্রাপ্ত হন। অন্যকথায় তারা এতে কোনো পার্থক্য করেন না। অতি-বিশ্বাসের ফল এটাই দাঁড়ায় যে, আপনজনও শেষপর্যন্ত শত্রুতায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। অথচ তারা এদেরকে মিত্রজ্ঞানে এদের বিষাক্ত ছোবল থেকে আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টা করেন না।

শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মীয় ব্যাপারেও এই দুর্বলতা অনেক মুসলিম অগ্রপথিককে

বিরাট ক্ষতির মুখোমুখি করেছে। মুহাদ্দিসিন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংশয়ী ভূমিকা না রাখলে, পদে পদে মানুষের আচরণকে প্রশ্নবিদ্ধ না করলে আজ বিশুদ্ধ হাদিসের অস্তিত্ব পাওয়া দুষ্কর হয়ে যেত। জাল[১২২] ও জয়িফ[১২৩] হাদিস সাধারণত এমন সুফিদের মাধ্যমেই বেশি প্রকাশ পেত, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন সত্যিকারের ভালোমানুষ; কিন্তু তাঁদের অতি-বিশ্বাস তাঁদের এমনভাবে পরাজিত করে ছেড়েছিল যে, তাঁরা যে-কারও মুখে হাদিস নামে কিছু শুনলেই তা হাদিস হিসেবে গণ্য করে বসতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, মানুষ নিজেকে মুসলিম দাবির পর নবির ওপর মিথ্যা প্রতিপাদন করবে কীভাবে? এ কারণেই সুফিদের গ্রন্থাদিতে দুর্বল ও জাল হাদিসের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষিতেই মুহাদ্দিসদের এই কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, কোনো সুফির বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২. বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির পর্যায়

মোটকথা, ধর্ম বা রাজনীতি; সব ক্ষেত্রে ক্ষতি সবসময় অতি-বিশ্বাসীদের বহন করতে হয়। মানুষের ওপর সংশয় পোষণ করা একটা ব্যাধি হলেও এই ব্যাধিগ্রস্তরা কমই ক্ষতির শিকার হয়ে থাকেন। উমর রা. কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তিনি সাধারণত কারও ওপর লাগামহীন বিশ্বাস রাখতেন না। অনেক সময় অনেকের পেছনে লোক লাগাতেও কুণ্ঠিত হতেন না। যাচাই-বাছাই না করে কাউকে কোনো দায়িত্ব দিতেন না। এ জন্যই তাঁর দ্বারা এত বিরাট কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

অপরদিকে আলি ও উসমান রা.-এর ক্ষতিগ্রস্তকারী এবং তাঁদের হত্যাকারী তো তাঁদেরই কাছের ছিল। ইসলামের ইতিহাসে জালিম সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রথম বিপ্লবটি ছিল ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হুসাইন রা.-এর বিপ্লব; কিন্তু আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে, তাঁর জন্য উৎসর্গপ্রাণ কুফায় অবস্থানরতদের দলই চিঠির পর চিঠি লিখে তাঁকে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। শেষপর্যন্ত তারাই তাঁকে হত্যা করে। ওরা কি তাঁর বিশ্বস্ত ছিল না?

ইমাম আবু হানিফাকে গ্রেপ্তারকরণে সহায়তাকারী এবং বিষ সেবন করিয়ে হত্যাকারী কি তাঁর ছাত্র ও মুরিদ ছিল না? মির্জা মাজহার জানে জানান রাহ.-কে শহিদকারী ব্যক্তিটি কি তাঁর মুরিদ ছিল না? মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ.-কে গ্রেপ্তারকারী এবং তাঁর সঙ্গে চক্রান্তকারী ব্যক্তিটি কি তাঁর বৃত্তের একজন ছিল না? শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ.-এর কবজি কেটে নেওয়ার ফাতওয়াদানকারী এবং তাঁকে বন্দির ব্যর্থ

[১২২] মনগড়া।

[১২৩] সনদের দিক দিয়ে দুর্বল।

ষড়যন্ত্রের নায়ক কি তাঁরই ছাত্র ও মুরিদ ছিল না? সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ও ইসমাইল শহিদ রাহ.-কে বালাকোটের প্রান্তরে হত্যাকারী লোকটি কি মুসলিম এবং তাঁদের মুরিদ ছিল না? ওরা কি কোনো হিন্দু ছিল?

এত পেছনে যাওয়ার কী প্রয়োজন; আসুন ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ খতিয়ে দেখুন! বলুন দেখি, মুসলিমদের পরাজিতকারীরা কি ইংরেজ ছিল? হাকিম আহসান উল্লাহ খান, মুনশি রজব আলি, মৌলবি আবদুল কাদির এবং মৌলবি জাকা উল্লাহ আর ইংরেজদের গোয়েন্দা ও পাঞ্জাবের নেতারা, হিন্দুস্থানের জমিদাররা; অনুরূপ ব্রিটিশের পা-চাটার দল—ওরা কারা ছিল? ওরা কি নিজেদের লোক ছিল না? নিজেদের বন্ধুরাই তো শেষপর্যন্ত বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেয়।

কথা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সারকথা, সুধারণা আর অতি-বিশ্বাসের দুর্বলতাই সর্বদা রাজনৈতিক বিপ্লবগুলোকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। এটা এমন এক ব্যাধি, যা থেকে কেবল নবি-রাসুল নিরাপদ থাকতে পারেন। নতুবা বড় বড় আলিম, জাহিদ, মুখলিস, জানবাজ পরহেজগাররাও নিরাপদ থাকতে পারেন না। প্রায়ই দেখা যায়, এরাই অধিকহারে ক্ষতির শিকার হয়ে থাকেন। এ কারণে কিন্তু এরা নিন্দনীয় বা এটা তাদের অপরাধ হিসেবে প্রমাণিত হয় না; বরং এটা তাদের মর্যাদার আরেকটা স্তর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, এমতাবস্থায় তারা বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে এত ঊর্ধ্বে পৌঁছে যান, যেখান থেকে তারা সবার অন্তরকেই পরিচ্ছন্ন আর প্রত্যেকের ইচ্ছাকেই সহজ-সরল দেখে থাকেন। এ অবস্থাটা সাধারণত ওই বুজুর্গদের বেলায়ই হয়ে থাকে, যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধারণার কাছে পরাজিত এবং ধারণা তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে। এ জন্য কিন্তু পরকালে তাদের কোনো জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে না। কেননা, তারা কারও ক্ষতি করা তো দূরে থাক, ক্ষতির ধারণাও রাখেন না। যদিও দুনিয়াবি ক্ষেত্রে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। আর সংশয়বাদীরা যদিও অন্যের ওপর অবিশ্বস্ত হয়ে থাকেন, তথাপি তারা ক্ষতি থেকে নিরাপদই থেকে যান। এটা তো সবারই জানা যে, কুধারণা অনুযায়ী যতক্ষণ কাজ করা হচ্ছে না, ততক্ষণ তাকে অপরাধী বলা যায় না। অপরাধ তখনই হয়ে থাকে, যখন ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করা হয়। আর তারা তো কাজ করেন না; বরং সংশ্লিষ্ট লোকটি থেকে নিজেদের নিরাপদ দূরে রাখতে সাবধানী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৩. মধ্যপন্থার কুরআনি কানুন

নবি-রাসুল ও তাঁদের অনুসারীরা সর্বদা মধ্যপন্থার ওপর অটল থাকেন। এ জন্যই তাদের বিপ্লবগুলো সবসময় সফল হয়ে থাকে। দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বাধিক সফল

বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের হাত ধরে। এত বিশাল সাফল্য দুনিয়ার কোনো বিপ্লবের ভাগ্যে জুটেনি। কী বিস্ময়কর বিপ্লব! সহায়-সম্বলহীন কজন লোক দাঁড়িয়ে গেল আর দেখতে না-দেখতেই কিসরা ও কায়সারের মতো সুপার পাওয়ারদের হটিয়ে তাদের মসনদে আসীন হয়ে গেল! ওদের হিমালয়প্রমাণ প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁদের অগ্রাভিযানের পথে কোনোই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। কিসরা ও কায়সারের অকল্পনীয় বিশাল শক্তিকে তাঁরা খড়কুটোর মতো মাড়িয়ে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে নিলেন। এই সফল বিপ্লব যাঁরা পরিচালনা করেছিলেন, তাঁদের অবস্থা কুরআন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। নবিজি ﷺ সম্পর্কে কুরআন বলেছে, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ। এই গুণ দুটি অর্থাৎ, 'আজিজ' ও 'হারিস' তাঁর সংশয়বাদিতার প্রতি ইঙ্গিতবহ; কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে বলা হয়েছে, بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ।

এখানে 'রাউফ' ও 'রাহিম' গুণ দুটি তাঁর নম্রতা ও সুধারণার প্রতি ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ, নবিজি ﷺ যেন ছিলেন কোমলে-কঠোরে মেশানো একজন পরিপূর্ণ মানব। তিনি যথাস্থানে কঠোরতা এবং সংশয় পোষণ করতেন। অনুরূপ যথাস্থানে নম্রতা প্রদর্শন করতেন। বিশ্বাস রাখতেন। আর এটিই হচ্ছে প্রকৃত মধ্যপন্থা। এটিই সিরাতে মুসতাকিম। এখানে যখন সীমালঙ্ঘন করা হয়, তখন সেটা হয় পথভ্রষ্টতার পথ; আর ঢিলেমি করলে সেটা হয় শাস্তিপ্রাপ্তদের পথ।

অনুরূপ সাহাবিদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ 'এঁরা কাফিরদের বেলায় অত্যন্ত কঠোর।' এটা তাঁদের সংশয়বাদিতার প্রমাণ। আর সংশয়বাদিতা সৃষ্টি হয়ে থাকে মানুষের প্রতি কুধারণা থেকে। কিন্তু এর পরপরই বলা হয়েছে, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'তাঁরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত কোমল।' এটা তাঁদের নম্রতারই পরিচায়ক। এটা সৃষ্টি হয়ে থাকে মানুষের প্রতি সুধারণা ও বিশ্বস্ততা থেকে।

মোটকথা, সাহাবিরাও নবিজির সান্নিধ্য লাভের বরকতে হয়ে উঠেছিলেন কোমলতা ও কঠোরতার মিশ্র অধিকারী। তাঁরাও এ গুণ দুটিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারার কারণে সকল বিপ্লবে হয়েছিলেন সফলতার অধিকারী। আর এ জন্যই তাঁদের উপাধি হয়েছে উম্মতে মুতাওয়াসসিতাহ। বলা হয়েছে, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا 'আর এভাবেই আমি বানিয়েছি তোমাদের ভারসাম্যপূর্ণ জাতি।'

মোটকথা, এই ভারসাম্যপূর্ণ নীতি আর মধ্যপন্থাই তাঁদের সর্বক্ষেত্রে সফলতার জিম্মাদার বনেছিল। এ গুণটি তাঁদের মধ্যে সামগ্রিক পর্যায়ে ছিল।

ব্যক্তির দুর্বলতা থাকবেই। এটা তাঁদের মধ্যেও ছিল। এ জন্যই তো আলি ও উসমান

রা.-কে মুসিবত আর কষ্টে জর্জরিত হতে হয়; কিন্তু জামাআত হিসেবে সাহাবিরা ছিলেন ভারসাম্যপূর্ণ বিন্দুতে অবস্থিত। তাঁরা ছিলেন উম্মতে মুতাওয়াসসিতাহ। ছিলেন সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অবিচল ও অটল। এ জন্যই তাঁরা হয়েছিলেন সর্ববিষয়ে সর্বত্র বিজয়ী। তাঁদের পরবর্তীদের মধ্য থেকে যখন এই ভারসাম্যতা হারিয়ে যায়, তখন পদে পদে হতে থাকেন পরাজিত, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

তাঁদের পরাজয় কিন্তু সংশয়বাদিতার প্রাবল্যের কারণে ছিল না। কারণ, সংশয়বাদিরা তো কোনো জামাআতই গঠন করতে পারে না। তাঁদের পরাজয়ের মূলে ছিল সুধারণা তথা মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বস্ততা। তাঁরা খুব সহজেই জামাআতবদ্ধ হয়ে যেতে পারেন; কিন্তু জামাআতবদ্ধ হওয়ার সময় সবার প্রতি সমান বিশ্বাস রাখায় তাঁদের সঙ্গে সব ধরনের মানুষের সমাহার অনায়াসে ঘটে যায়। চতুর্দিক থেকে তাঁদের ওখানে মানুষের ঢল নামে। এ সুযোগে ভোল পালটে আজন্ম শত্রুরাও তাঁদের দলে ঢুকে পড়ে। এরপর এরাই তাঁদের বিপ্লবের পিঠে ছুরি ঢুকিয়ে থাকে। এই শ্রেণির গাদ্দারকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'মুনাফিক' বলা হয়েছে। কুরআন তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোও ফলাও করে তুলে ধরেছে, যেন উম্মত এদের ধ্বংসাত্মক ছোবল থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

৪. মধ্যপন্থা ও কার্যত এর নমুনা

সুধারণা আর সততার ফায়দা লুটে শত্রুরা আন্দোলনসমূহের এজেন্ডা ও কার্যক্রমে গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে সেগুলো সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার আগেই ব্যর্থ করে দেয়। মুনাফিক প্রকৃতির লোকরাই সবসময় এ ধরনের কাজে সফল হয়।

দুর্ভাগ্য মুসলিম জাতির! সুদূর অতীত থেকে দেখা গেছে, আমাদের মধ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা চালাতে অন্য ধর্মের শত্রুর প্রয়োজন পড়ে না। ইতিহাসের পরতে পরতে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা জুগিয়েছে আমাদেরই আপনজনরা। বিধর্মীরা মুসলিম সেজে গোয়েন্দাগিরি করেছে, এর নজির হাতে গোনা। যেমন, করম আলি শাহ পির আফগানিস্তানে আমানুল্লাহর হুকুমত উৎখাত করে পালিয়ে যায়। পরে জানা যায়, লোকটি ছিল জাতিতে খ্রিষ্টান এবং ইংরেজদের ঝানু এক গোয়েন্দা। এ জন্যই আন্দোলনসমূহের প্রতিষ্ঠাতারা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্তদের দু-ভাগে ভাগ করেন। প্রথম ভাগটি হয় ওই সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ বিশেষ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত, যারা সবদিক বিচার-বিবেচনা করে আন্দোলনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তাদের সংখ্যা হয়ে থাকে অত্যন্ত সীমিত। তারা সবাই একে অন্যের গোপনীয়তা রক্ষায় থাকেন সচেষ্ট; কেউই কোনো সময় গোপনীয়তা প্রকাশ হতে দেন না।

দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে সাধারণ সদস্যদের। তাদের দায়িত্ব হলো প্রণীত কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের প্রয়াস চালানো। তাদের কাউকে আন্দোলনের গোপনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয় না। এই অংশে উদারভাবে লোক টেনে আনা হয়। প্রথম শ্রেণিটি তৈরিতে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মন নিয়ে কাজ করা হলেও কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণিটি গঠনের ক্ষেত্রে খুব উদারতার পরিচয় দেওয়া হয়। তবে আন্দোলনের মৌলিক প্রোগ্রামে সবার দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অভিন্ন থাকে। মূল উদ্দেশ্যে কখনো কোনো তারতম্য আসে না।

পবিত্র কুরআন ইসলাম প্রচারের আন্দোলন—যাকে জিহাদ নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে—এর জন্য কিছু মূলনীতি ও ধারা বর্ণনা করেছে। সেসব নীতির একটা হলো, 'নিরাপত্তা কিংবা ভয়ের যেকোনো সংবাদই আসুক না কেন, মুজাহিদিনের উচিত, তা তৎক্ষণাৎ প্রচার না করে আগে নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কানে পৌঁছে দেওয়া; যাতে তারা সংবাদটির বাস্তবতা এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা প্রচার করা বা না-করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।' এ কথা দ্বারা প্রমাণ হয়, কুরআনও মুজাহিদিনকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে দিয়েছে। একটি হচ্ছে সাধারণ মুজাহিদদের শিবির, অপরটি হচ্ছে ওই সকল মুজাহিদের শিবির, যারা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে এর নিগূঢ় তথ্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম; কিন্তু তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিধির ভেতর শতভাগ দায়িত্ব পালন করে যাবেন। সাধারণ মুজাহিদদের কাজ হচ্ছে কায়িক শ্রম তথা অস্ত্রচালনা। আর নেতৃস্থানীয়দের কাজ হলো কর্মসূচি প্রণয়ন করা। কুরআন এ ক্ষেত্রে যে শব্দচয়ন করেছে তা থেকেই তাদের দায়িত্বের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কুরআন এখানে استنباط যে শব্দ ব্যবহার করেছে, এর আভিধানিক অর্থ, 'ভূমির গভীর থেকে পানি বের করা।' আর পারিভাষিক অর্থ হলো, 'কোনো বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যাওয়া।' মোটকথা, পবিত্র কুরআনও আন্দোলনসমূহে দুটি শ্রেণি থাকার কথা বলছে।

৫. জাতীয়তাবাদী আবেগের মূলনীতি

জাতিসমূহের উত্থান-পতন কখন কীভাবে হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদরা তা বহু আগেই বিস্তারিতভাব বলে রেখে গেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসশাস্ত্রের জনক আল্লামা ইবনু খালদুন বলেন,

> ব্যক্তিসত্তার মতো জাতিসত্তাও তিনটি কাল অতিক্রম করে থাকে। প্রথমটি হলো প্রতিপালিত হওয়ার কাল। একে পরিভাষায় উত্থানকাল বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো স্থিতিকাল। এ সময় যেমন অধিকতর কোনো উন্নতি ঘটে না, তেমনি এমন অধঃপতিতও হয় না যে, জাতিসত্তা বিলীন হয়ে যাবে। আর তৃতীয়টি হলো পতনকাল। এই সময়ে মানুষের

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো জাতির সমগ্র বিষয়ে দুর্বলতা দেখা দেয়। সর্বত্রই দুর্বলতার আলামত ফুটে ওঠে এবং দুর্বল হতে হতে একসময় তা প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে।

জাতিসমূহ আন্দোলনের মাধ্যমেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। উত্থানকালে সব কর্মসূচিতে তারা সফলতা পেয়ে উন্নতির শীর্ষচূড়ার দিকে এগিয়ে যায়। এরপর এমন এক সময় আসে, যখন তাদের উন্নতির চাকা বিকল হয়ে একটা জায়গায় আটকে যায়। অবশ্য তখনই তাদের পতন শুরু হয় না। ওই কালের লোকেরা তাদের পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া উন্নতিকে ধরে রাখার প্রয়াস চালিয়ে যায়। ফলে তারা অধিকতর উন্নতি না করতে পারলেও পেছনে সরে আসে না; কিন্তু যখন পতনকাল শুরু হয়ে যায়, তখন তাদের প্রতিটি কদম পিছলে যায়। হাত দিয়ে ধরা প্রতিটি অবলম্বন ছিঁড়ে যায়। তখন পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া উন্নতিটুকুরও আর হিফাজত করা সম্ভব হয় না। এভাবে ক্রমশ তারা নিজেদের বেঁচে থাকার অবলম্বন হারাতে হারাতে একসময় ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যায়।

স্মরণ রাখা চাই যে, ব্যক্তিসত্তার শারীরিক শক্তিলোপ যেমন তার দেহের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়ে থাকে, তেমনি জাতিসত্তার বিলুপ্তিও তাদের চারিত্রিক ও কর্মপরাকাষ্ঠার দুর্বলতা থেকেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। পতনোন্মুখ একটি জাতির প্রথম অধঃপতন আসে তাদের চরিত্রে। এরপর ধীরে ধীরে তাদের আত্মমর্যাদা, নিজস্বতা, জাতীয়তাবোধ, বিশ্বস্ততা, স্বাধীনচেতা মনোভাব, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধৈর্য, তুষ্টতা, দৃঢ়তা, বাহাদুরি, বদান্যতা, উদারতা প্রভৃতি গুণ একটার পর একটা নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়।

এ মূলনীতির আলোকে আমাদের মুসলিম জাতিসত্তার ওপর নজর দিতে পারলে দেখা যাবে, এ জাতির উত্থানকাল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সাহাবিদের যুগ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেই সোনালি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর এসেছিল স্থিতিশীলতার কাল। এ কালটা ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। বলা যায় ইয়াজিদের যুগ থেকে নিয়ে সালতানাতে উসমানিয়ার পতনকাল পর্যন্ত ছিল এর ব্যাপ্তি। যদিও ওই যুগেই তাতাররা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে জাতিসত্তার চরম ক্ষতিসাধন করেছিল; কিন্তু এরপরও বলা যায়—এর ফলে কিন্তু মিল্লাতে মুসলিমার জাতিসত্তায় বার্ধক্যের আঁচ লাগেনি। কারণ, যৌবন থাকার কারণেই মিল্লাত এ আঘাতটাকে সামলে নিয়ে তার স্বকীয় অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল; কিন্তু সালতানাতে উসমানিয়ার বিদায়ঘণ্টা বাজার পরপরই শুরু হয়ে গেছে আমাদের জাতিসত্তার পতনকাল। তখন পাশ্চাত্যশক্তি যৌবনের নেশায় দাপাদাপি করছিল; আর আমরা বার্ধক্যের ভারে ক্রমশ নুয়ে পড়ছিলাম।

খিলাফতব্যবস্থা ধ্বংসের পর যখন আমাদের একটার পর একটা দেশ তাদের করতলগত হতে থাকে, তখন আমরা বাহ্যিক দুর্বলতার মতো চারিত্রিক দুর্বলতায় ভুগতে শুরু করি। আমাদের মধ্যে আর জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মত্যাগ ও নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার কোনো ভালো গুণই বাকি থাকেনি। কোনো জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধ থাকলে তারা কখনো বিজাতীয়দের পক্ষ হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে পারে না; কিন্তু হায়! আমাদের থেকে সেই জাতীয়তাবোধও হারিয়ে যায়।

সারকথা, পরস্পর ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং প্রবল জাতীয়তাবোধ কোনো আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে থাকলে কখনো সে আন্দোলন ব্যর্থ হতে পারে না। ব্যর্থতা কেবল তখনই আসে, যখন এ দুটি বিষয়ের কোনো একটিতে ঘাটতি দেখা দেয়।

দুই. ব্যর্থতার কারণসমূহের ওপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি

মানুষের প্রতি 'তাহরিকে রেশমি রুমাল'-এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার শায়খুল হিন্দের সুধারণা আর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই প্রবল। ফলে তিনি এমন কতিপয় ব্যক্তিকে তাঁর পরামর্শদাতাদের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিলেন, যারা মূলত ছিল ব্রিটিশের বেতনভোগী গোয়েন্দা। বাহ্যত এরা তাঁর নামে আত্মত্যাগী হলেও আন্দোলনের সমস্ত পরিকল্পনা ইংরেজদের হাতে তুলে দিত। যেহেতু তখন মুসলিমসমাজে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর জাতীয়তাবোধের মহামারি চলছিল, তাই ইংরেজরা ওই প্রকৃতির মানুষকে কিনতে কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। নতুবা হিন্দুরাও তো ছিল এই আন্দোলনের অংশীদার; কিন্তু আজ অবধি তাদের কোনো ব্যক্তির নামে আন্দোলনে গোয়েন্দাগিরি করছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন?

শায়খুল হিন্দকে কিন্তু বার বার এদের বেলায় সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়; কিন্তু তিনি বলতেন, 'মানুষের বেলায় অসৎ ধারণা রাখতে নেই। ওরা এমন হওয়ার কথা নয়!'

হায়! তাঁর এই উদার ধারণার পাশাপাশি কিছুটা সংকীর্ণমনাভাবও থাকলে বোধহয় ক্ষতিটা এত বিশাল হতো না। মাওলানা সিন্ধি কাউকে খাতির করতেন না। তিনি কারও ওপর পুরোপুরি আস্থাভাজন হয়ে পড়তেন না; কিন্তু শায়খুল হিন্দের সামনে তিনিও ছিলেন অসহায়।

মোটকথা, শায়খ রাহ.-এর উদার মনোভাব এবং আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত একশ্রেণির জাতীয়তাবোধহীন মানুষের কর্মকাণ্ড মিলে এই সুন্দর আন্দোলনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

জানা যায়, শায়খের বিশেষ বিশেষ বৈঠকের খবরও ইংরেজরা বিস্তারিতভাবে পেয়ে যেত। মাদানি রাহ. বলেন, 'মিসরে যখন শায়খের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়, তখন এক ইংরেজ অফিসার এমনসব তথ্য আদালতে উপস্থাপন করেছিল, যেগুলোর সংবাদ একমাত্র তাঁর ঘনিষ্ঠ কজন সঙ্গী-সাথি ছাড়া কারও জানার কথা ছিল না!'

তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ব্রিটিশের বেতনভুক্ত চাকর। আবার এমনও কতিপয় লোক ছিল, যারা শুরুর দিকে বিশুদ্ধ নিয়তেই আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন; কিন্তু গ্রেপ্তারির পর ইংরেজদের অত্যাচারের ভয়ে সব গোপনীয়তা ফাঁস করে দেন। এটা অপরাধের আওতায় এসে থাকলেও মূলত এটা ঘটে থাকে নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুণের অভাবে। যদিও এটাও একটা অপরাধ; কিন্তু প্রথমটার তুলনায় তা কিছুটা হালকা। প্রথম প্রকারের অপরাধটা তো সুস্পষ্ট গাদ্দারি তথা মুনাফিকি, যার কুফরি সম্পর্কে সামান্যমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় পর্যায়েরটাও নিকৃষ্ট অপরাধ; তবে কোনো অবস্থায়ই কুফরি নয়।

এবার আমরা এখানে এ উভয় প্রকারের গোয়েন্দাগিরির ওপর আলোচনা করব। কেননা, এই গোয়েন্দাগিরিই মূলত এই মহান বিপ্লবকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। দুনিয়ায় যত বিপ্লব—পরিচালনা-পরিষদে গাদ্দার ঢুকে গেলে সব ব্যর্থ হতে বাধ্য।

নেতার কাজ হলো বিশ্বাস রাখা; আর কর্মীদের কাজ হলো বিশ্বস্ত থাকা। আজকের আরবলিগের সভাপতি জামাল আবদুন নাসির বিশ্বস্ত ও গোপনীয়তা রক্ষাকারী বন্ধু না পেলে নিঃসন্দেহে তিনি ব্যর্থ হতেন। তার সফলতার মূলে রয়েছে জাতির বিশ্বস্ততা। কিন্তু হায়! শায়খুল হিন্দ এমন বিশ্বস্ত জাতি পাননি। অথচ শায়খের বেশির ভাগ সঙ্গী-সাথিই ছিলেন আলিম সম্প্রদায়; কিন্তু দেখা গেছে অন্যের পণ্য বনার ক্ষেত্রে তারা ছিল সবার অগ্রগামী।

তিন. পরাজয়ের কারণসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

শায়খুল হিন্দের সঙ্গে যারা গাদ্দারি করেছিল, তাদের নাম উল্লেখ করা সত্যিই বড় মুশকিল ব্যাপার। আর নাম উল্লেখ করলে অনেকে তা বিশ্বাসও করবেন না। কেননা, এরা বাহ্যিক বুজুর্গির মাধ্যমে নিজেদের যুগের বায়েজিদ বুসতামি আর জুনায়েদ বাগদাদি বানিয়ে নেন। আমি তো কোন ছার! মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানিও এদের নাম উল্লেখের সাহস করেননি।

অতএব, আমি লিখলে দুনিয়াবাসী তা মানবে কেন? কিন্তু আমি না বললেই কি ওরা গাদ্দারির তকমা থেকে মুক্ত থেকে যাবে? আমার বিশ্বাস, একদিন না একদিন ইতিহাস

তাদের চেহারা থেকে বুজুর্গির জরিন চাদর খুলে বিশ্ববাসীর সামনে তাদের কদাকার চেহারা উন্মুক্ত করে ছাড়বে। মাওলানা সিন্ধির কাছ থেকে আমি সরাসরি যাদের নাম শুনেছি, তাদের নামও বলার সাহস করতে পারছি না। তবে যারা রাজনীতির সঙ্গে কিঞ্চিত সম্পর্ক রাখেন, তারা শায়খের সঙ্গী-সাথিদের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে এমনিতেই জানতে পারবেন যে, এদের মধ্যে কারা ছিল গাদ্দার; আর কারা ছিল বিশ্বস্ত।

শায়খের বিশেষ পরামর্শ-পরিষদের একব্যক্তি সম্পর্কে লোকেরা বার বার তাঁকে সাবধান করেছেন; কিন্তু তাঁর সুধারণা এতই প্রবল ছিল যে, জিন্দেগির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লোকটিকে তিনি তাঁর পাশেই রেখে দেন। শুধু তা-ই নয়; তাঁর এক মেয়েকেও লোকটির কাছে বিয়ে দেন। মাদানি রাহ. অবশ্য লোকটির সাফাই গেয়েছেন; কিন্তু তার জীবনধারণ-পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে এ কথাই বলে যে, লোকটি ছিল ইংরেজদের একজন গোয়েন্দা। তার জন্মস্থান ছিল পেশোয়ার। সে কাকা সাহেবের দরগাহের মুতাওয়াল্লিদের বংশধর। দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপনের পরপরই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং প্রথমে দেওবন্দে, পরে মাল্টায় হজরতের সঙ্গী হয়। মুক্তির পরও সে হজরতের সঙ্গ ত্যাগ করেনি। আজ অবধি সে জীবিত এবং নিজ এলাকায়ই বসবাস করছে। সে যে একজন গোয়েন্দা ছিল, তার কয়েকটা প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. মিসরের আদালতে মামলা চলাকালে জানা যায়, দেওবন্দ ও দিল্লিতে যে বৈঠক হতো, সেগুলোর সংবাদ ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ পেয়ে যেত। অথচ দেখুন, সেই বৈঠকের সদস্য কারা ছিলেন? তারা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলি, মাওলানা শওকত আলি, মাওলানা আজাদ, গান্ধিজি, পন্ডিত মোতিলাল, মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রফেসর বরকত উল্লাহ, হরদয়াল, মাওলানা সিন্ধি, মাওলানা হাদি হাসান, মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া আনসারি এবং মাওলানা আজিজ গুল। তাঁদের মধ্যে শেষোক্তজন ছাড়া আর কারও ওপর সন্দেহের অবকাশ আছে? বাকি সবাই তাঁদের সারাটা জীবন ব্রিটিশবিরোধিতায় ব্যয় করেছেন। এ পথে তাঁরা সীমাহীন নির্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করেছেন। তাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, আজিজ গুলই ছিলেন সেই ব্যক্তি।

২. হজরত যখন মাল্টা থেকে বোম্বাই ফিরছিলেন, তখন পথিমধ্যে সিআইডিবেশী এক মাওলানার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সিআইডি তখন মাল্টায় বন্দিকালীন তাঁদের তিনজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হতো, তার কিছু বলে শুনিয়েছিল।

এবার দেখুন মাল্টায় হজরতের সঙ্গে কে কে ছিলেন? মাল্টায় তাঁর সাথি ছিলেন তিনজন। মাদানি রাহ., মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান ও আজিজ গুল। তাঁদের

মধ্যে মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামানের ইনতিকাল হয়ে যায়। তাহলে সিআইডির কাছে তাঁদের কথা কে পাচার করেছিল? তাঁরা তিনজন ছাড়া তো কেউ নন? তাহলে কি মাদানি? আল্লাহ! আল্লাহ! মাদানির বেলায় তো এমনটা কল্পনাও করা যায় না, তাহলে এবার আপনারাই বলুন কে বলেছিল?

৩. মাওলানার জিন্দেগি ছিল সম্পূর্ণ আমিরানা স্টাইলের। বর্তমানেও তিনি একজন খ্যাতিমান ধনী ব্যক্তি। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি কৃষিজমি রয়েছে তার। বাড়িটাও অত্যন্ত জৌলুসপূর্ণ। অথচ তার জ্ঞাত আয়ের উৎস তার এ আমিরানা চলাফেরার পক্ষে সায় দেয় না, তাহলে বাধ্য হয়েই বলতে হয় নিশ্চয় আয়ের কোনো গোপন উৎস রয়েছে, যার মাধ্যমে তার এই আভিজাত্য পরিচালিত হয় এবং হচ্ছে।

৪. আটকে[১২৪] আমির আহমাদ খান নামের একজন লোক ছিল। দেওবন্দে অধ্যয়নরত থাকতেই সে ব্রিটিশের পণ্যে পরিণত হয়। তিন বছর গোয়েন্দা-তৎপরতা চালানোর পর ইংরেজরা তাকে পরীক্ষা দিতে ইংল্যান্ডে ডেকে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে আরও কয়েকটি দেশে পাঠানো হয়। জার্মানি, রাশিয়া ও জাপানে সুনামের সঙ্গে গোয়েন্দা-তৎপরতা চালানোর পর তাকে তুর্কিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ সময় তার চিন্তাধারায় হঠাৎ একটা ভূমিকম্প সৃষ্টি হলে পক্ষ ত্যাগ করে ব্রিটিশের বিরোধী হয়ে ওঠে। ইংরেজরা তখন তাকে ভারতে প্রবেশ করতে না দিলে সে জাপান চলে যায়। সেখান থেকে একটি পত্রিকাও বের করে। এ সময় বাবু সুবাস চন্দ্র বসু সেখানে গেলে তার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি দেশে এসে তার পক্ষে তদবির করলে সে দেশে আসার অনুমতি পায়। দেশে ফেরার কিছুদিন পর সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তাকে পুলিশের মাধ্যমে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। তারপর গ্রেপ্তার করে লাহোরে আনা হয়। এরপর তাকে একেবারে লাপাত্তা করা হয়। তার উত্তরাধিকারীরা এ ব্যাপারে হইচই করলে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সে পুলিশ হিফাজতে থাকাবস্থায় ঝিলামের নিকটবর্তী একজায়গায় চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেছে। আল্লাহই ভালো জানেন, আসলে তাকে নিয়ে কী ঘটেছিল? ওই লোকটির সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়। সে আমাকে বলেছিল, 'যখন হিন্দুস্থানে গোয়েন্দাগিরি করতাম, তখন দেখতে পাই দেওবন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই এ কাজে লিপ্ত ছিলেন!' সে বলেছিল, 'আমি নিজেই একজন বড় মৌলবির প্রতারণায় এ পথে পা

[১২৪] একটি জায়গার নাম।

দিয়েছিলাম।' ওই মৌলবির নামও সে আমাকে বলেছিল। 'তিনি ছিলেন দেওবন্দের ইদগাহের খতিব।' সে এ কথাও বলেছিল, 'একজন পশতুভাষী মাওলানাও এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে পশতু ভাষায় কথা বলতেন। আমি জড়িত হওয়ার পর জানতে পারি, তিনি আমার অনেক আগে থেকেই এ কাজে জড়িত। তার ওপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব ছিল। তার নামও সে আমাকে বলেছে। তিনি ছিলেন কাকা খালি। লন্ডন যাওয়ার পরও আমার হাতে তার দুটি চিঠি পৌঁছেছিল। সম্ভবত ব্যক্তিগত কোনো কাজে লিখেছিলেন।'

প্রিয় পাঠক, এই কথাগুলো মন দিয়ে পড়ুন এবং নিজের থেকেই আপনারা ফায়সালা করুন। আমি এখনে কিছুই বলব না।

৫. শায়খুল হিন্দের অবস্থা তো ছিল এই—তিনি ইংরেজদের চেহারা দেখাটাও সহ্য করতে পারতেন না। মিসরের আদালতে দাঁড়িয়ে যখন তাদের সামনে বক্তব্য দিতে হয়েছিল, তখন ঘৃণায় চেহারা ওদের থেকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। এক ইংরেজ অফিসার এ ব্যাপারে পরদিন মাদানির কাছে অভিযোগও উত্থাপন করে। এক পক্ষ থেকে যখন এরূপ রূঢ় আচরণ প্রকাশ পাচ্ছিল, তখন নিশ্চয় ইংরেজরাও তাঁকে দেখার ইচ্ছুক ছিল না।

এই ছিল হজরতের অবস্থা। অথচ তাঁর ওপর আত্মোৎসর্গ হওয়া, তাঁর ওপর কুরবান হওয়া ব্যক্তিটির আচরণ কেমন ছিল, আপনারা জানেন? তিনি এক ইংরেজ নারীকে বিয়ে করেন। আজ অবধি তিনি এই মেমের স্বাদ উপভোগ করে চলছেন।

মাওলানা সাহেবের সাফাই গাইয়েদের এ কথাটা স্মরণ রাখা চাই যে, শায়খের ওপর আত্মোৎসর্গ হওয়া কোনো ব্যক্তি কি কোনো ইংরেজ নারীকে তার জীবনসঙ্গিনী বানাতে পারে? ইংরেজরা কি তাদের অস্তিত্বের শত্রুদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে? সামান্য মৌলবির পক্ষে কি অভিজাত কোনো মেমের খরচপাতি চালিয়ে নেওয়া সম্ভব? আমরা তো জানি, একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পক্ষেও ইংরেজ কোনো মেমের সৌখিন জীবনযাপনের খরচা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

সে যা-ই হোক; ওই পেশোয়ারি মৌলবি কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় বসে সব গোপন তথ্য ইংরেজদের কাছে পাচার করে দিতেন। এইটুকু করেই তার দায়িত্ব তিনি শেষ করেননি; বরং অধিক জানানোর জন্য হজের সফরে মক্কায় এবং বন্দিজীবনে মাল্টায় শায়খুল হিন্দের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে ছিলেন।

অপর দেওবন্দি মৌলবি ছিলেন দেওবন্দের ইদগাহের খতিব। তিনি যদিও কেন্দ্রীয় পরিচালনা-পরিষদের সদস্য ছিলেন না, তথাপি বিপ্লবের কয়েকটি বিভাগের সঙ্গে

ছিলেন সংশ্লিষ্ট। ছিলেন অর্থবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ এক কর্মকর্তা। তিনিও যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন। আমির আহমাদ খান বলেন, 'আমি তো এমনিতেই দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠাতাম। গ্রীষ্মকালে শিমলায় যেতে হলে পথিমধ্যে আম্বেলায় মৌলবির ওখানে উঠতাম। তিনি ছিলেন আম্বেলার ছাউনির জামে মসজিদের খতিব। কোনো কোনো সময় মৌলবিও আমার সঙ্গে যেতেন; কিন্তু শিমলায় গিয়ে পৃথক হয়ে যেতেন। কারণ, আমাদের একজনকে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলা এবং পরস্পর পরিচিত হতে নিষেধ ছিল। তিনি আলাদা রিপোর্ট দিতেন; আর আমিও আলাদা রিপোর্ট দিতাম। আমরা একজন আরেকজনের রিপোর্টের কিছুই জানতাম না।'

তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন ঝিলাম জেলার চাকওয়ালের এক মৌলবি। তিনি লাহোরস্থ বিপ্লবের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। মাওলানা সিন্ধি বলেন, 'লোকটি গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্য নিয়েই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল।'

ইংরেজ সরকার লোকদেখানোর জন্য তাকেও গ্রেপ্তার করে; কিন্তু খুব শীঘ্রই ছেড়ে দেয়। লোকটি গোয়েন্দা না হলে কতদিন যে তাকে জেলের ঘানি টানতে হতো, তা ধারণাও করা যায় না। কেননা, সে ছিল একটা কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এ জন্যই পূর্বোক্ত দেওবন্দি মৌলবিকে একবারের জন্যও গ্রেপ্তার করা হয়নি। অথচ দেখা যায়, মাওলানা আহমাদ উল্লাহ পানিপথির মতো সহজ-সরল বুজুর্গকেও ইংরেজরা গ্রেপ্তার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। ইংরেজদের জেরার মুখে এই দরবেশ তাদের কোনোই তথ্য দিচ্ছিলেন না। ফলে একপর্যায়ে ওই চাকওয়ালি মৌলবিকে তার কাছে আনা হয়। সিআইডিরা তখন ঘরের দেয়ালের সঙ্গে কান লাগিয়ে বসেছিল। মৌলবি আসামাত্রই তার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা লাগিয়ে আলাপ জুড়ে কথার জাদুতে ফেলে তার কাছ থেকে একে একে সব তথ্য উদ্ধার করে। মাওলানা সাহেব যখন সব স্বীকার করেন, তখনই পর্দা সরিয়ে গোয়েন্দারা উপস্থিত! অফিসার তখন স্মিত হাস্যে বলছিল, 'এ কথাগুলোই তো জানার জন্য আমরা এতদিন আপনাকে অনুরোধ করে এসেছিলাম; কিন্তু আপনি তো প্রতিবারই অস্বীকার করছিলেন?' সহজ-সরল মাওলানার তখন করার আর কিছুই ছিল না। তিনি ক্ষমা চেয়ে জীবনের মতো রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

এবার আপনারাই বলুন, কোনো অসহায় ব্যক্তি কি কাউকে এভাবে বিপদে ফেলতে পারে? অসহায় হলে বড়জোর এতটা হতে পারে যে, তিনি যা জানেন তা বলে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবেন; কিন্তু তার আচরণ তো এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি ইতিপূর্বে তাদের যে তথ্য দেন, বিপ্লবের আরেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে দিয়ে বিষয়টা সত্যায়িত করে ইংরেজদেরকে বোঝাচ্ছিলেন যে, 'আমি ইতিপূর্বে যেসব রিপোর্ট দিয়েছিলাম, সেগুলোও ভুয়া ছিল না।' অপরাধীকে শুধু নিজের অপরাধের কথাই স্বীকার করতে হয়। অন্যদের

অপরাধের সাক্ষ্য দেওয়ার দায় তার ওপর বর্তায় না। চাকওয়ালি মৌলবির এক মেয়ে মাওলানা আহমাদ আলি লাহোরির স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর শ্বশুর।

গাদ্দারের এ তালিকায় কান্দাহারের আরেক মৌলবিও ছিল। সে ছিল দেওবন্দ থেকে শিক্ষাসমাপনকারী। শায়খুল হিন্দ আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বানিয়ে তাকে কাবায়েলি গোত্রসমূহের কাছে জিহাদি তাবলিগের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন; কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হতে হয় 'রেশমি রুমাল' ধরা পড়ার পর যখন বিপ্লবের সমস্ত গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, তখন ব্রিটিশ সরকার হাবিবুল্লাহর ওপর চাপ প্রয়োগ করে আফগানিস্তানে থাকা সকল বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়ে নিলেও ওই কান্দাহারি মৌলবিকে গ্রেপ্তার করানো হয়নি। শুধু তা-ই নয়; তাকে মুসতাওফাল মামালিকের পররাষ্ট্রনীতির উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

হাবিবুল্লাহর তখন ইংরেজদের মর্জিবিরোধী করার কিছু ছিল না। এরপর এই মৌলবিকে এমন এক পদে আসীন করা হয়, যার ফলে সে হয়ে ওঠে আফগান আর ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন। আফগান সরকার ব্রিটিশকে কোনো কথা মানাতে চাইলে মৌলবির মাধ্যম ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য হতো না। তার সম্মতি যুক্ত থাকলেই কেবল ইংরেজরা সম্মত হতো! এ কথাগুলো মাওলানা সিন্ধি তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখেছেন!

গাদ্দারদের তালিকায় মাওলানা চাঁদপুরির নামও নেওয়া হয়ে থাকে। মাওলানা সিন্ধিও তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'এই মাওলানা হিজাজে এমনকিছু তৎপরতা চালিয়েছিল, যাতে তুর্কি সরকার বিরক্ত হয়ে শায়খুল হিন্দকে গ্রেপ্তার করে। সে জিদ্দা থেকে তাঁর নামে এমন সন্দেহ উদ্রেককারী চিঠি পাঠাতে থাকে, গালিব পাশা এ ব্যাপারে ভূমিকা না নিলে মদিনার গভর্নর অবশ্যই তাঁকে গ্রেপ্তার করতেন।'

মাওলানা সেখানে সফল না হলেও হিন্দুস্থানে বেশ সফল হয়। সবসময় গোপন বিষয় ইংরেজদের কাছে পাঠিয়ে দিত। হিজাজের আন্দোলন-কর্মসূচির রিপোর্টও সে তাদের সরবরাহ করে। সে যে গাদ্দার ছিল, তার আরেকটি প্রমাণ হলো, মাওলানা হাদি হাসান কাঠের বাক্সে করে যে চিঠি হিন্দুস্থানে নিয়ে আসছিলেন, এ সংবাদ বোম্বাইর গভর্নরের জানা ছিল না; কিন্তু তিনি পৌঁছার পরপরই দেওবন্দ ও নানুতার সেইসব ঘরে অভিযান পরিচালিত হয়, যেসব ঘরের কথা শায়খুল হিন্দ ছাড়া কেবল এরা দুজনেই জানত। অন্য একটা প্রাণীও এ সংবাদ জানত না। এ দাবিটা কিন্তু মাওলানা সিন্ধির। নাহয় আমরা এত বড় ব্যক্তিত্বের ওপর কথা বলতে সাহস করি না। (আল্লাহু আলাম)

দ্বিতীয় প্রকারের গাদ্দার হল সে-সকল দুর্বলমনা মানুষ, যারা ইংরেজদের অত্যাচারের ভয়ে গোপনীয়তা ফাঁস করে। আফগানিস্তানের আমির হাবিবুল্লাহ খান ছিলেন তাদেরই

একজন। যদিও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অধিষ্ঠিত এই ব্যক্তির ওপর গোয়েন্দাগিরির অপবাদ আরোপ করা যায় না; কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট করেই বলা যায় যে, তিনি ইংরেজভীতিতে ভুগতেন বলেই বিপ্লবীদের খবরাখবর তাদের জানিয়ে দিতেন।

এদের তালিকায় হাবিবুল্লাহর ছেলে আমির ইনায়েতুল্লাহর নামও নেওয়া যায়। তাকে ইংরেজরা যুবরাজ বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে দলে টেনে নেয়। নিয়মতান্ত্রিক যুবরাজ নাসরুল্লাহ খান বিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেন। তাঁকে তারা কোনোভাবেই পক্ষে টানতে পারছিল না। ইংরেজরা তখন চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে মদিনা থেকে এক লোককে পির বানিয়ে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দেয়। সে এখানে এসে মারাত্মক ভেলকি দেখানো শুরু করে। একপর্যায়ে বুজুর্গির ফাঁদে ফেলে ইনায়েতুল্লাহকে শিকার করে নেয়। ইনায়েত তার মুরিদ হয়ে গেলে একদিন সে তার মনোযোগ আকৃষ্ট করে বলে, 'শোনো বেটা, আমি আজ একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি আল্লাহর রাসুল ﷺ বলছেন, "খবরদার! তোমরা অহেতুক ইংরেজদের মোকাবিলা করতে যেয়ো না। এতে তোমাদের কোনোই লাভ হবে না। কেননা, আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন সাম্রাজ্য তাদের দিয়ে দেওয়ার। অতএব, কুদরতের সিদ্ধান্তের বিপরীতে কেউ সফল হতে পারবে না। লোকেরা অযথাই নাসরুল্লাহর নাম নিচ্ছে। হাবিবুল্লাহর পরে আফগানিস্তানের আমির হবে ইনায়েতুল্লাহ!"'

এভাবেই এ পির ইনায়েতকে বিপ্লবীদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই পিরের মাধ্যমেই ইনায়েত ব্রিটিশের বন্ধুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং আফগানিস্তানে বসে বিপ্লবীদের চালানো তৎপরতার খবরাদি ব্রিটিশের হাতে তুলে দিত।

ইনায়েতের এই পির মোল্লা চারবাগ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইংরেজদের চাপে হাবিবুল্লাহ যখন বিপ্লবীদের বন্দি করা শুরু করেন, তখন তাঁরই আরেক ছেলে বিপ্লবীদের বন্ধু আমানুল্লাহ পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। তিনি মসনদে আসীন হওয়ামাত্রই সকল বিপ্লবীকে মুক্ত করে তাঁদের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করে আফগানিস্তানকে স্বাধীন করেন।

এভাবে কলেজপড়ুয়া সে-সকল ছাত্র, যারা আবেগের বশে আফগানিস্তানে হিজরত করেছিল, এদের কয়েকজন যখন বন্দি হয়ে ভারতে নীত হয়, তারাও শেষপর্যন্ত অত্যাচারের ভয়ে অনেক কিছু প্রকাশ করে দেয়। আবদুল বারি নামের এক যুবক, যে বর্তমানে পাকিস্থানে এম.এল.এ পদে আসীন—তাকে ব্রিটিশ সরকার মুক্তি দেওয়ার শর্তে আবদ্ধ করে সবকিছু জেনে নেয়। বিশেষ করে তার আত্মীয় স্যার মুহাম্মাদ শফির প্ররোচনায় সে সব গোপনীয়তা ফাঁস করে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

এরা ছিল আবেগের শিকার; বাস্তবতার কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে এদের কোনো পরিচয় ছিল না।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলি কুসুরি ছিলেন আন্দোলনের একজন উদ্দীপ্ত কর্মী; কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর সব উদ্যম একেবারে পানি হয়ে যায়। তিনিও শেষপর্যন্ত সবকিছু বলে দেন। মাওলানা আবদুল কাদির কুসুরিও ক্ষমা চেয়ে সব রহস্য উন্মুক্ত করে দেন এবং রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়ান। মৌলবি আহমাদ পানিপথির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সবকিছুই খুলে বলেছিলেন এবং রাজনীতি থেকে চিরদিনের মতো সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

কাজি মাসউদ আহমাদ ছিলেন শায়খুল হিন্দের জামাতা। তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ এক যুবক। ডাক্তার আনসারি তাঁকে হজমৌসুমে হজের বাহানায় মক্কায় শায়খুল হিন্দের কাছে ১ হাজার টাকা পাঠানোর জন্য মনোনীত করেন। হজরত তাঁর এই প্রিয়জনকে মৌখিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিকনির্দেশনা দিয়ে দেশে ফেরত পাঠান, যাতে তিনি দেশের কেন্দ্রসমূহে তাঁর এ বার্তা পৌঁছে দেন। এটা ছিল হজরতের সেই অতি সুধারণার ফল; কিন্তু হজরত তখন এ দিকটা ভেবে দেখেননি যে, লোকটি বিশ্বস্ত হলেও এ লাইনে একেবারে আনকোরা। সরকার কখনো তাকে গ্রেপ্তার করে নিলে সে অত্যাচারের মোকাবিলায় গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিতে পারবে কি না! সুতরাং বাস্তবেও তা-ই ঘটে। হিন্দুস্থানে পৌঁছামাত্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে দুজন অভিজ্ঞ পুলিশের হাওয়ালায় ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা কৌশলে সব তথ্য তাঁর থেকে আদায় করে দু-মাস পর তাঁকে ছেড়ে দেয়।

পেশোয়ারের হক নাওয়াজ খান ছিলেন আন্দোলনের বিশ্বস্ত সদস্য; কিন্তু মানসিকভাবে ছিলেন দুর্বল। 'রেশমি রুমাল' চিঠি তাঁর মাধ্যমে সিন্ধুতে হাজি আবদুর রাহিমের কাছে পৌঁছার কথা ছিল। মাওলানা সিন্ধির ধারণা—যখন তাঁর ঘরে পুলিশি তল্লাশি চলে, তখন চিঠিখানা তাঁর ঘরেই ছিল এবং তিনিই সেটি ইংরেজদের হাতে তুলে দেন; কিন্তু সিন্ধির এ ধারণা ছিল ভুল। কেননা, রেশমি রুমাল তারা হাজি আবদুর রাহিমের ঘর থেকেই হস্তগত করে। বাস্তবতা হলো, হক নাওয়াজের ঘরে যখন তল্লাশি চলছিল, তখন সেটি সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। তিনি হয়তো মানসিক দুর্বলতাহেতু রহস্য বলে থাকবেন যে, ভাওয়ালপুরের দিনপুরে খাজা গোলাম মুহাম্মাদ সাজাদানশিন সাহেবের ওখানে প্রেরিত হয়েছে। এ জন্যই দেখা যায়, পরদিন খুব ভোরে দিনপুরির ওখানে তল্লাশি চালানো হয়; কিন্তু ততক্ষণে রুমালটি সেখান থেকেও বেরিয়ে যায়। ফলে খাজা সাহেবকে তারা বন্দি করে নেয়। হক নাওয়াজ খানের তথ্যের আলোকেই হয়তো পরদিন সিন্ধুতে হাজি আবদুর রাহিমের ওখানে অভিযান পরিচালিত হয়। তাঁর ওখান

থেকেই রুমালটি হস্তগত করা হয়। আর তখন থেকেই হাজি সাহেব চিরদিনের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান।

মোটকথা, এই দুর্বলচেতা গাদ্দারদের কারণেই সুমহান বিপ্লবটি বিপর্যস্ত হয়। নতুবা যাঁরা ছিলেন মজবুত অন্তরের অধিকারী, তাঁরা বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার সয়েছেন; কিন্তু আন্দোলনের কোনো গোপনীয়তা প্রকাশ হতে দেননি। যেমন : মাওলানা আজাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ আলি, মাওলানা শওকত আলি, মাওলানা আবদুর রাহিম রায়পুরি, মাওলানা হাদি হাসান প্রমুখ। এঁরা আন্দোলন চলাকালে অনেক জেল-জুলুম সয়েছেন; কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষায় ছিলেন হিমালয়ের মতো অবিচল।

আন্দোলনের বিপর্যস্ততার বর্ণনায় এ প্রসঙ্গে কতিপয় গাদ্দারের নাম এসেছে। তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, এ ব্যাপারে আমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহর দরবারেও আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এদের নাম নিতে বাধ্য ছিলাম। নাহয় তাদের সঙ্গে আমাদের এমন কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই যে, গাদ্দার বলে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে।

বাস্তবতার খবর একমাত্র আল্লাহপাকই ভালো জানেন। বান্দা কেবল তার অনুসন্ধানের ওপরই জিজ্ঞাসিত হবে। আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং উবায়দুল্লাহ সিন্ধির মতো বুজুর্গ মুজাহিদের তরফ থেকে যা জানতে পেরেছি, তা-ই লিপিবদ্ধ করেছি। বাস্তবে তারা নির্দোষ হয়ে থাকলে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। বাস্তবতার ব্যাপারে বান্দা অক্ষম ও অজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে لاعلم لنا الا ما علمتنا -ই আমাদের একমাত্র আওয়াজ। আর সত্যিই এরা দাগি হয়ে থাকলে আল্লাহ তাদের অপরাধ পরিমাণ শাস্তি দান করুন।

আসলে এই সুদীর্ঘ আলোচনার সার বিষয় হলো, গবেষণা করে এই বিষয়ে উপনীত হওয়া যে, এ সুমহান বিপ্লব কেন বিপর্যস্ত হলো? এর ফায়দা হবে এটাই—যারা ভবিষ্যতে অনুরূপ কোনো বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্ন দেখেন, তারা যেন এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও সাবধানী হয়ে এগোতে পারেন। দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারেন এবং যাতে তাদের বিপ্লব অকৃতকার্য না হয়।

আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আলোকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা বলে দিয়েছি; বলেছি এই আন্দোলনের ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে দুটি কারণ :

১. নেতাদের অতি-উদার মানসিকতা। ফলে তারা শত্রু-মিত্র সবাইকে একটা অতি-স্পর্শকাতর বিষয়ে অংশীদার বানিয়ে ফেলেছিলেন। অবশেষে তারা এদের হাতেই ক্ষতির মাশুল গুনেছেন। মিত্ররূপী এই শত্রুরাই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়।

২. জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের শূন্যতা। ফলে জাতির কিছুসংখ্যক লোক জাতির মানমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে বিজাতির ক্রীড়নক হতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। তারা ভিনদেশি ও ভিনধর্মীদের পণ্যে পরিণত হয়ে নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে ফেলেছিল। এখানে প্রথম দুর্বলতা ছিল নেতাদের; আর দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল কর্মীদের। অথবা বলতে পারেন প্রথমটি ছিল ইতিবাচক এবং শেষেরটি ছিল নেতিবাচক। এবং শেষপর্যন্ত এই ইতি ও নেতিবাচক গুণের সমন্বয়ে পরিণতি দাঁড়ায় বিরাট এক ব্যর্থতা।

Kalantor Prokashoni

ISBN : 978-984-96712-2-0

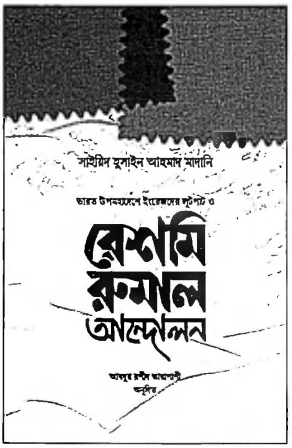

Rashmi Rumal Andulon
By Syed Hussain Ahmad Madani
Kalantor Prokashoni
Price : ৳৩০০, US $15, UK £12
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মোগল বাদশাহদের দীনবিমুখতা আর ভোগবিলাসের কারণে উপমহাদেশের স্বাধীনতা চলে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। শুরু থেকেই আলিমরা এ বিষয়ে শাসকশ্রেণিকে সতর্ক করলেও তাঁরা আলিমদের কথা আমলে নেননি। তারপরও আলিমরা হাল ছেড়ে না দিয়ে চালিয়ে যেতে থাকেন স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সশস্ত্র জিহাদসহ নানামুখী প্রয়াস। সেই প্রয়াস আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস; ভবিষ্যতের পাথেয়; চেতনার স্মারক; মুক্তি ও আজাদির মাইলস্টোন।

স্বাধীনতার সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অন্যতম অধ্যায় হচ্ছে *রেশমি রুমাল আন্দোলন*। আলোচ্য গ্রন্থে উঠে এসেছে সেই সোনালি আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনের অজানা ও বিস্ময়কর অনেক তথ্য, যা ভবিষ্যতের যেকোনো মুক্তি-আন্দোলনের জন্য হতে পারে শিক্ষার উপাদান।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যাবে ইংরেজদের লুটপাট, ভারতবর্ষের তখনকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনে আলিমদের প্রকৃত অবস্থান। ইতিহাসের স্বচ্ছ দর্পণে দেখা যাবে উসমানি খিলাফতের তখনকার অবস্থা, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে হিজাজের গভর্নর ও আফগান শাসকের ভূমিকা, ব্রিটিশের কূটচাল , জার্মানি, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, জাপানসহ উল্লেখযোগ্য দেশসমূহের অবস্থানচিত্র। জানা যাবে এত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিকল্পনা থাকার পরও আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ।